ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ জার্নাল



সংখ্যা ২৩ (১৪২২ বঙ্গাব্দ)

বাংলাদেশের প্রত্ন-পর্যটন : সোনারগাঁও-এর পানাম নগর
সুলতানি বাংলায় হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক : শাসকদের উদার শাসননীতি
একাত্তরের অসহযোগ আন্দোলন : বৃহত্তর কুষ্টিয়া জেলা
স্থানীয় পর্যায়ে মুক্তিযুদ্ধ: গোপালগঞ্জ জেলার মুকসুদপুর থানা
মার্কিন সংবাদপত্রে একাত্তরের শরণার্থী প্রসঙ্গ
বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও লন্ডনে বাংলাদেশ মিশনের তৎপরতা
আবুল মনসুর আহমদের সামাজিক দায়বোধ ও সাহিত্যচিন্তা
ঢাকায় উর্দু নাট্যচর্চা : একটি পর্যালোচনা
লোকশিল্পী শাহ আবদুল করিম ও তাঁর সঙ্গীতচর্চা
বাংলাদেশের অবলুপ্তপ্রায় কারুশিল্প: আইভরি
বাংলাদেশে টেলিভিশন সাংবাদিকতার ইতিহাস
বাংলাদেশে সংবাদ বিষয়ক আইনের উদ্ভব ও বিকাশ
মানবতাবাদী দার্শনিক ধারা ও বাঙালি মানস
চলচ্চিত্র 'ঘেটুপুত্র কমলা': বিদ্যমান সমকামিতার প্রতীকী রূপায়ণ
বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলের নারীশিক্ষায় বৈষম্য ও প্রতিবন্ধকতা
চলনবিলের জেলে সম্প্রদায়ের আর্থ-সামাজিক অবস্থা

ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ জার্নাল

সংখ্যা ২৩ (১৪২২ বঙ্গাব্দ)

সম্পাদক
স্বরোচিষ সরকার

নির্বাহী সম্পাদক
এম মোস্তফা কামাল

সহযোগী সম্পাদক
মোহাম্মদ নাজিমুল হক

ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ জার্নাল (বাংলা), সংখ্যা ২৩ (১৪২২ বঙ্গাব্দ)
প্রকাশকাল: নভেম্বর ২০১৬

© ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ ২০১৬

প্রকাশক
মোঃ জিয়াউল আলম
সচিব (ভারপ্রাপ্ত)
ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

মুদ্রক
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

কভার ডিজাইন
আবু তাহের বাবু

মূল্য: ২০০.০০ টাকা

Journal of the Institute of Bangladesh Studies (Bangla), volume 23 (1422 bs). Edited by Swarochish Sarker, Director of the Institute of Bangladesh Studies. Published by Md. Ziaul Alam, Secretary of the Institute of Bangladesh Studies, University of Rajshahi, Bangladesh. Published in November 2016. Price: Tk 200, US $ 10

ISSN 1561-798-X

ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ জার্নালের সম্পাদনা পরিষদ

সম্পাদক
স্বরোচিষ সরকার
অধ্যাপক ও পরিচালক, আইবিএস
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

নির্বাহী সম্পাদক
এম মোস্তফা কামাল
সহযোগী অধ্যাপক, আইবিএস
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

সহযোগী সম্পাদক
মোহাম্মদ নাজিমুল হক
সহযোগী অধ্যাপক, আইবিএস
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

সদস্য
সনৎ কুমার সাহা
অধ্যাপক (অবঃ), অর্থনীতি বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

নুরুল হোসেন চৌধুরী
অধ্যাপক (অবঃ), ইতিহাস বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

এম হাবিবুর রহমান
অধ্যাপক (অবঃ), আইন বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

এ কে এম আব্দুল মজিদ
অধ্যাপক, ফাইন্যান্স বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

এম. জয়নূল আবেদীন
অধ্যাপক, আইবিএস
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

মোঃ কামরুজ্জামান
সহযোগী অধ্যাপক, আইবিএস
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

প্রবন্ধের বক্তব্য, তথ্য ও অভিমতের জন্য সম্পাদকমণ্ডলী বা ইনস্টিটিউট দায়ী নয়

যোগাযোগের ঠিকানা
সম্পাদক, আইবিএস জার্নাল
ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী
বাংলাদেশ ৬২০৫

ফোন: ০৭২১-৭৫০৯৮৫
ফ্যাক্স: ০৭২১-৭১১১৮৫
ই-মেইল: jibs@ru.ac.bd

প্রবন্ধকারের জ্ঞাতব্য

ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজের বাংলা ও ইংরেজি জার্নালে বাংলাদেশ বিষয়ক গবেষণা-প্রবন্ধ ছাপা হয়। আগ্রহী প্রাবন্ধিক বাংলাদেশের ইতিহাস, ভূগোল, অর্থনীতি, রাজনীতি, সমাজবিজ্ঞান, নৃবিজ্ঞান, আইন, ভাষা, সাহিত্য, দর্শন, শিল্পকলা, প্রত্নতত্ত্ব, সঙ্গীত, সংস্কৃতি, এবং বাংলাদেশের মানুষের জীবনধারার সঙ্গে সম্পৃক্ত যে কোনো বিষয়ের উপর বাংলা অথবা ইংরেজি ভাষায় লিখিত প্রবন্ধ জমা দিতে পারেন। কোনো প্রতিষ্ঠান থেকে প্রকাশিত অথবা কোনো প্রতিষ্ঠানে প্রকাশের জন্য দাখিল করা প্রবন্ধ গ্রহণযোগ্য নয়। প্রকাশিতব্য প্রবন্ধের যেসব বৈশিষ্ট্য জার্নালের সম্পাদকমণ্ডলী প্রত্যাশা করেন, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নিম্নরূপ:

- প্রবন্ধে মৌলিকত্ব থাকতে হবে;
- প্রবন্ধটি স্বীকৃত গবেষণা পদ্ধতি অনুযায়ী রচিত হতে হবে;
- বাংলা ও ইংরেজি উভয় প্রবন্ধের ক্ষেত্রে ইংরেজি ভাষায় অনূর্ধ্ব ১০০ শব্দের একটি সারসংক্ষেপ থাকতে হবে;
- বাংলা প্রবন্ধের বানান হবে বাংলা একাডেমি প্রমিত বানান অনুযায়ী, তবে উদ্ধৃতির বেলায় মূল বানানের কোনো পরিবর্তন করা যাবে না;
- শিকাগো শৈলী অনুযায়ী প্রবন্ধের তথ্যনির্দেশ পাদটীকায় প্রদান করতে হবে; এবং
- প্রবন্ধের পরিসর ছয় হাজার শব্দের মধ্যে হওয়া বাঞ্ছনীয়।

সম্পাদকের ঠিকানায় প্রবন্ধের দুই কপি পাণ্ডুলিপি এবং jibs@ru.ac.bd ই-মেইলে একটি সফ্‌ট কপি জমা দিতে হবে। বাংলা প্রবন্ধের ক্ষেত্রে ফন্ট হবে 'বিজয়' সফ্‌টওয়্যারের "সুতন্বী-এমজে" এবং ইংরেজি প্রবন্ধের ক্ষেত্রে Times New Roman। প্রবন্ধের আখ্যাপত্রে প্রবন্ধকারের প্রাতিষ্ঠানিক পদমর্যাদাসহ যোগাযোগের ঠিকানা (মোবাইল নম্বরসহ) থাকতে হবে।

সূচিপত্র

মোঃ আতাউর রহমান ৭
বাংলাদেশের প্রত্ন-পর্যটন : সোনারগাঁও-এর পানাম নগর

মোঃ শাহাবুল আলম ১৫
সুলতানি বাংলায় হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক : শাসকদের উদার শাসননীতি

মোঃ আরিফুর রহমান ২৩
একাত্তরের অসহযোগ আন্দোলন : বৃহত্তর কুষ্টিয়া জেলা

মোঃ আবুল বাশার ৩৭
স্থানীয় পর্যায়ে মুক্তিযুদ্ধঃ গোপালগঞ্জ জেলার মুকসুদপুর থানা

মোঃ আহসানুল কবীর ৪৯
মার্কিন সংবাদপত্রে একাত্তরের শরণার্থী প্রসঙ্গ

সাবিনা নার্গিস লিপি ৫৭
বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও লন্ডনে বাংলাদেশ মিশনের তৎপরতা

আ. ন. ম. ফজলুল হক ৬৯
আবুল মনসুর আহমদের সামাজিক দায়বোধ ও সাহিত্যচিন্তা

মোঃ মোকাররম হোসেন মণ্ডল ৭৯
ঢাকায় উর্দু নাট্যচর্চা : একটি পর্যালোচনা

আবুল হাসান চৌধুরী ৯১
লোকশিল্পী শাহ আবদুল করিম ও তাঁর সঙ্গীতচর্চা

মোহাম্মদ আলী ১০৯
বাংলাদেশের অবলুপ্তপ্রায় কারুশিল্পঃ আইভরি

মোঃ আবুল কালাম আজাদ, মুহাম্মদ সাখাওয়াত হুসাইন ১১৫
বাংলাদেশে টেলিভিশন সাংবাদিকতার ইতিহাস

আব্দুল্লাহ্ আল্ মঞ্জুর হোসেন ১২৯
বাংলাদেশে সংবাদ বিষয়ক আইনের উদ্ভব ও বিকাশ

জওশন আরা জলি ১৪৩
মানবতাবাদী দার্শনিক ধারা ও বাঙালি মানস

এ বি এম সাইফুল ইসলাম, মোঃ মোজাম্মেল হোসেন বকুল ১৫৩
চলচ্চিত্র 'ঘেটুপুত্র কমলা': বিদ্যমান সমকামিতার প্রতীকী রূপায়ণ

শামীম আহম্মেদ ১৬৫
বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলের নারীশিক্ষায় বৈষম্য ও প্রতিবন্ধকতা

আবু রাসেল মুহাঃ রিপন ১৭৭
চলনবিলের জেলে সম্প্রদায়ের আর্থ-সামাজিক অবস্থা

ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ জার্নাল
সংখ্যা ২৩ (১৪২২ বঙ্গাব্দ)

বাংলাদেশের প্রত্ন-পর্যটন : সোনারগাঁও-এর পানাম নগর

মোঃ আতাউর রহমান*

Abastract: Sonargoan is one of the most important tourist spot near Dhaka. Sonargaon came into prominence as an administrative centre in the early mediaeval period; in the late 13th century Sonargaon came to occupy the position of the capital of Banga and a mint town upto the early part of the 17th century. With the decay of the once flourishing cotton manufactures, for which the tract of land beside the Sitalakhya, the Brahmaputra and the Meghna was famous, Sonargaon fell into oblivion only to be revived by the emergence of the town of Panam, an abode of the Hindu merchants, who must have set up their residences on an older site sometime in the 19th century and into the 20th century. In this article the author tried to explore the views on Archaeological sites of Panam Sonargoan, it is a valuable tourism resource that would be a development part of our country.

ভূমিকা

প্রায় এক হাজার বছরের প্রাচীন শহর সোনারগাঁও। পূর্ব বাংলার এক সময়ের অন্যতম রাজধানী। মুসলিম শাসকদের অধীনে ১২৭৯ খ্রিস্টাব্দে পূর্ববঙ্গের একটি প্রশাসনিক কেন্দ্র ও পরে প্রাদেশিক রাজধানী করা হয়।[১] প্রাচীন সুবর্ণগ্রাম থেকে সোনারগাঁও নামের উদ্ভব। ত্রয়োদশ শতাব্দীর স্থানীয় হিন্দু রাজা দনুজমাধব দশরথদেব বিক্রমপুর থেকে সুবর্ণগ্রামে তাঁর রাজধানী স্থানান্তরিত করেন।[২] এরপর সুলতানি আমলে সোনারগাঁও একটি সমৃদ্ধ বন্দরে পরিণত হয় এবং সুলতান ফখরুদ্দিন মোবারক শাহ ১৩৩৮ সালে সর্বপ্রথম সোনারগাঁও-এ রাজধানী স্থাপন করেন। বঙ্গ অঞ্চল মুসলিম শাসনে আসার পর থেকে ১৬১০ সালে ঢাকা সুবে বাংলার রাজধানী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগে অর্থাৎ ১২৯৬-১৬০৮ সাল পর্যন্ত সোনারগাঁও ছিল দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গের প্রশাসনিক কেন্দ্র। শামসুদ্দীন ফিরোজ শাহ চতুর্দশ

---

* উপপরিচালক (গবেষণা), প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর, ঢাকা।

[১] Jadu Nath Sarkar, *The History of Bengal*, vol. ll (Dhaka: University of Dhaka, 1948), p. 68; জেমস টেলর, *কোম্পানী আমলে ঢাকা (১৮৪০)*, মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান অনূদিত (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৭৮), পৃ. ৭৬।

[২] নীহার রঞ্জন রায়, *বাঙালীর ইতিহাস, আদিপর্ব* (কলকাতা, ১৯৫৯), পৃ. ১৯৩।

শতাব্দীতে এ অঞ্চল দখল করে তার শাসনের অন্তর্ভুক্ত করেন।[৩] এর ফলে সোনারগাঁওয়ে স্বাধীন হিন্দু রাজ্যের অবসান ঘটে। ১৩২২ সালে গিয়াস উদ্দীন বাহাদুর শাহের ক্ষমতা লাভের পূর্ব পর্যন্ত সময়ে সোনারগাঁয়ের রাজনৈতিক গুরুত্ব কিছুটা কমে গেলে তা একটি বন্দর নগর ও টাকশালের শহর হিসেবে পরিচিতি লাভ করে,[৪] যা বর্তমানে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর কর্তৃক সংরক্ষিত হয়েছে এবং প্রাচীন পানামনগর অথবা পানামসিটি হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে।

পানামের ঐতিহাসিক বর্ণনা

ঐতিহাসিক সোনারগাঁও বলে খ্যাত নারায়ণগঞ্জ জেলার অধীনে বর্তমান সোনারগাঁও উপজেলা শহরটির প্রান্তবর্তী এলাকা বিগত দুইশত থেকে আড়াইশত বছর যাবৎ পানাম নামে পরিচিত। উনিশ শতকের গোড়ার দিকের কোনো ঐতিহাসিক সূত্রে পানাম নামটির উল্লেখ নেই। এমতাবস্থায় ধারণা করা যায় যে, ব্রিটিশ ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির উত্থানকালে নবসৃষ্ট জমিদার, মুদ্রা ব্যবসায়ী, নীলকর ও দেশি বিদেশি দালাল-ফরিয়া প্রমুখের ষড়যন্ত্রে এ দেশে যে নব্য বেনিয়া সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়েছিল, তাদেরই কিছু সংখ্যক পরিবার মিলে মেঘনা ও ব্রহ্মপুত্র নদের সংযোগস্থলে এ বসতিটি প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল।

পানাম নগর

১৫ শতকে ঈসা খাঁ বাংলার প্রথম রাজধানী স্থাপন করেছিলেন সোনাগাঁওয়ে। পূর্বে মেঘনা আর পশ্চিমে শীতলক্ষ্যা নদী পথে বিলেত থেকে আসতো বিলাতি থানকাপড়, দেশ থেকে যেতো মসলিন। শীতলক্ষ্যা আর মেঘনার ঘাটে প্রতিদিনই ভিড়তো পালতোলা নৌকা। প্রায় ঐ সময়ে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বাণিজ্যিক কার্যক্রম ও চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে ইউরোপীয় অনুপ্রেরণায় নতুন ঔপনিবেশিক স্থাপত্য রীতিতে গড়ে উঠে পানাম নগরী।[৫] পরবর্তীতে এ পোশাক বাণিজ্যের স্থান দখল করে নেয় নীল বাণিজ্য। ইংরেজরা এখানে বসিয়েছিলেন নীলের বাণিজ্যকেন্দ্র।

জনপ্রবাদ

ডব্লিউ. ডব্লিউ. হান্টার-এর অভিমত হলো, সুলতানি আমলে পানাম ছিলো সোনারগাঁর রাজধানী।[৬] কিন্তু পানামে, সুলতানি আমলের তেমন কোনো স্থাপত্য নজরে পড়ে না, তাই এই দাবিটির সত্যতা ঠিক প্রমাণিত নয়। এক্ষেত্রে জেম্‌স টেলর বলেছেন, সোনারগাঁর প্রাচীন শহর ছিলো পানাম।[৭] এই তত্ত্বটির সাথে বাস্তবের কোনো বিরোধ নেই। শহরটিতে ঔপনিবেশিক ধাঁচের দোতলা এবং একতলা বাড়ি রয়েছে প্রচুর। যার বেশিরভাগ বাড়িই উনিশ শতকের (১৮১৩ খ্রিস্টাব্দের নামফলক রয়েছে)। মূলত পানাম ছিলো হিন্দু ধনী ব্যবসায়ীদের বসতক্ষেত্র। ব্যবসায়ীদের ব্যবসা ছিলো ঢাকা-কলকাতা জুড়ে। তারাই গড়ে তোলেন এ নগর।

---

[৩] Ayesha Begum, *Forts and Fortifications in Medieval Bengal* (Dhaka: UGC PUB, 2013), p. 204; আব্দুল করিম, *বাংলার ইতিহাস, সুলতানি আমল* (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৭৭), পৃ. ৯।

[৪] Ahmad Hasan Dani, *Dacca: A Record of its changing Fortunes* (Dhaka: Asiatic Press, 1956), p.18.

[৫] *বাংলাপিডিয়া* (২০০৩), "পানাম নগর" ভুক্তি।

[৬] W.W. Hunter, *A Statistical Account of Bengal*, vol.V (London, 1876), p. 71-72.

[৭] জেম্‌স টেলর, *কোম্পানী আমলে ঢাকা*, পৃ. ৭৬।

১৬১১ খ্রিস্টাব্দে মুঘলদের সোনারগাঁও অধিকারের পর সড়ক ও সেতু নির্মাণের ফলে রাজধানী শহরের সাথে পানাম এলাকার সরাসরি যোগাযোগ স্থাপিত হয়। পানাম পুল (বিলুপ্ত), দুলালপুর পুল ও পানামনগর সেতুর অবস্থান ও তিনদিকের খাল-বেষ্টনী থেকে বোঝা যায় পানাম, সোনারগাঁর একটা উপশহর ছিলো।

বাংলার স্বাধীন রাজা ঈশা খাঁর পদচারণা ছিলো এ নগরীতে। সুলতানি আমল থেকে এখানে বিকশিত ছিলো বাংলার সংস্কৃতি।

ঐতিহাসিক স্থাপনা

পানাম নগরীর পুরাতাত্ত্বিক ঐতিহ্যবাহী দালান রয়েছে। পানাম নগর নারায়ণগঞ্জ জেলার, সোনারগাঁওতে অবস্থিত একটি ঐতিহ্যবাহী প্রাচীন শহর। বড় নগর, খাস নগর, পানাম নগর - প্রাচীন সোনারগাঁওয়ের এই তিন নগরের মধ্যে পানাম ছিলো সবচেয়ে আকর্ষণীয়।[৮] এখানে কয়েক শতাব্দী পুরনো অনেক ভবন রয়েছে, যা বাংলার বার ভূইয়াঁদের ইতিহাসের সাথে সম্পর্কিত। সোনারগাঁর ২০ বর্গকিলোমিটার এলাকা জুড়ে এই নগরী গড়ে ওঠে।

ছোট সর্দার বাড়ি

সোনারগাঁয়ের ঈশাপুরে ছোটো সর্দার বাড়ি অবস্থিত। এখানে বাংলার বার ভূঁইয়ার অন্যতম ঈশা খাঁর শাসনামলের অনেক নিদর্শন রয়েছে। এখানে ঘোড়ার সওয়ার হিসেবে ঈশা খাঁর একটি মূর্তি রয়েছে। এ সর্দার বাড়িতেই বর্তমানে লোকশিল্প জাদুঘর গড়ে উঠেছে।

কাশীনাথ ভবন

পানাম নগরে ৫২টি বাড়ির মধ্যে সবচেয়ে আকর্ষণীয় বাড়ি হলো কাশীনাথের বাড়ি। ইতিহাসে যা কাশীনাথ এর ভবন হিসেবে পরিচিত। এ ভবনটিতে রয়েছে টাইলস, রঙিন কাচ, চিনা মাটি ও স্টাকো নকশা। ছাদ সমতল এবং এগুলোর ভার বহন করছে কাটের ভিম বর্গ। দরজা জানালা খিলান করা। খিলানের মুখ আধাগোলাকার এবং এগুলো কোনো ক্ষেত্রে ডোরা কাটা পায়ার্সের উপর প্রতিষ্ঠিত।

ঈশা খাঁনের তোরণ

পূর্ব বাংলা সোনারগাঁয়ে বারভূঁইয়াদের অন্যতম নেতা বৃহত্তর ভাটি বাংলার অধিপতি ঈশা খাঁর স্মৃতির উদ্দেশ্যে পানামে একটি তোরণ রয়েছে। সোনারগাঁয়ে তৎকালীন সময়ে মসনদ-ই আলা ঈশা খাঁর রাজধানী ছিল।[৯] তাই তাঁর স্মৃতিবিজড়িত স্থানটিকে স্মরণীয় করে রাখার লক্ষ্যে এ তোরণটি নির্মিত হয়।

নীল কুঠি

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির নীলচাষের নির্মম ইতিহাসের নীরব সাক্ষী হয়ে রয়েছে পানামের নীলকুঠি। পানাম পুলের কাছে দুলালপুর সড়কের পাশেই এর অবস্থান। জানা যায়, শুরুতে এটি কোম্পানির

---

[৮] ABM Hossain, *Sonargoan-Panam* (Dhaka: Asiatic Society of Bangladesh, 1997), pp. 15-17.

[৯] মোহাম্মদ মোশাররফ হোসেন শাহজাহান, *ঈশা খান* (ঢাকা: ইফাবা, ২০০৪), পৃ. ভূমিকা।

মসলিন বস্ত্র ক্রয় কেন্দ্রের দপ্তর ভবন হলেও পরে কুঠিটি নীল ব্যবসাকেন্দ্র হয়ে ওঠে। যদিও বর্তমানে নীলকুঠির মূল রূপ ঢাকা পড়ে গেছে নতুন করে করা পলেস্তারার নীচে।

বণিক বসতি

সোনারগাঁওয়ের উত্তর পূর্বের পড়শি গ্রামটির নাম দুলালপুর-পানাম। বিশ শতকের গোড়ার দিকে এখানে বণিক বসতি গড়ে ওঠে। গোটা বসতির বাড়ি ঘর ইট পাটকেল ও চুন সুরকিতে তৈরি। এগুলোর স্থাপত্য শৈলী খুবই মনোরম।

ঠাকুর বাড়ি

মুল পানাম শহরে দক্ষিণ, উত্তর ও পূর্ব দিকে প্রায় এক কিলোমিটার এলাকা জুড়ে বেশ কিছু পুরনো বাড়ি রয়েছে। এগুলোর মধ্যে পানামের দক্ষিণের দিকের বাড়িটি হলো ঠাকুরবাড়ি, যা দেড় শত বছর পূর্বে জনৈক ঠাকুর নির্মাণ করেছিলেন।

পানাম নগরের অবস্থান

এটি ২৪°-১৫ উত্তর অক্ষাংশে এবং ৯০°-২৭ পূর্ব দ্রাঘিমাংশে একসমতল এলাকায় অবস্থিত।[১০] রাজধানী ঢাকা থেকে পূর্ব-দক্ষিণে ২৭ কিলোমিটার দূরে প্রাচীন পানাম নগরের অবস্থান। প্রায় ৫ মিটার প্রশস্ত ও ৬০০ মিটার দীর্ঘ একটি সড়কের দুই পার্শ্বে সুরম্য স্থাপনা নিয়ে পানাম নগর গড়ে উঠেছিল। আশপাশে রয়েছে মধ্যযুগীয় সোনারগাঁওয়ের বিভিন্ন নিদর্শন।



পানাম সড়ক ও দুই পাশের ভবন

[১০] শেখ মাকসুদ আলী, *বাংলাদেশ জেলা গেজেটিয়ার বৃহত্তর* (ঢাকা: বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, ১৯৯৩), পৃ. ৭৬৭।

পানাম নগরে যা রয়েছে

পানাম নগরে রয়েছে ঔপনিবেশিক আমলের ছোটো ছোটো লাল ইটের তৈরি কিছু পুরনো দালান কোঠা ও বাড়ি। এগুলোর বেশির ভাগেরই অবস্থা বর্তমানে শোচনীয়। ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের মোগড়াপাড়া থেকে পানাম নগরের দিকে নীলকুঠি পর্যন্ত পাকা সড়কটিও প্রাচীন নিদর্শন বহন করে চলেছে। পানাম নগরে পুরনো বাড়ি ক্ষুদ্র নগরীর অন্যতম আকর্ষণ। তৎকালীন সময়ে পানাম নগরটি কৃত্রিম খাল দ্বারা সুরক্ষিত ছিল।[১১]

পানামের টিকে থাকা বাড়ি গুলোর মধ্যে ৫২টি বাড়ি ছিল উল্লেখযোগ্য। পানাম সড়কের উত্তর পাশে ৩১টি আর দক্ষিণ পাশে ২১টি বাড়ি রয়েছে।[১২] বাড়িগুলোর অধিকাংশই আয়তাকার, উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত, উচ্চতা একতলা থেকে তিন তলা।

বাড়িগুলোর স্থাপত্যে ঔপনিবেশিকতা ছাড়াও মুঘল, গ্রিক এবং গান্ধার স্থাপত্যশৈলীর সাথে স্থানীয় কারিগরদের শিল্পকুশলতার অপূর্ব সংমিশ্রিণ দেখা যায়। প্রতিটি বাড়িই ব্যবহারোপযোগিতা, কারুকাজ, রঙের ব্যবহার, এবং নির্মাণকৌশলের দিক দিয়ে উদ্ভাবনী কুশলতায় ভরপুর। ইটের সঙ্গে ব্যবহার করা হয়েছে ঢালাই-লোহার তৈরি ব্র্যাকটে, ভন্টেলিটের আর জানালার গ্রিল। মেঝেতে রয়েছে লাল, সাদা, কালো মোজাইক করে কারুকাজ। প্রায় প্রতিটি বাড়িতেই খিলান ও ছাদের মধ্যবর্তী স্থানে নীল ও সাদা ছাপ দেখা যায়। পানাম নগরীর পরকিল্পনাও নিখুঁত। নগরীর পানি সরবাহের জন্য দুই পাশে ২টি খাল ও ৫টি পুকুর আছে। প্রায় প্রতিটি বাড়িতেই আছে কুয়া বা কূপ। নগরীকে জলাবদ্ধতামুক্ত রাখতে করা হয়েছে খালের দিকে ঢালু। প্রতিটি বাড়ি পরস্পর থেকে সম্মানজনক দূরত্বে রয়েছে। নগরীর যাতায়াতের জন্য রয়েছে এর একমাত্র রাস্তা, যা এই নগরীর মাঝখান দিয়ে বয়ে গেছে এপাশ-ওপাশ। নগরীর ভিতরে আবাসিক ভবন ছাড়াও আছে মসজিদ, মন্দির, গির্জা, মঠ, গোসলখানা, নাচঘর, পান্থশালা, চণ্ডীমণ্ডপ, খাজাঞ্চিখানা, দরবারকক্ষ, গুপ্ত পথ, বিচারালয়, পুরনো জাদুঘর।

পার্শ্ববর্তী গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা

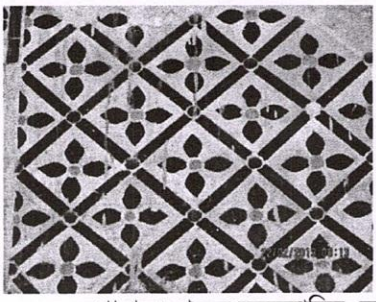
সোনারগাঁও লোকশিল্প জাদুঘর থেকে পশ্চিম দিকে রয়েছে গোয়ালদী হোসেন শাহী মসজিদ। এ মসজদিটি সুলতান আলাউদ্দীন হোসেন শাহীর শাসনামলে নির্মিত হয়। মোগরাপাড়া চৌরাস্তা দিয়ে একটু দক্ষিণ দিকে গেলে রয়েছে আরো কিছু ইমারত, বারো আউলিয়ার মাজার, হযরত শাহ ইব্রাহীম দানীশ মন্দা ও তাঁর বংশধরদের মাজার, দমদম গ্রামে অবস্থিতি দমদম দুর্গ ইত্যাদি। নগরীর আশপাশে ছাড়াও আছে ঈসা খাঁ ও তাঁর ছেলে মুসা খাঁর প্রমোদ ভবন, ফতেহ শাহের মসজিদ, সোনাকান্দা দুর্গ, গিয়াস উদ্দিন আজম শাহর মাজার, সুলতান ভিটা আজমপুর, পঞ্চপীরের মাজার, কদম রসুল, হাজীগঞ্জ দুর্গ, বিবি মরিয়মের মাজার ও মসজিদ, লাঙ্গলবন্দ, লোকনাথ ব্রহ্মচারীর আশ্রম, জ্যোতি বসুর পৈতৃক ভিটা, চিলেকোঠাসহ বহু পুরাতাত্ত্বিক গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[১৩]

---

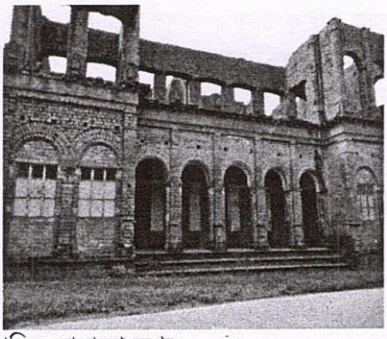
[১১] Nazimuddin Ahmed, *Panamnagar in Sonargaon* (Dhaka: Kirshnachura prokasani, 2009), p. 24.

[১২] একেএম মোজাম্মিল হক, *ঐতিহাসিক সোনারগাঁও পরিদর্শন গাইড* (ঢাকা: গতিধারা, ২০১৪), পৃ. ২৮।

[১৩] করুণাময় গোস্বামী, *নারায়ণগঞ্জের ইতিহাস* (নারায়ণগঞ্জ: জেলা প্রশাসন ও সুধীজন পাঠাগার, ১৯৮৫), পৃ. ১০।




পানাম নগরের বসতবাড়ির ভেতরের মনোরম কারুকার্যের দৃশ্য

পানাম নগরের বসতবাড়ির সাধারণ দৃশ্য

পানাম সেতু ও পানাম নগর সেতু

সোনারগাঁও থেকে পানাম শহরের পশ্চিম পার্শ্ব দিয়ে উত্তর দিকে যাওয়ার পথে পাঠান আমলের একটি সুন্দর সেতু রয়েছে। এ সেতুটি তিনটি খিলানের উপর নির্মিত। এগুলোর মধ্যে মাঝের খিলানটি অপেক্ষাকৃত উঁচু ও চওড়া। সেতুর নীচ দিয়ে নৌকা চলাচলের সুবিধার জন্য এটি নির্মিত হয়েছিল।[১৪] এটি ৪.২৪ মিটার প্রশস্ত ও তলদেশ থেকে এর উচ্চতা প্রায় ৮.৪৮ মিটার। পাশের দুটি খিলান ২.২৭ মিটার করে প্রশস্ত এবং ৪.২৪ মিটার করে উঁচু। মাঝের স্তম্ভগুলো ২.২১ মিটার করে পুরু। সেতুর দৈর্ঘ্য ছিল ৫২.৬ মিটার। সেতুটি প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর কর্তৃক সংস্কার করা হয়েছে।

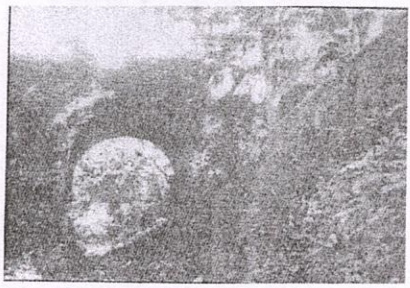
সোনারগাঁও থেকে পানাম শহরের পশ্চিম প্রান্তে এবং দুলালপুর পুলের দক্ষিণের দিকে পাকা রাস্তার পূর্ব দিকে অবস্থিত এক খিলান বিশিষ্ট কুঞ্জ আকৃতির ছোট সেতুটিই পানাম নগর সেতু। পাকা রাস্তা থেকে পানাম নগরের প্রধান সড়কে যাওয়ার পথে একটি পরিখার উপর সেতুটির অবস্থান।[১৫] সেতুটির দৈর্ঘ্য ৭২ ফুট ও প্রস্থ ১৫.৫ ফুট। সেতুপথটি বৃত্তাকারে সন্নিবেশিত ইটের গাঁথুনিতে তৈরি। সেতুর পাদদেশে কালো শিলার তৈরি কয়েকটি বড়ো থাম সমতলভাবে স্থাপন করে তাঁর উপর বসানো হয়েছে ইটের গাঁথুনি। নির্মাণকালে সেতুটির মুখে দুটি স্তম্ভে ফাঁক বসানো ছিল। স্থাপত্যরীতি থেকে বুঝা

---

[১৪] স্বরূপচন্দ্র রায়, *সুবর্ণগ্রামের ইতিহাস* (কলকাতা, ১৮৯১), পৃ. ১৬৩।

[১৫] Habiba Khatun, *Iqlim Sonargaon, History Jurisdiction Monuments* (Dhaka: Academic Press, 2006), p. 160.

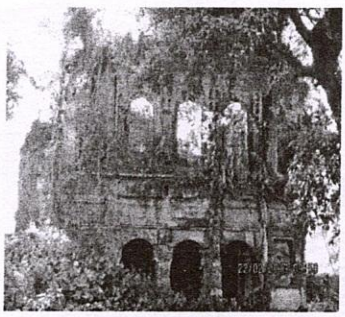
যায় সেতুটি মুঘল আমলে নির্মিত হয়েছিল। এছাড়াও পানাম নগরে মুঘল আমলের দুলালপুর নামে আরও একটি সেতু রয়েছে।

পানাম সেতু ও পানাম নগর সেতু

পানামের টাকশাল বাড়ি

পানাম নগর এলাকায় ৫২টি বাড়ির মধ্যে দুটি টাকশাল বাড়ি রয়েছে। বাড়ি দুটি ইংরেজ আমলের বলে অনুমেয়। একটি বাড়ি নারায়ণগঞ্জ জেলার সোনারগাঁও উপজেলার আমিনপুর মৌজায় অবস্থিত আনন্দ মোহন বাবুর টাকশাল বাড়ি। অপরটি একই মৌজায় লক্ষ্মীনারায়ণের টাকশাল নামে পরিচিত। ১৭৬৫ সালে ইংরেজরা যখন দেওয়ানি লাভ করে তখন মুদ্রাও পরিবর্তনের দায়িত্ব নিয়েছিল। এছাড়া তৎকালীন এক শ্রেণীর বেনিয়া বা মুদ্রা ব্যবসায়ীর উদ্ভব হয়েছিল। তারা পুরাতন মুদ্রার আদলে নতুন মুদ্রা তৈরি করতেন। বাড়িগুলোর নির্মাতারা সে আমলের পর্যায়ভুক্ত।




পানামে ইংরেজ আমলের দুটি টাকশাল বাড়ির সাধারণ দৃশ্য

পানাম নগরের স্থাপত্যশৈলী

পানাম নগরের স্থাপত্যগুলোর শীর্ষে অলঙ্কৃত ছাদ-পাঁচিল বা রেলিং ও অভিক্ষিপ্ত কার্নিশ ইমারতের গঠন কাঠামোর সঙ্গে চমৎকারভাবে মানানসই হয়েছে। স্থাপত্য গবেষকদের ধারণা ইমারতগুলো ইউরোপীয় স্থাপত্যের অনুকরণে রূপায়িত অলঙ্করণ সজ্জা।[১৬] আবার কোথাও কোথাও স্থানীয় নকশা ব্যবহার করা হয়েছে।

---

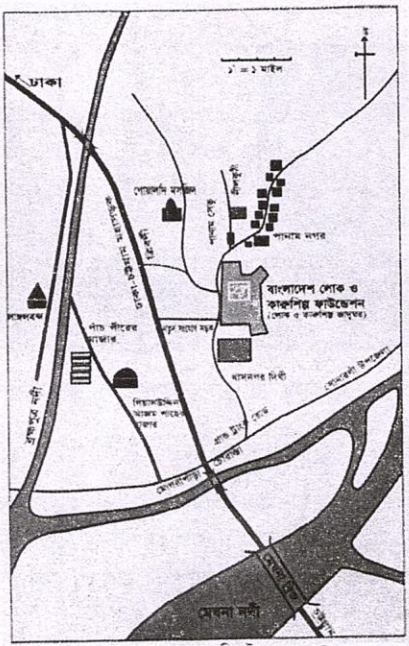
[16] ABM Hossain, *Sonargoan-Panam*, p. 119.




পানাম নগরের স্থাপত্যগুলোর সাধারণ দৃশ্য

উপসংহার

ইংরেজ শাসনামলে বাণিজ্যিক কার্যক্রম ও চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সূত্র ধরে গড়ে উঠেছিল জমজমাট আজকের সোনারগাঁও। সুতি বস্ত্রের প্রধানত ইংলিশ থান কাপড়ের ব্যবসা কেন্দ্র এবং সে সুবাদে গড়ে ওঠে পানাম নগর। পানাম বরাবরই ছিল হিন্দু অধ্যুষিত এলাকা। দেশবিভাগের পর থেকে বিশেষ করে ১৯৬৫ সালে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের পর থেকে পানাম নগর অনেকটা জনমানবহীন শহরে পরিণত হয়। বর্তমানে এটি প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের আওতাধীন ও সংরক্ষিত। যেহেতু এটি রাজধানী ঢাকার নিকটবর্তী ঐতিহ্যবাহী সাংস্কৃতিক নগরী, সেহেতু এখানে দেশি-বিদেশি পর্যটকদের কাছে অতি আর্কষণীয় প্রত্ন-পর্যটন নগরী হিসেবে উপস্থাপনের মাধ্যমে দেশের সমৃদ্ধি আনয়ন সহজ হবে বলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।



পানাম সোনারগাঁওয়ের মানচিত্র

ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ জার্নাল
সংখ্যা ২৩ (১৪২২ বঙ্গাব্দ)

সুলতানি বাংলায় হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক : শাসকদের উদার শাসননীতি

মোঃ শাহাবুল আলম*

Abstract: From Muhammad Bakhtiyar Khalji to last Afgan Sultan Daud Khan Karrani, most of the Sultan were very liberal and issued coins from a number of mint-towns scattered throughout their domination. They did not destroy any Hindu Doms or architectural monuments. The Sultans of this peroid are credited to have established a disciplined society to ensure the security of both Hindu and Muslims life. For generations Hindus and Muslims lived in two almost mutually exclusive quarters, though situated in the same locality. There was of course exchange of courtesies and at times even cooperation in the field of common interest, but the two societies ran on parallel lines. So the present paper tries to assertain the role of Bengal Sultans for developing relationship between Hindu and Muslims.

ভূমিকা

সেন বংশের রাজত্বকালে ইখতিয়ার উদ্-দীন মুহাম্মদ বখতিয়ার খলজি ১২০৪ খ্রিস্টাব্দে রাজা লক্ষ্মণ সেনকে পরাজিত করে বাংলার উত্তর-পশ্চিমাংশে মুসলিম শাসনের সূচনা করে লখনৌতিতে তাঁর রাজধানী স্থাপন করেন। এর ফলে বাংলার ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়। তখন থেকে বাংলার শাসনকর্তাগণ কখনও দিল্লির অধীনস্থ প্রদেশ হিসেবে আবার কখনও স্বাধীনভাবে বাংলা শাসন করেছেন। ১৫২৬ খ্রিস্টাব্দে পানিপথের প্রথম যুদ্ধে বাবরের নিকট সুলতান ইবরাহীম লোদী পরাজিত হলে ভারতীয় উপমহাদেশে মুঘল শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। তবে বাংলায় মুঘল আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয় যথেষ্ট দেরিতে। ১৫৭৬ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট আকবর বাংলার সর্বশেষ আফগান সুলতান দাউদ খান কররানীকে পরাজিত ও নিহত করে বাংলায় মুঘল শাসন প্রতিষ্ঠিত করেন। ১২০৪-১৫৭৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বাংলায় সকল শাসনকর্তা অথবা সুলতান সমাজের অভিভাবকত্বের দায়িত্ব পালন করতেন। প্রজাসাধারণের শান্তি ও নিরাপত্তা বিধান করা এবং তাদের সুখ ও সমৃদ্ধির ব্যবস্থা করা সুলতানদের কর্তব্যকর্ম ছিল। হিন্দু-মুসলমান উভয় সমপ্রদায়ের লোকেরা নিরাপত্তার জন্য তাঁদের আশ্রয় গ্রহণ করতো। বাংলার সুলতানরা ইসলামের নির্দেশের প্রতিই অনুরক্ত ছিলেন না, বরং সমাজের সকল সম্প্রদায়ের অভিভাবক হিসেবে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা

* সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

গ্রহণ করতেন। বাংলার শাসকরা ছিলেন অত্যন্ত প্রজাহিতৈষী ও জনকল্যাণকামী। তারা উদার শাসন ব্যবস্থা কায়েমের জন্য স্থানীয় রীতি-নীতি ও প্রথার প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন।[১]

তারা রাষ্ট্র ও প্রজাদের মধ্যে প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ স্থাপন করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। সুলতানদের গৃহীত ব্যবস্থার ফলে বাংলার দুটি বৃহৎ সম্প্রদায় মুসলমান ও হিন্দুদের মধ্যে সম্প্রীতিমূলক মনোভাব গড়ে উঠে। আলোচ্য প্রবন্ধে হিন্দু-মুসলমানেদের মধ্যে সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতিমূলক পরিবেশ তৈরিতে বাংলার সুলতানগণ কর্তৃক উদার শাসননীতি সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

১. মুসলিম শাসনের প্রারম্ভিক পর্যায়

বখতিয়ার খলজি নদীয়া বিজয়ের পর লখনৌতি জয় করে সেখানে রাজধানী স্থাপন করেন। তিনি অধিকৃত এলাকাকে কয়েকটি অঞ্চলে বিভক্ত করে প্রত্যেক ভাগে একজন সেনাপতি নিয়োগ করেন। এ সময়ে বিভিন্ন শাসনতান্ত্রিক বিভাগকে ইকতা এবং ইকতার শাসনকর্তাকে মুক্তা বলা হতো।[২] বখতিয়ার খলজি লখনৌতিতে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য মসজিদ, মাদ্রাসা ও খানকাহ নির্মাণ করলেও হিন্দুদের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলো ধ্বংস করেননি।[৩] অবশ্য তাঁর নদীয়া আক্রমণের আগেই নদীয়ার ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা নদীয়া ছেড়ে যে যেদিকে পারে পলায়ন করে এবং দূর দূরান্তে আশ্রয় গ্রহণ করে।[৪] নদীয়া বিজয়ের পর মুসলমান শাসকগণ কর্তৃক হিন্দুদের উপর অত্যাচারের প্রমাণ পাওয়া যায় না। বরং মুসলমানরা দেশে শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করে জনহিতকর কাজে মনোযোগী হলে হিন্দুরাও সে সকল কাজে অংশগ্রহণ করে তার সুফল ভোগ করে।

মুসলমানগণ শাসক জাতি হলেও তারা হিন্দুদের থেকে দূরে থাকেনি কিংবা হিন্দুদেরকে দূরে সরিয়ে রাখেনি। ঐতিহ্যগতভাবে মুসলিম শাসনকর্তাদের রাষ্ট্রনীতিতে একটি মৌলিক আদর্শ ছিল সহিষ্ণুতা।[৫] এজন্য রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে তারা মুসলমানদের পাশাপাশি অন্যান্য সম্প্রদায় বিশেষ করে হিন্দুদেরকে সংযুক্ত রেখেছেন। কোনো রকম ধর্মীয় গোঁড়ামি ব্যাতিরেকে তারা অন্যান্য সম্প্রদায়ের পণ্ডিত, কবি ও বিদ্বান ব্যক্তিদের প্রতি উদার রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা দান করেছেন।[৬] ধ্রুবানন্দের 'মহাবংশাবলী' গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে, সুলতান ইলিয়াস শাহ অনেক প্রতিভাবান হিন্দুদের সরকারি পদ, উপাধি, জমি দান বিশেষ করে রাজস্ব আদায়ের মতো গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব প্রদান করে মর্যাদার আসনে আসীন করেছেন।[৭] শক্তিবলে বাংলা দখল করলেও জোর করে ভূমি রাজস্ব আদায় করা মুসলমান শাসকগোষ্ঠীর পক্ষে কঠিন ছিল। কেননা রাজস্ব বিষয়ে তাদের অভিজ্ঞতা কম ছিল। তাছাড়া

---

[১] এম. এ রহিম, *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস*, দ্বিতীয় খণ্ড, মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান ও ফজলে রাব্বি অনূদিত (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৮২), পৃ. ৩৫।

[২] Minhaj al-Din Siraj, *Tabaqat-i Nasiri,* Vol. I, Text (ed.), Abdul Hai Habibi (Kabul: Historical Society of Afganistan, 2nd edition, 1963), p. 63.

[৩] Ibid, p. 70.

[৪] আবদুল করিম, *বাংলার ইতিহাস সুলতানী আমল* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৭৭), পৃ. ১০৮।

[৫] S. A. Q. Hussaini, *Arab Administration* (Lahore: Shaikh Muhammad Ashraf, 1948), p. 12.

[৬] *Tabaqat-i Nasiri,* p. 427.

[৭] এম. এ. রহিম, *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস*, প্রথম খণ্ড, মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান ও ফজলে রাব্বি অনূদিত (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৮২), পৃ. ৩৫৭।

রাজস্ব আদায়ের জন্য গ্রামে-গঞ্জে ছড়িয়ে পড়ার মতো পর্যাপ্ত লোকবল সুলতানদের ছিল না। সবচেয়ে বড়ো কথা বাংলার সুলতানরা শান্তিপূর্ণ শাসন ব্যবস্থা কায়েমের জন্য স্থানীয় রীতি ও প্রথার প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন।[৮]

তারা রাষ্ট্র ও প্রজাদের মধ্যে প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ স্থাপন করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্তে জমিদারি পদ্ধতিতে রাজস্ব আদায়ের ব্যবস্থা করেন। বাংলায় সাধারণত দুই শ্রেণির জমিদার ছিল যথা: কর প্রদানকারী জমিদার এবং রাজস্বের ইজারাদার।[৯] কালক্রমে এরা এই পদে স্থায়ী হয় এবং ইজারাদারদের পদ বংশানুক্রমিক হয়ে পড়ে। আর কর প্রদানকারী জমিদারদের উৎপত্তি হয় বাংলায় মুসলিম শাসনের প্রারম্ভকাল থেকে। এরা ছিলেন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হিন্দু রাজা। এরা মুসলিম শাসকদের নিকট আত্মসমর্পণ করেন এবং নিয়মিত কর প্রদান ও অনুগত থাকার প্রতিশ্রুতি দেন।[১০]

বাংলায় মুসলমান বিজয়ের সূচনালগ্ন থেকে মুসলিম শাসকরা রাষ্ট্রপরিচালনায় উদার নীতি অবলম্বন করেন। তারা সামন্ত রাজাদের ধ্বংস না করে তাদেরকে বশ্যতা স্বীকার করান। যারা ইচ্ছাকৃতভাবে কিংবা হুকুম না পেয়ে যুদ্ধ না করে বশ্যতা স্বীকার করেছে তাদেরকে স্বপদে বহাল রাখা হয়। এক্ষেত্রে তাদের পদবি পরিবর্তিত হয়ে রাজা কিংবা জমিদার হয়।[১১] আর যে সকল সামন্ত রাজা মুসলমান অভিযানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে পরাজিত হয়েছে, তাদের এলাকা সুলতানের দখলে নিয়ে তার রাজস্ব আদায়ের ভার স্থানীয় প্রধান বা ভূস্বামীদের দেওয়া হয়। এরাও রাজা বা জমিদার নামে অভিহিত হতেন। পরবর্তীকালে সুলতান স্বয়ং কিংবা তার পক্ষ থেকে অনেক জমিদারকে রাজা, মহারাজা প্রভৃতি খেতাব প্রদান করা হতো।[১২] দিল্লির সুলতান ফীরূজ শাহ তুগলক বাংলার বিদ্রোহী সুলতান ইলিয়াস শাহের বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণ করেন। অভিযানকালে দিল্লির সুলতানের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনের জন্য জমিদার, মুকাদ্দম, খান মালিক ও অন্যান্যদের উদ্দেশ্যে তিনি এক ঘোষণাপত্র জারি করেন।[১৩] উক্ত ঘোষণাপত্র থেকে বোঝা যায় যে, জমিদারগণ ছিলেন বাংলায় শক্তি ও প্রভাব-প্রতিপত্তির উৎস। কুলপঞ্জিকায় বর্ণিত কিংবদন্তি অনুসারে উভয় সুলতানের মধ্যে যুদ্ধে বাংলার কতিপয় জমিদার দিল্লির সুলতানের পক্ষে যোগদান করেছিলেন।[১৪] তবে ঐতিহাসিক বারানী বলেছেন, বহু হিন্দু জমিদার হাজী ইলিয়াস শাহের পক্ষে যুদ্ধ করেন।[১৫] বাংলার জমিদাররা যে ভীষণ প্রভাবশালী ছিলেন, তা রাজা গণেশের বাংলার ক্ষমতা দখলের ইতিহাস থেকে জানা যায়।

মুসলমান শাসনের উদার ও অনুকূল পরিবেশের দ্বারা প্রণোদিত হয়ে কায়স্থদের মতো সম্প্রদায় শিক্ষার প্রতি মনোযোগী হয়। তারা সাহিত্য, সংস্কৃতি ও বুদ্ধিবৃত্তিমূলক কর্মকাণ্ডে প্রতিভার পরিচয় প্রদান

---

[৮] Shirin Akhtar, *The Role of the Zamindars in Bengal 1707-1772* (Dacca: Asiatic Society of Bangladesh, 1982), p. 156.

[৯] এম. এ. রহিম, *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস*, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৭০।

[১০] Diya al-Din Barani, *Tarikh-i-Firuz Shahi,* Text (ed.), Sayyid Ahmad Khan (Kolkata: Asiatic Society of Bengal, 1862), p. 589.

[১১] মো. মাহবুবর রহমান, "বাংলার রাজা বা জমিদার শ্রেণী: একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা", *গবেষণা পত্রিকা*, তৃতীয় সংখ্যা, কলা অনুষদ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৭-৯৮, পৃ. ১৯০।

[১২] এম. এ. রহিম, *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস*, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৭০।

[১৩] Gulam Hussain Salim, *Riyaz-us-Salatin,* trans. Abdus Salam (Kolkata: Asiatic Society of Bengal, 1904), p. 138.

[১৪] এম. এ. রহিম, *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস*, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৭১।

[১৫] *Tarikh-i-Firuz Shahi,* Text (ed.), Sayyid Ahmad Khan, p. 593.

করে। এজন্য রাজস্ব আদায়ের কাজে কায়স্থদের অধিক সংখ্যায় নিয়োগ করা হতো। এর কারণ হিসেবে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ঐতিহাসিক আবুল ফজল বলেন, সরকারের রাজস্ব সংক্রান্ত কাজে দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতার ফলে কায়স্থরা অন্যান্যদের চেয়ে কৃষি ও খাজনা সংক্রান্ত ব্যাপারগুলো ভালো বুঝতো।[১৬]

মালাধর বসু (গুণরাজ খান), কবীন্দ্র পরমেশ্বর, শ্রীকর নন্দী, যশোরাজ খান, কাশীরাম দাস, বিজয় গুপ্ত প্রভৃতি কবিদের প্রায় সকলেই কায়স্থ অথবা বৈদ্য ছিলেন।[১৭] কায়স্থরা ছাড়াও বহু ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য শ্রেণির হিন্দুরা মুসলিম শাসকগণের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন। অমুসলিমদের উপর জিজিয়া কর না ধার্য করার প্রতিদানে তারা আন্তরিকভাবে মুসলিম শাসকদের বিভিন্ন প্রশাসানিক কর্মকাণ্ডে সহযোগিতা প্রদান করে।

সুলতান গিয়াস উদ্-দীন বলবন বাংলা অভিযানকালে তিনি বিদ্রোহী শাসনকর্তা মুগিস উদ্-দীন তুগরলের বিরুদ্ধে কোনো প্রকার স্থানীয় সাহায্য লাভ করতে সমর্থ হননি। ঐতিহাসিক বারানীর মতে, সুলতান মুগিস উদ্-দীন তুগরল তাঁর সংগৃহীত বিপুল ধন-রত্ন সৈন্যবাহিনী এবং লখনৌতির প্রায় সকল অধিবাসীর মধ্যে বিলি করে দেন।[১৮] এজন্য লখনৌতির অধিবাসীরা সকলে তুগরলের প্রতি অনুরক্ত হয় এবং পরবর্তীতে দিল্লির সুলতান গিয়াস উদ্-দীন বলবনের বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। কথিত আছে যে, তুগরল পাঁচ মন সোনা দান করে দরবেশদের জন্য খান্কাহ প্রতিষ্ঠা করেন।[১৯] এর ফলে দরবেশরাও তাঁর দলে ভিড়ে যান। বাংলার হিন্দু-মুসলমান সকলেই তুগরলের পক্ষে ছিল এবং কেউ ইচ্ছে করে তাঁর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেননি। তুগরল যে দুই দুইবার দিল্লির বাহিনীকে পরাজিত করতে সমর্থ হয়, তার মূলে ছিল সৈন্যবাহিনী ও সকল শ্রেণির জনসাধারণের অকুণ্ঠ সমর্থন।[২০] সুলতান বলবন দীর্ঘদিন তার সৈন্যদল নিয়ে বাংলার সর্বত্র তুগরলের অন্বেষণ করে বেড়িয়েছেন। কিন্তু কোনো একজন বাঙালি তাকে বাংলার শাসনকর্তার খোঁজ দেননি। এমনকি সামান্য ব্যবসায়ীরাও তার কোনো প্রকার সংবাদ দেয়নি। যখন তাদের মধ্য থেকে দু'জনকে হত্যা করা হয় তখন অন্যান্যরা প্রাণের ভয়ে বাংলার শাসনকর্তার ছাউনি দেখিয়ে দেয়।[২১] এক্ষেত্রে ঐতিহাসিক কানুনগোর মত বিশেষ প্রণিধানযোগ্য; তাঁর মতে, সুলতান গিয়াস উদ্-দীন বলবন শুধু একজন বিদ্রোহী তুগরলের বিরুদ্ধেই যুদ্ধ করেননি, বরং সারা বাংলার বিরুদ্ধে তাঁকে যুদ্ধ করতে হয়েছিল।[২২]

২. স্বাধীন সুলতানি শাসনপর্ব

১৩৩৮ খ্রিস্টাব্দে বাহরাম খানের মৃত্যুর পর তাঁর সিলাহদার ফকরা স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং সুলতান ফকর উদ্-দীন মোবারক শাহ উপাধি ধারণপূর্বক সোনারগাঁওয়ের সিংহাসনে বসেন। ফকর উদ্-দীন মোবারক শাহ কর্তৃক স্বাধীনতা ঘোষণাই বাংলায় স্বাধীন সুলতানি শাসনের সূচনা করেন।

---

[১৬] Abul Fadl Allami, *Ain-i-Akbari,* Vol. II, Trans. H. S. Jarret (Kolkata : Asiatic Society of Bengal, 1873), p. 141.

[১৭] আনিসুজ্জামান, *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস*, ১ম খণ্ড (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৭), পৃ. ২২৩।

[১৮] *Tarikh-i-Firuz Shahi,* Text (ed.), Sayyid Ahmad Khan, p. 73.

[১৯] এম. এ. রহিম, *বাংলার ইতিহাস সুলতানী আমল*, পৃ. ১২৫।

[২০] *Tarikh-i-Firuz Shahi,* Text (ed.), Sayyid Ahmad Khan , p. 89.

[২১] K. R. Qanunga, *History of Bengal,* Vol. II (Dhaka: University of Dhaka, 2nd Impression, 1972), p. 61.

[২২] এম. এ. রহিম, *বাংলার ইতিহাস সুলতানী আমল*, পৃ. ৪০০।

স্বাধীন সুলতানি আমল থেকে মুসলমান ও হিন্দু উভয় সম্প্রদায়ের সমবেত প্রচেষ্টায় শাসনব্যবস্থা চলতে থাকে।[২৩]

সুলতান ইলিয়াস শাহের সময় হতে হিন্দুরা অধিক সংখ্যায় শাসনকার্যে অংশগ্রহণ করে। তিনি সর্বপ্রথম অমুসলমান সম্প্রদায়ের বিশেষ করে হিন্দুদের সৈন্যবাহিনীতে ভর্তি করেন। ঐতিহাসিক বারানী ইলিয়াস শাহের সৈন্যবাহিনী সম্পর্কে বলেন, "বাঙ্গালার বিখ্যাত পাইকরা অনেক বৎসর ধরে নিজেদেরকে আবু বাঙ্গাল (বাঙ্গলার পিতা) বলে অভিহিত করতেন এবং অসীম সাহসী বলে দাবি করতেন।"[২৪]

ইলিয়াস শাহ দিল্লির সুলতান ফীরূজ শাহের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রামে অনেক হিন্দু সামন্ত জমিদার, সেনাপতি ও সৈনিকদের অকুণ্ঠ সমর্থন ও সাহায্য গ্রহণ করেন।[২৫] তাঁর হিন্দু সেনাপতিদের অন্যতম সহদেবেব নাম *তারীখ-ই-মুবারকশাহীতে* পাওয়া যায়।[২৬] উক্ত সেনাপতি দিল্লির সুলতান ফীরূজ শাহ তুগলকের বিরুদ্ধে যুদ্ধে বিরাট সৈন্যবাহিনী পরিচালনা করেন।[২৭] ধ্রুবানন্দের 'মহাবংশাবলী' গ্রন্থ থেকে জানা যায়, ইলিয়াস শাহ বহু জমিদার, সামন্ত ও সরকারি কর্মচারীকে সাহায্যের জন্য পুরস্কৃত করেন।[২৮] উপরোক্ত দৃষ্টান্তগুলো থেকে সহজেই অনুমিত হয় যে, সুলতান ইলিয়াস শাহ কেবল মুসলমানদের সুলতান ছিলেন না, বরং হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকলের সুলতান ছিলেন।

সুলতান গিয়াস উদ্-দীন আজম শাহ রাজা গণেশকে উজির পদে নিয়োগ প্রদান করে উদারতার মহান দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। অবশ্য বাংলার রাজনৈতিক মঞ্চে গণেশের অভ্যুদয় কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। ইলিয়াস শাহী সুলতানদের সময় হতে হিন্দুরা রাজনীতির ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়। নিজেদের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য এদের দিল্লির প্রভাবশালী সুলতানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হতো। এজন্য হিন্দুদের সহযোগিতার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। অনেক হিন্দু জমিদার ও সমরনায়কেরা বাংলার সুলতানদের জন্য নিজেদের জীবন পর্যন্ত দান করেন।[২৯] এর প্রতিদানে ইলিয়াস শাহী সুলতানেরা হিন্দুদেরকে উচ্চ রাজপদে নিযুক্ত করেন।[৩০] পরে বিভিন্ন সময়ে সুলতানদের দরবারে আমীর-অমাত্যদের মধ্যে দলীয় রাজনীতি আরম্ভ হয়। স্বভাবতই হিন্দুরাও এই দলীয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করে। সুলতান সিকান্দার শাহের রাজত্বকালে রাজনৈতিক সংকট চরম আকার ধারণ করে এবং সুলতানের পুত্র গিয়াস উদ্-দীন পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। আমীর, আমাত্য ও সেনানায়কেরা দুই দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে এবং যুদ্ধে সুলতান নিহত হন।[৩১] খুব সম্ভব রাজা গণেশ গিয়াস উদ্-দীনের পক্ষ অবলম্বন করেছিলেন। এজন্য গিয়াস উদ্-দীন আজম শাহ ক্ষমতায় বসে পুরস্কার হিসেবে গণেশকে উচ্চপদ দান করেন।[৩২]

---

[২৩] Ibn Battutah, *Rihlah of Ibn Battutah*, Text Trans. & (ed.), Mahdi Hussain (Baroda : Oriental Institute, 1953), p. 131.

[২৪] *Tarikh-i-Firuz Shahi,* Text (ed.), Sayyid Ahmad Khan , p. 593.

[২৫] *Tabaqat-i Nasiri,* Vol. I, Text (ed.), Abdul Hai Habibi, p. 455.

[২৬] এম. এ. রহিম, *বাংলার ইতিহাস সুলতানী আমল*, পৃ. ২৩৫।

[২৭] এম. এ. রহিম, *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস*, প্রথম খণ্ড, পৃ. ২৯২।

[২৮] তদেব।

[২৯] K. R. Qanunga, *History of Bengal,* p. 77; *বাংলার ইতিহাস সুলতানী আমল*, পৃ. ২৩৮।

[৩০] *Tarikh-i-Firuz Shahi,* Text (ed.), Sayyid Ahmad Khan, p. 97.

[৩১] এম. এ. রহিম, *বাংলার ইতিহাস সুলতানী আমল*, পৃ. ২৩৮।

[৩২] Shams Siraj Afif, *Tarikh-i-Firuz Shahi*, Elliot & Dowson (ed.), *History of India*, Vol. III (Allahabad : Kitab Mahal), p. 135.

প্রায় সকল ইতিহাস গ্রন্থেই গণেশের ক্ষমতা লাভের বিষয়ে উল্লেখ থাকলেও প্রকৃতপক্ষে তিনি যে বাংলার সিংহাসনে বসেছিলেন প্রামাণিক তথ্য প্রমাণের অভাবে তা নিশ্চিত করে বলা যায় না। অবশ্য মুসলমান সুফিরা বাংলার সুলতানদের রাষ্ট্রীয় নীতিতে মুসলিম রাজ্যে হিন্দুদের উচ্চপদ প্রাপ্তি সুনজরে দেখেননি। বিহারের দরবেশ মুজাফ্ফর শামস-বলখী ও নূর কুতব উল আলম সুলতান আজম শাহকে এ ব্যাপারে সতর্ক করে দেন।[৩৩] সুলতান বিষয়টির প্রতি গুরুত্ব দিয়ে গণেশের ক্ষমতা খর্ব করার চেষ্টা করেন। কিন্তু সুযোগ একবার দেওয়া হলে তা প্রত্যাহার করা বিপজ্জনক। পরবর্তীতে দেখা যায় সুলতান আজম শাহ, তাঁর পুত্র সাইফ-উদ্-দীন হামজা শাহ, তদীয় পুত্র মোহাম্মদ শাহ এবং সুলতানের ক্রীতদাস বায়েজীদ শাহ গণেশের চক্রান্তে নিহত হন।[৩৪] বায়েজীদের পুত্র ফীরূজ শাহ গণেশের বিরুদ্ধে দাঁড়ান, তবে টিকতে পারেননি। এভাবে রাজবংশের আর কেউ যখন অবশিষ্ট ছিল না তখন গণেশ তাঁর মুখোশ খুলে প্রকৃত চেহারা উন্মোচন করেন।

সুফি দরবেশগণ বাংলার মুসলিম রাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থায় ইসলামি নীতির সমর্থক ছিলেন। তাঁরা সাধারণত রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারণের ব্যাপারে কোনোরূপ হস্তক্ষেপ করতেন না। কিন্তু মুসলিম রাষ্ট্র ও সমাজের বিপদের দিনে তাঁরা কখনও নির্বিকার থাকেননি। বাংলার ইলিয়াস শাহী সুলতানগণ রাজকার্যে অধিক সংখ্যায় হিন্দুদের নিয়োগ করার নীতি গ্রহণ করেন। রাষ্ট্রের দায়িত্বপূর্ণ পদও তাদের উপর ন্যস্ত করেন। এ ধরনের রাষ্ট্রীয় নীতি অনুসরণ করে সুলতানগণ উত্তর ভারতের সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে তাঁদের শক্তি বৃদ্ধি করতে এবং রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব অক্ষুণ্ন রাখতে চেয়েছিলেন।[৩৫] সুলতানগণ তাঁদের সালতানাত রক্ষার্থে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের সহযোগিতা লাভের প্রয়োজন অনুভব করেন। উপরন্তু, বাঙালি অধিবাসীদের স্বদেশ প্রেমের উপর তাদের শক্তির উৎস গড়ে তুলতে ইচ্ছা করেছিলেন। কিন্তু ঐ সময়ের দরবেশ ও উলামা সম্প্রদায় রাজ্যের দায়িত্বপূর্ণ পদে হিন্দুদের নিয়োগের রাষ্ট্রীয় নীতি অসমীচীন বলে মনে করেন। এক্ষেত্রে শেখ আলা-উল হক পরিষ্কার বুঝেছিলেন যে, এ ধরনের জাতীয় নীতি অনুসরণের মধ্যে বাংলার মুসলমানদের জন্য বিপদের সম্ভাবনা নিহিত আছে। এ কারণে উক্ত সুফি সুলতান সিকান্দার শাহের নিকট এ সম্পর্কে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেন।[৩৬] তারপরও সুলতান তাঁর কথায় কোনোরূপ কর্ণপাত করেননি। উপরন্তু, পাণ্ডুয়ার অধিবাসীদের উপর শেখের বিরাট প্রভাবে শঙ্কিত হয়ে তিনি তাঁকে সোনারগাঁওয়ে নির্বাসিত করেন।[৩৭] পরবর্তীকালে সংঘটিত ঘটনাবলির পরিপ্রেক্ষিতে দেখা যায় যে, শেখ আলা-উল হক রাষ্ট্রীয় নীতির পর্যালোচনায় সম্পূর্ণ অভ্রান্ত ছিলেন।

৩. সৈয়দ বংশের শাসনামল

বাংলায় সৈয়দ বংশের রাজত্বকালে আরও উদার শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনের মাধ্যমে হিন্দুরা রাষ্ট্রীয় কার্যে ব্যাপকভাবে উন্নীত হয়। এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা আলা উদ্-দীন হোসেন শাহ নিষ্ঠাবান মুসলমান হলেও হিন্দুদের প্রতি উদারভাব পোষণ করতেন। ইলিয়াস শাহী আমল হতে হিন্দুরা উচ্চ রাজপদে নিযুক্ত হতো। পরবর্তী ইলিয়াসশাহী সুলতানেরা পূর্ববর্তী সুলতানদের নীতি অনুসরণ করতেন। হোসেন শাহ

---

[৩৩] Henry Beveridge, "Rajah Kans," *Journal of the Asiatic Society of Bengal,* Part. I, Vol. LXI, Calcutta, 1892, p. 87.

[৩৪] এম. এ. রহিম, *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস*, প্রথম খণ্ড, পৃ. ২৯৩।

[৩৫] *Tarikh-i-Firuz Shahi,* Text (ed.), Sayyid Ahmad Khan, p. 108.

[৩৬] এম. এ. রহিম, *বাংলার ইতিহাস সুলতানী আমল*, পৃ. ২৪২।

[৩৭] K. R. Qanunga, *History of Bengal,* p. 89.

তারই ধারাবাহিকতায় এই নিয়ম অনুসরণ করে হিন্দুদের উচ্চপদে নিযুক্ত করেন।[৩৮] সুলতান আলা উদ্-দীন হোসেন শাহের রাজত্বকালে দুইজন ব্রাহ্মণ রূপ এবং সনাতন রাজদরবারের উচ্চ ও দায়িত্বপূর্ণ পদমর্যাদা লাভ করেন।[৩৯] রূপ সুলতানের দবীর-ই-খাসের (মুখ্য সচিব) গুরুত্বপূর্ণ পদ লাভ করেন। তদীয় জ্যেষ্ঠভ্রাতা সনাতন সাকের-ই-মালিকের পদে (রাষ্ট্রমন্ত্রী) নিযুক্ত হন।[৪০] মুসলিম রাষ্ট্রে এই ভ্রাতৃদ্বয়ের উচ্চ সম্মান ও প্রভাবের কথা সমসাময়িক বাংলা সাহিত্যেও প্রতিফলিত হয়েছে। সনাতনের বড় ভাই রঘুনন্দন এবং ছোট ভাই বল্লভও উচ্চ রাজপদে নিযুক্ত ছিলেন। বল্লভের উপাধি ছিল অনুপম মল্লিক।[৪১] রূপ সনাতনের ভগ্নিপতি শ্রীকান্তও রাজসরকারে চাকুরি করতেন। তাঁর কার্যস্থান ছিল হাজীপুরে এবং সেখানে তিনি ঘোড়া ক্রয়ের কাজে লিপ্ত ছিলেন।[৪২] কেশব বসু ছিলেন রাজার দেহরক্ষীদের নায়ক। তিনি রাজার নিকট হতে খান ও ছত্রী উপাধি লাভ করেন।[৪৩] সুবুদ্ধি রায় ছিলেন গৌড়ের কোতওয়াল। মুকুন্দদাস ছিলেন সুলতানের ব্যক্তিগত চিকিৎসক। তাঁর পিতা নারায় দাস সুলতান বারবক শাহের চিকিৎসক ছিলেন।[৪৪] এতে দেখা যায় তারা পুরুষানুক্রমে রাজবৈদ্য ছিলেন। এছাড়াও রামচন্দ্র খান, চিরঞ্জীব সেন, যশোরাজ খান, দামোদর, কবি রঞ্জন, হিরণ্য দাস, গোবর্ধন দাস, গোপাল চক্রবর্তী ইত্যাদি আরও অনেক হিন্দু রাজকর্মচারীর নাম পাওয়া যায়। এজন্য হিন্দু কবি বিজয় গুপ্ত বাংলার সুলতান হোসেন শাহের জনহিতকর কার্যের দ্বারা তার রাজ্যের প্রজাদের সুখ শান্তির ব্যবস্থা করার জন্য উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন।[৪৫] কবি শ্রীকর নন্দী সুলতান হোসেন শাহ, তার পুত্র নসরত শাহ এবং চট্টগ্রামের শাসনকর্তা ছুটি খানের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। তিনি লিখেছেন, নসরত শাহ একজন প্রসিদ্ধ রাজা। তিনি সর্বদা রামের মতো তাঁর প্রজাদের প্রতি যত্নবান, হোসেন শাহ জগতের প্রভু। তিনি তাঁর রাজ্য নিরপেক্ষতার সঙ্গে শাসন করেন। প্রশাসনিক কর্মকর্তা ছুটি খানকেও কবি একই ভাষায় প্রশংসা করেছেন।

সম্প্রতি সুখময় মুখোপাধ্যায় অভিমত প্রকাশ করেন যে, হোসেন শাহ কর্তৃক হিন্দুদের উচ্চ রাজপদে নিয়োগের দ্বারা হিন্দুদের প্রতি তাঁর উদার মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায় না। তাঁর মতে, সব সময়ে সমস্ত কাজের জন্য যোগ্য মুসলমান কর্মচারী পাওয়া যেত না বলে হিন্দুদের গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগের প্রথা বাংলায় অনেকদিন থেকেই প্রচলিত ছিল।[৪৬]

কিন্তু তাঁর এ অভিযোগ অযৌক্তিক। কেননা আরব, তুর্কিস্থান এবং মধ্য-এশিয়া থেকে শিক্ষিত এবং প্রশাসনিক দক্ষতাসম্পন্ন মুসলমানেরা প্রায়ই ভারত উপমহাদেশে আগমন করতো এবং সুলতানি ও মুঘল আমলে উচ্চ রাজপদ লাভ করতো। তারই ধারাবাহিকতায় বাংলায় বহিরাগত মুসলমানদের আগমনের ধারা তখনও অব্যাহত ছিল। সুতরাং বাংলায় যোগ্যতাসম্পন্ন মুসলমান কর্মচারীর অভাব ছিল

---

[৩৮] কৃষ্ণদাস কবিরাজ, *চৈতন্যচরিতামৃত*, সুবোধচন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত (কলকাতা, ১৯৪৪), পৃ. ১৪০।

[৩৯] J. N. Sarkar (ed.), *History of Bengal*, Vol. II (Dacca : University of Dacca, 2nd Impression, 1972), p. 68.

[৪০] কৃষ্ণদাস কবিরাজ, *চৈতন্যচরিতামৃত*, পৃ. ১৩৮ ও ৩০৮।

[৪১] সুখময় মুখোপাধ্যায়, *বাংলার ইতিহাস, ১২০৪-১৫৭৬* (ঢাকা : খান ব্রাদার্স এ্যান্ড কোম্পানি, ২০০০), পৃ. ৪০১।

[৪২] এম. এ. রহিম, *বাংলার ইতিহাস সুলতানী আমল*, পৃ. ৩৩০।

[৪৩] সুখময় মুখোপাধ্যায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪০১-৪০২।

[৪৪] J. N. Sarkar (ed.), *History of Bengal*, p. 72.

[৪৫] এম. এ. রহিম, *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস*, প্রথম খণ্ড, পৃ. ২৯৩।

[৪৬] সুখময় মুখোপাধ্যায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪০৬।

এমন অভিযোগ কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। ইলিয়াসশাহী শাসনামল হতে হিন্দুরা উচ্চ রাজপদে নিযুক্ত হতেন, পরবর্তী সুলতানেরা পূর্ববর্তী সুলতানদের নীতি অনুসরণ করতেন এবং হোসেন শাহ এই নিয়ম অনুসরণ করে যোগ্যতাসম্পন্ন হিন্দুদের উচ্চপদে নিয়োগ দেন। এতে একদিকে যেমন শাসনকার্যে তাঁর বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতার প্রমাণ পাওয়া যায় অন্যদিকে তেমনি হিন্দুদের প্রতি তাঁর উদার মনোভাবের পরিচয় বহন করে।

বাংলা সাহিত্যের দৃষ্টান্ত থেকে জানা যায় যে, সাধারণ হিন্দু-মুসলমান সমানভাবে শাসনকর্তাদের প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে। 'চৈতন্যচরিতামৃত' থেকে জানা যায়, নবদ্বীপের পথে পথে সারা রাতব্যাপী শ্রীচৈতন্য ও তার শিষ্যদের নাম-সংকীর্তনে হিন্দুদের একটি শ্রেণি বিরক্ত হয়েছিল। বৈষ্ণবদের এ বিরক্তিকর কার্যাবলি বন্ধ করার জন্য তারা কাজীকে অনুরোধ জানায়। অভিযোগে বলা হয়, আপনি গ্রাম্য সমাজের প্রশাসনের প্রধান ব্যক্তি এবং অভিভাবক (ঠাকুর)। আপনি নিমাইকে (শ্রীচৈতন্য) ডেকে এনে তাকে ধর্মবিরোধী কার্যাবলি থেকে নিবৃত্ত হতে নির্দেশ দেন। সে অনুযায়ী কাজী শ্রীচৈতন্যকে নবদ্বীপের রাস্তায় রাস্তায় রাতে সংকীর্তন বন্ধ করার আদেশ দেন।[৪৭] শ্রীচৈতন্য গৌড়ের সন্নিকটে রামকেলী নামক গ্রামে আগমন করলে সুলতান হোসেন শাহের নিকট তার বিরুদ্ধে এ ধরনের অভিযোগ আনয়ন করা হয়। সুলতান বিভিন্ন সূত্র থেকে শ্রীচৈতন্যের ধর্মীয় কার্যাবলি ও শিক্ষাদীক্ষা সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করেন। ফলে সুলতান এ মর্মে নির্দেশ জারি করেন যে, হিন্দু-মুসলমান কেউ যেন বৈষ্ণব গুরুর ধর্মীয় আদর্শ ও শিক্ষায় বাধা প্রদান না করে।[৪৮] এ দৃষ্টান্ত থেকে প্রতীয়মান হয় যে, মুসলমান সুলতানগণ ছিলেন হিন্দু সমাজেরও অভিভাবক এবং হিন্দুদের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও উন্নতির পৃষ্ঠপোষক।

উপসংহার

উপরোক্ত আলোচনায় এটি প্রতীয়মান হয় যে, বাংলার শাসকগণ ইসলামি সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতা করলেও সমাজে বসবাসকারী অন্যান্য সকল সম্প্রদায়ের জন্য রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছিলেন। শাসক শ্রেণি হওয়া সত্ত্বেও রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারণে একচেটিয়া নীতি অনুসরণ করেননি। হিন্দুদের সেনাপতি, উজির, দেওয়ান, ব্যক্তিগত কর্মসচিব এবং অন্যান্য দায়িত্বপূর্ণ ও বিশ্বস্ত পদে নিয়োগের ব্যাপারে মুসলিম শাসকদের উদার নীতির পরিচয় বহন করে। এই নীতির ভিত্তিতে তারা বাংলার দুইটি সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা সমঝোতা ও সহযোগিতার পরিবেশ সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন। অবশ্য রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ পদে হিন্দুদেরকে নিয়োগের উদার নীতির কারণে মাঝে মাঝে বিপদের সৃষ্টি হয়েছে। হিন্দু রাজা গণেশ সুযোগের সদ্ব্যবহার করে রাজনৈতিক কলাকৌশলে মুসলমানদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে খুব অল্প সময়ের জন্য রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পদ দখল করে। বিখ্যাত সুফি নূর কুতুব-উল-আলম এবং আশরাফ জাহাঙ্গীর সিমনানীর সময়োপযোগী হস্তক্ষেপের ফলে তৎকালে বাংলার মুসলিম রাষ্ট্র রক্ষা পায়। অবশ্য এটি একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা হিসেবে বিবেচিত হয়। কেননা সুলতানি বাংলায় আরও অনেক দৃষ্টান্ত থেকে প্রতীয়মান হয় যে, শাসকদের উদার নীতির কারণে রাষ্ট্রীয় নীতি-নির্ধারণে তারা হিন্দুদের নিকট হতে বিভিন্ন সময়ে অকুণ্ঠ সমর্থন পেয়েছিলেন।

---

[৪৭] এম. এ. রহিম, *বাংলার ইতিহাস সুলতানী আমল*, পৃ. ৩০১। J. N. Sarkar (ed.), *History of Bengal*, p. 98.

[৪৮] কৃষ্ণদাস কবিরাজ, *চৈতন্যচরিতামৃত*, পৃ. ৩০৮।

ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ জার্নাল
সংখ্যা ২৩ (১৪২২ বঙ্গাব্দ)

একাত্তরের অসহযোগ আন্দোলন: বৃহত্তর কুষ্টিয়া জেলা

মোঃ আরিফুর রহমান*

Abstract: Bangladesh was consisted of 19 districts during the liberation war in 1971. Kushtia was one of them. The district of Kushtia has a long and rich history about the movement. The non-cooperation movement was commenced in March 1971. The people of Kushtia played vital role in non-cooperation movement like that of whole East-Bengal. In this period struggle committee is consisted of almost every village, union and sub-division of Kushtia. The people of all stages of the dirstrict started primary preparation for the War. The people of this district were involved in the armed struggle from the non-cooperation movement till Independent.

ভূমিকা

বাংলাদেশের ইতিহাসের অন্যতম তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা ১৯৭১ সালের মার্চ মাসের অসহযোগ আন্দোলন। সুদূর অতীতকাল থেকেই কুষ্টিয়া অঞ্চলের মানুষ বিভিন্ন রাজনৈতিক আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে তৎকালীন নদীয়া জেলা তথা বর্তমান কুষ্টিয়া অঞ্চলের মানুষের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় ওহাবি আন্দোলন, ফরাজি আন্দোলন, সিপাহি বিদ্রোহ, নীল বিদ্রোহে অবিভক্ত কুষ্টিয়া জেলার মানুষের রয়েছে সংগ্রামী ভূমিকা। পরবর্তী কালে নবগঠিত পাকিস্তান রাষ্ট্রে বাঙালি জাতির স্বাধিকার আন্দোলন পর্বে বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন, চুয়ান্নর যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, বাষট্টির শিক্ষা আন্দোলন, ছেষট্টির ৬ দফা দাবি আদায়ের আন্দোলন এবং উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান সংঘটিত হয়।[১] ১৯৭০ সালে পাকিস্তানের প্রথম সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে পূর্ববাংলার মানুষ নিরঙ্কুশ বিজয় লাভ করে। অবশেষে সেই নির্বাচনের হাত ধরে একাত্তরের মার্চের অসহযোগ আন্দোলন বাংলাদেশের ইতিহাসে একটি মাইল ফলক হিসেবে চিহ্নিত হয়ে রয়েছে। অসহযোগ আন্দোলনের মাধ্যমেই সূত্রপাত হয় দীর্ঘ নয় মাসের সশস্ত্র প্রতিরোধ আন্দোলন।

বৃহত্তর কুষ্টিয়া

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান জন্মের সময় কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা ও মেহেরপুর মহকুমার কিছু অংশ নিয়ে বর্তমান কুষ্টিয়া জেলা গঠিত হয়। ভারত বিভক্তির সময়ে নবগঠিত জেলার নাম রাখা হয় 'নদীয়া'। ১৯৪৭

---

* সহকারী অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

[১] আতিউর রহমান, *অসহযোগের দিনগুলি: মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতিপর্ব* (ঢাকা: সাহিত্য প্রকাশ, ২০০৪), পৃ. ১১।

সালের অক্টোবর মাসে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সৈয়দ মুর্তাজা আলী কাজের সুবিধার জন্য 'নদীয়া' নাম পরিবর্তন করে 'কুষ্টিয়া' নাম রাখেন।[২] ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ জন্মের সময়ে ১৯টি জেলার মধ্যে কুষ্টিয়া ছিল অন্যতম। পরবর্তীকালে ১৯৮৪ সালে সমগ্র বাংলাদেশকে ৬৪টি জেলায় বিভক্ত করা হয়।[৩] তখন বৃহত্তর কুষ্টিয়া জেলা ভেঙে কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা ও মেহেরপুর নামে তিনটি পৃথক জেলা গঠিত হয়।

অসহযোগ-পূর্ব ঘটনা প্রবাহ: ১৯৪৭-৭০

সাম্প্রদায়িকতার চাদরে ঢাকা মুসলিম জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে পূর্ববাংলার মানুষ পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টির জন্য আন্দোলন করে। পূর্ববাংলার মানুষ যে আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়ে পাকিস্তান আন্দোলনে শরিক হয়েছিল, তাদের সেই মোহ কাটতে খুব বেশি সময় লাগেনি। পশ্চিম পাকিস্তানিরা শুরুতে বাংলা ভাষা ও বাঙালি সংস্কৃতিকে উপেক্ষা করে বাঙালিদের উপর জোর করে উর্দু ভাষা চাপিয়ে দেওয়ার চক্রান্ত করে। তখন থেকেই মূলত পূর্ববাংলা তথা কুষ্টিয়া জেলার মানুষের সচেতনতা লক্ষ করা যায়।

ভাষা আন্দোলনে কুষ্টিয়াবাসী গৌরবময় অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। ভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে ১৯৪৮ সালের ১৬ই আগস্ট কুষ্টিয়া জেলার চুয়াডাঙ্গা মহকুমায় বাংলা ভাষাকে উপজীব্য করে শ্রীমন্ত টাউন হলে 'আজি হতে শতবর্ষ পরে' নামে একটি নাটক মঞ্চস্থ হয়।[৪] সেদিন বিপুল সংখ্যক দর্শক নাটকটি উপভোগ করেছিল। ঐদিন থেকে চুয়াডাঙ্গাবাসীর মনে রাষ্ট্রভাষা বাংলার পক্ষে ধীরে ধীরে জনমত গড়ে উঠতে শুরু করে। এরপর বিভিন্ন সময়ে রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে সমগ্র জেলায় সভা, সমাবেশ, মিছিল ও মিটিং হয়েছে। ১৯৫২ সালে জানুয়ারি মাসের শেষ দিকে ভাষা আন্দোলন পুনরুজ্জীবিত হয়। ৩১শে জানুয়ারি তারিখে ৪০ সদস্য বিশিষ্ট সর্বদলীয় 'রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' গঠিত হয়।[৫]

২১শে ফেব্রুয়ারি তারিখে সংগ্রাম পরিষদ পূর্ববাংলায় হরতাল, বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ ঘোষণা করে। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের প্রতিনিধি হিসেবে চুয়াডাঙ্গার সন্তান ওহিদ হোসেন জোয়ারদার কুষ্টিয়া জেলাতে আন্দোলন বেগবান করেন। ২১শে ফেব্রুয়ারিতে ঢাকায় ১৪৪ ধারা জারি করা হয়। ২১শে ফেব্রুয়ারি ঢাকায় ছাত্রদের মিছিলে গুলিবর্ষণের খবর শুনে কুষ্টিয়ার চুয়াডাঙ্গা মহকুমায় ২২শে ফেব্রুয়ারি বিকেলে ডা. আসহাব-উল হকের সভাপতিত্বে ভি.জে হাইস্কুল মাঠে প্রতিবাদ সভার আয়োজন করা হয়।[৬] ২৩শে ফেব্রুয়ারি ভি. জে. হাইস্কুল ও বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে এক প্রতিবাদ মিছিল বের করে। ২৩শে ফেব্রুয়ারি কুষ্টিয়া বার এসোসিয়েশনে আইনজীবীসহ সর্বস্তরের মানুষের সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় দুটি প্রস্তাব গৃহীত হয়:

১. এই সভা বাংলাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার দাবি করছে;
২. এই সভা সরকারের দমননীতির ফলে শহিদ ব্যক্তিদের আত্মীয় স্বজনদের প্রতি গভীর সহানুভূতি জ্ঞাপন করছে;

২১শে ফেব্রুয়ারি তারিখের ঘটনার প্রেক্ষিতে সমগ্র পূর্বপাকিস্তানের ন্যায় মেহেরপুরেও দুদিন হরতাল পালিত হয়। এ সম্পর্কে ৯ই মার্চ তারিখে সাপ্তাহিক সৈনিক পত্রিকায় লেখা হয়:

---

[২] শ. ম. শওকত আলী, *কুষ্টিয়ার ইতিহাস* (কুষ্টিয়া: মনিকা কুটির, ২০১২), পৃ. ২।

[৩] এমাজউদ্দীন আহমেদ, *রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কথা* (ঢাকা: বাংলাদেশ বুক করপোরেশন লিমিটেড, ১৯৯৪), পৃ. ৩০৬।

[৪] রাজিব আহমেদ, *চুয়াডাঙ্গা জেলার মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস* (ঢাকা: গতিধারা, ২০০৮), পৃ. ৬৭।

[৫] মোঃ মাহবুবর রহমান, *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৯৪৭-৭১* (ঢাকা: সময় প্রকাশন, ১৯৯৯), পৃ. ৯৪।

[৬] রাজিব আহমেদ, *চুয়াডাঙ্গা জেলার ইতিহাস* (ঢাকা: গতিধারা, ২০০৮), পৃ. ১০২।

> মেহেরপুর উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ের ছাত্ররা গত ২২ ও ২৪শে ফেব্রুয়ারি হরতাল পালন করে। বিক্ষোভ মিছিল শহরের বিভিন্ন রাস্তা প্রদক্ষিণকালে বিক্ষোভকারীরা 'নুরুল আমীনের পদত্যাগ চাই', 'পুলিশী জুলুমের কৈফিয়ত চাই', 'রাষ্টভাষা বাংলা চাই' শ্লোগান দিতে থাকে।[৭]

২১শে ফেব্রুয়ারির পর সমগ্র কুষ্টিয়া জেলায় মিছিল, সমাবেশ, পিকেটিং ও অন্যান্য তৎপরতায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন অ্যাডভোকেট আব্দুল মতিন, মহিউদ্দিন মিয়া, সাখাওয়াৎ হোসেন, কাওছার আলী, শান্তি ঘোষ, নারায়ণ চক্রবর্তী ও যতীন্দ্রনাথ ঘোষ প্রমুখ। ২৫ ও ২৬শে ফেব্রুয়ারি চুয়াডাঙ্গার ঘটনা প্রবাহ প্রসঙ্গে আজাদ পত্রিকায় বলা হয়:

> চুয়াডাঙ্গা: ২১ ও ২২শে ফেব্রুয়ারি ঢাকায় পুলিশের গুলিতে নিহতদের স্মরণে ও বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে গত ২৫ ও ২৬শে ফেব্রুয়ারি এখানে পূর্ণ হরতাল পালন এবং ২৫শে ফেব্রুয়ারি বিরাট জনসভা হয়।[৮]

১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনকে কেন্দ্র করে কুষ্টিয়া জেলার মানুষের রাজনৈতিক সচেতনতা লক্ষ করা যায়। স্বাধীনতার পর ১৯৫৪ সালে পাকিস্তানে প্রথম কোন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। আওয়ামী মুসলিম লীগের নেতৃত্বে যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয়। যুক্তফ্রন্ট বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাবসহ ২১ দফা দাবি পেশ করে। ২১ দফা দাবিকে ভিত্তি করে নির্বাচনী প্রচারণা শুরু হয়। কুষ্টিয়া জেলার সর্বস্তরের মানুষ যুক্তফ্রন্টের পক্ষে অবস্থান নেন। উক্ত নির্বাচনে কুষ্টিয়া থেকে সবগুলি আসনে মুসলিম লীগ বিরোধী যুক্তফ্রন্টের প্রার্থীগণ বিপুল ভোটে জয়লাভ করেন।[৯]

১৯৫২ সালের পর থেকে পূর্ববাংলার প্রায় সকল স্কুল কলেজে অমর একুশে উদ্‌যাপিত হতে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৫৬ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি মেহেরপুর শহরের ইংরেজি উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্ররা সরকারি প্রতিরোধ উপেক্ষা করে মিছিল বের করে। গার্লস স্কুলের মেয়েরা শুক্লা গাঙ্গুলীর নেতৃত্বে বেশ কিছু ছাত্রী এসে মিছিলে যোগ দেয়।[১০] উক্ত ঘটনার প্রেক্ষিতে ইংরেজি বিদ্যালয়ের ৭ জন ছাত্রকে স্কুল থেকে বহিষ্কার করা হয়। একযোগে ৭ জন ছাত্রকে বহিষ্কারের ঘটনা তৎকালীন কুষ্টিয়ার রাজনৈতিক ও সামাজিক অঙ্গনে প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি করে। পরবর্তীতে কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসকের উদ্যোগে দীর্ঘ দিন পর হলেও ঐ ৭ জন দেশপ্রেমিক ছাত্রের বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার করা হয়। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগকে পরাজিত করে যুক্তফ্রন্ট জয়লাভ করে। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের চক্রান্তে মাত্র চার বছরে সাতটি মন্ত্রীসভার পতন ঘটে এবং তিনবার গভর্নরের শাসন জারি হয়।[১১] এমনই এক রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে ১৯৫৮ সালের ৭ই অক্টোবর প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মীর্জা সামরিক আইন জারি করেন। কিন্তু ২৭শে অক্টোবর (১৯৫৮) প্রেসিডেন্ট মীর্জাকে উৎখাত করে জেনারেল আইয়ুব খান পাকিস্তানের ক্ষমতায় বসেন।[১২] ৭ই অক্টোবর থেকে দেশে চলমান সামরিক শাসনের প্রতিবাদ জানাতে ১৯৫৮ সালের ২৭শে অক্টোবর মেহেরপুরের কালাচাঁদ হলে আওয়ামী লীগ বিশেষ বৈঠকের ডাক দেয়। আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমান ও মওলানা আব্দুর রশীদ

---

[৭] রফিকুর রশীদ, *মেহেরপুর জেলার মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস* (ঢাকা: গতিধারা, ২০০৯), পৃ. ৪২।

[৮] রাজিব আহমেদ, *চুয়াডাঙ্গা জেলার মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস*, পৃ. ৬৯।

[৯] শ. ম. শওকত আলী, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৯৬।

[১০] রফিকুর রশীদ, *মেহেরপুর জেলার মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস*, পৃ. ৪৫।

[১১] মো. মাহবুবর রহমান, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৩৬।

[১২] F.R. Khan, "Bangladesh Politics: A System of Patronage," *The Journal of the Institute of Bangladesh Studies*, vol. vi (Rajshahi University: 1982-83), p. 104.

তর্কবাগীশ সেই বিশেষ বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে শেখ মুজিব বলেন – 'দেশের রাজনীতিতে অশনীসংকেত দেখতে পাচ্ছি।' মেহেরপুরের ঘটনাকে কেন্দ্র করে পরদিন অর্থাৎ ২৮শে অক্টোবর যশোর থেকে শেখ মুজিবকে গ্রেফতার করা হয়।[১৩] ১৯৫৮ সালের ২৫শে অক্টোবর থেকে দেশে সমস্ত রাজনৈতিক দলের কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ করা হয়। এ সময় থেকে মূলত বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ও সামাজিক সংগঠনের ব্যানারে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন চালাতে থাকে। কুষ্টিয়া জেলাতেও এই সাংস্কৃতিক আন্দোলন লক্ষ করা যায়।

১৯৬২ সালে সারা দেশব্যাপী শুরু হয় ছাত্র আন্দোলন। ১৯৬২ সালের ৩০শে জানুয়ারি সোহরাওয়ার্দীর গ্রেফতার, শাসনতন্ত্র প্রণয়ন এবং শিক্ষানীতির ক্ষেত্রে শরিফ শিক্ষা কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়নের বিরুদ্ধে ঢাকায় চলছিল তুমুল ছাত্র আন্দোলন।[১৪] সেই সময় ছাত্রলীগ নেতা ইসমাঈল হোসেনের নেতৃত্বে মেহেরপুরে এর প্রতিবাদ জানানো হয়। ১৯৬৩ সালের মাঝামাঝি সময়ে আইয়ুব মন্ত্রিসভার যোগাযোগ মন্ত্রী মুসলিম লীগ নেতা সবুর খান কুষ্টিয়া সফরে এলে তাকে কালো পতাকা প্রদর্শন করা হয়। ১৯৬৫ সালের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের সময়ে সমগ্র পূর্ববাংলার ন্যায় সীমান্তবর্তী শহর কুষ্টিয়াও সম্পূর্ণরূপে অরক্ষিত ছিল।[১৫] আইয়ুব সরকারের পূর্ববাংলা সম্পর্কে এমন সীমাহীন উদাসীনতার মধ্যেই অনুষ্ঠিত হয় ১৯৬৫ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন। আইয়ুব খানের প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী ছিলেন ফাতিমা জিন্নাহ্। কুষ্টিয়ার আওয়ামী লীগ ও ন্যাপ নেতৃবৃন্দ নির্বাচনে ফাতিমা জিন্নাহ্‌র পক্ষে অবস্থান নেন। অ্যাডভোকেট আব্দুল হায়াত, অ্যাডভোকেট জিল্লুর রহমান, অ্যাডভোকেট আজগর আলী, আলী বকর, আ.কা.ম. ইদ্রিস, মফিজুর রহমান, মান্নান মাস্টার, ইসমাঈল হোসেন, কদম রসুল সকলেই এ নির্বাচনে সক্রিয় ভূমিকা রাখেন।[১৬] কিন্তু মৌলিক গণতন্ত্রীদের নির্বাচনী প্রহসনের মাধ্যমে আবার আইয়ুব খান ক্ষমতায় বসেন।

১৯৬৬ সালে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক আমাদের 'বাঁচার দাবি ৬ দফা কর্মসূচি' ঘোষিত হয়। অর্থনৈতিক মুক্তি ও প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের লক্ষ্যে ৬ দফা সমগ্র পূর্ববাংলায় আলোড়ন সৃষ্টি করে। ৬ দফার প্রচারণার লক্ষ্যে ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলাম, বাদল রশীদ, আজিজুর রহমান আক্কাস ও অ্যাডভোকেট আহসানউল্লাহসহ স্থানীয় অনেক নেতৃবৃন্দ গ্রাম-গ্রামান্তর চষে বেড়িয়েছেন।[১৭] মারফত আলী, শাজাহান খান, এ.কে. আশকারী, আউয়াল হক, লাল মিয়া ও সিরাজুল ইসলাম প্রমুখ ছাত্রলীগ কর্মীরা ৬ দফার প্রচারণায় কুষ্টিয়ায় ব্যাপক ভূমিকা পালন করেন। ৬ দফার সমর্থনে কুষ্টিয়া জেলার সাধারণ ছাত্ররাও ব্যাপক তৎপর ছিল। তৎকালীন মেহেরপুর ডিগ্রি কলেজের সহকারী সাধারণ সম্পাদক নজরুল ইসলামের (পরবর্তীতে গেরিলা মুক্তিযোদ্ধা) সাক্ষাৎকার থেকে জানা যায় – দৌলতপুর, মিরপুর ও গাংনী অঞ্চলের ছাত্রদের তৎপরতার কথা।[১৮] কুমারখালীর সাধারণ মানুষ ৬ দফার সমর্থনে মিছিল ও সমাবেশ করেন।[১৯] এ সময় ৬ দফার সমর্থনে আলমডাঙা, জীবননগর,

---

[১৩] রফিকুর রশীদ, *মেহেরপুর জেলার মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস*, পৃ.৪৫।

[১৪] মোহাম্মদ ফায়েক উজ্জামান, *মুজিবনগর সরকার ও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০৮), পৃ. ৩৯।

[১৫] A.M.A. Muhith, *Bangladesh: Emergence of a Nation* (Dhaka: University Press Ltd. 1992), p. 111.

[১৬] রফিকুর রশীদ, *মেহেরপুর জেলার মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস*, পৃ.৪৮।

[১৭] সাক্ষাৎকার: ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলাম, মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক, কুষ্টিয়া, তারিখ: ২৭.০৩.২০১৪।

[১৮] সাক্ষাৎকার: মোঃ নজরুল ইসলাম, গেরিলা মুক্তিযোদ্ধা, দৌলতপুর, কুষ্টিয়া, তারিখ: ১৩.০৮.২০১৩।

[১৯] সাক্ষাৎকার: মোঃ শহীদুল ইসলাম, যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা, কুমারখালী, কুষ্টিয়া, তারিখ: ০৬.০৪.২০১৪।

দামুড়হুদার রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, ছাত্র-জনতাও অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। এমনই এক প্রেক্ষাপটে আইয়ুব সরকারের শেষ দিকে পূর্ববাংলার উপর পশ্চিমাদের সাংস্কৃতিক আগ্রাসন লক্ষ করা যায়। আইয়ুব সরকার ১৯৬৭ সালের আগস্ট মাসে রেডিও-টেলিভিশনে রবীন্দ্র সংগীত প্রচার বন্ধ করে দেয়। এ সময়ে পশ্চিম পাকিস্তানিরা বাংলা ভাষা সংস্কার করে একটি 'জাতীয় ভাষা' প্রচারের অপচেষ্টা শুরু করে। এর ফলে সমগ্র পূর্ববাংলায় প্রতিবাদ আন্দোলন শুরু হয়। জাতীয় পর্যায়ের আন্দোলনের সমান্তরালে কুষ্টিয়ার মানুষও আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন করতে থাকে। ১৯৬৭ সালে মেহেরপুরে আত্মপ্রকাশ করে প্রগতিশীল সাহিত্য সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান 'মধুচক্র' ও 'প্রগতি পরিমেল'।[২০] এই সব প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সাংস্কৃতিক আন্দোলন দানা বাঁধতে থাকে।

উপরিউক্ত পরিস্থিতিতে পূর্ববাংলার আন্দোলনকে দমানোর লক্ষ্যে আইয়ুব সরকার ১৯৬৮ সালের ৬ই জানুয়ারি "রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যান্য" নামে একটি মিথ্যা মামলা করে। যেটি ইতিহাসে 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' নামে পরিচিত। এই মিথ্যা মামলার বিরুদ্ধে কুষ্টিয়ার বিভিন্ন জায়গায় বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ লক্ষ করা যায়। ১৯৬৮ সালে আইয়ুবের 'উন্নয়ন দশক (১৯৫৮-৬৮)' উদ্‌যাপনের বিপরীতে কুষ্টিয়ায় ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়ন যৌথভাবে 'কালো দশক' পালন করে।

৬ দফার আলোকে ছাত্র সংগ্রাম কমিটি ১৯৬৯ সালের ৪ঠা জানুয়ারি ১১ দফা কর্মসূচি জনসমক্ষে প্রকাশ করে। এতে সারাদেশের মতো কুষ্টিয়ার ছাত্র সমাজের মাঝেও চাঞ্চল্য লক্ষ করা যায়। কুষ্টিয়া কলেজের ছাত্ররা ১১ দফার সমর্থনে প্রচারণা শুরু করে। ভেড়ামারা পাইলট হাইস্কুলের ছাত্ররাও ১১ দফার সমর্থনে কাজ করে। এমনই এক উত্তাল পরিস্থিতিতে ১৯৬৯ সালের জানুয়ারি মাস থেকে শুরু হয় আইয়ুববিরোধী গণআন্দোলন। তখন আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার প্রধান আসামি শেখ মুজিবুর রহমান কারাগারে আটক ছিলেন। এরই মধ্যে এই মামলার আসামি সার্জেন্ট জহুরুল হককে ১৫ই ফেব্রুয়ারি তারিখে কারাগারের মধ্যেই নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। এই ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই ১৮ই ফেব্রুয়ারি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন প্রক্টর রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক ড. শামসুজ্জোহার হত্যাকাণ্ডে সমগ্র পূর্ববাংলার মানুষ অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মতো জেগে উঠে। হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে ১৯শে ফেব্রুয়ারি সকাল ১০টায় মেহেরপুর শহরের পৌর পার্কে হাজার হাজার মানুষের উপস্থিতিতে গায়েবানা জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। শহিদ শামসুজ্জোহার ত্যাগের প্রতি সম্মান জানাতে এদিন থেকে মেহেরপুরের পৌর পার্কটি শহিদ ড. শামসুজ্জোহার নামে নামকরণ করা হয়। ১৯শে ফেব্রুয়ারিতে ভোড়মারা পাইলট হাইস্কুল মাঠেও প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমগ্র পূর্ববাংলায় আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন তখন তুঙ্গে। অবশেষে বাধ্য হয়ে আইয়ুব সরকার ২০শে ফেব্রুয়ারি তারিখে ঘোষণা দেয় যে, আগরতলা মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার করে রাজবন্দীদের মুক্তি দেয়া হবে। এরূপ পরিস্থিতিতে ২১শে ফেব্রুয়ারিতে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের (কুষ্টিয়া) উদ্যোগে সমগ্র কুষ্টিয়া জেলাতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অমর একুশে উদ্‌যাপন করা হয়। ২২শে ফেব্রুয়ারি তারিখে শেখ মুজিবসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ মুক্তি লাভ করে। এ খবরে কুষ্টিয়ার প্রায় প্রতিটি অঞ্চলে উল্লসিত জনতা আনন্দ শোভাযাত্রা বের করে। অবশেষে গণআন্দোলনের মুখে সামরিক শাসক আইয়ুব খান ২৫শে মার্চ (১৯৬৯) তারিখে ক্ষমতা থেকে সরে যান। ক্ষমতায় বসেন আরেক সামরিক শাসক জেনারেল ইয়াহিয়া খান। ২৮শে নভেম্বর (১৯৬৯) তিনি সাধারণ নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করেন। রাজনৈতিক দলগুলোর উপর থেকে বিধি নিষেধ প্রত্যাহার করে নির্বাচনী প্রচারণা চালানোর সুযোগ করে দেন। ফলে পূর্ববাংলার রাজনৈতিক দলসহ সাধারণ মানুষের মধ্যে কর্মচাঞ্চল্য লক্ষ করা যায়।

---

[২০] রফিকুর রশীদ, *মেহেরপুর জেলার মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস*, পৃ. ৪৯।

কুষ্টিয়ায় আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে নির্বাচনী প্রচারণা শুরু হয়ে যায়। নির্বাচনী প্রচারণার অংশ হিসেবে বৃহত্তর কুষ্টিয়া জেলাকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়। জীবননগর ও দামুড়হুদার দায়িত্বে ছিলেন হাসানুল হক ইনু; আলমডাঙ্গা ও চুয়াডাঙ্গায় সেলুন জোয়ার্দার; মেহেরপুর ও গাংনীর দায়িত্বে আব্দুল মোমেন ও জিয়াউল বারী নোমান; মিরপুর ও দৌলতপুরের কিছু অংশে মারফত আলী; ভেড়ামারা ও দৌলতপুরের দায়িত্বে ছিলেন রশিদুল আলম।[২১] নির্বাচনী প্রচারণার পাশাপাশি কুষ্টিয়ায় পশ্চিম পাকিস্তান বিরোধী কর্মকাণ্ড লক্ষ করা যায়। ১৯৭০ সালের মে মাসে মঈন উদ্দীন নামে একজন দেশপ্রেমিক আলমডাঙ্গা থানায় পাকিস্তানি পতাকা পুড়িয়ে দেন।[২২] পূর্ববাংলায় পাকিস্তানি পতাকা পোড়ানোর ঘটনা সম্ভবত এটিই প্রথম ছিল। নির্বাচনী প্রচারাভিযানের অংশ হিসেবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবসহ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ আগস্ট মাসে (১৯৭০) কুষ্টিয়ায় আসেন। ২৭শে আগস্ট চুয়াডাঙ্গা কলেজ মাঠে বিশাল জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। কুষ্টিয়া জেলার সর্বত্র আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে প্রচারণা চলতে থাকে। জেলার এমন কোনো জায়গা নেই যেখানে নির্বাচনী সভা ও সমাবেশ হয়নি। কুষ্টিয়ার জনগণ তখন আওয়ামী লীগের নেতৃত্বের প্রতি এতটাই আস্থাশীল ছিল যে, অন্য কোনো রাজনৈতিক দল শক্ত কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সুযোগই পায়নি। যাহোক অবশেষে ১৯৭০ সালে ৭ ও ১৭ই ডিসেম্বর যথাক্রমে জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনের দিন ধার্য করা হয়। ১৯৭০ সালে কুষ্টিয়া জেলাতে ৪টি আসনে জাতীয় পরিষদ ও ৭টি আসনে প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। বিজয়ী সদস্যদের নাম নিম্নরূপ:

১৯৭০ সালে নির্বাচিত জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যগণের নাম

প্রার্থী	নির্বাচনী এলাকা	পরিষদ
১. ব্যারিস্টার আমীর-উল-ইসলাম	কুষ্টিয়া-কুমারখালী-খোকসা	জাতীয় পরিষদ
২. আজিজুর রহমান আক্কাস	মিরপুর-ভেড়ামারা-দৌলতপুর	,,
৩. ব্যারিস্টার বাদল রশীদ	চুয়াডাঙ্গা- জীবনগর-দামুড়হুদা-আলমডাঙ্গা	,,
৪. মহ: সহিউদ্দিন	মেহেরপুর-গাংনী	,,
৫. গোলাম কিবরিয়া	আলমডাঙ্গা-চুয়াডাঙ্গা	প্রাদেশিক পরিষদ
৬. আহসানউল্লাহ	কুষ্টিয়া সদর	,,
৭. আব্দুর রউফ চৌধুরী	মিরপুর-ভেড়ামারা	,,
৮. জহুরুল হক (রাজা মিয়া)	দৌলতপুর	,,
৯. ডা. আসহাব-উল হক	চুয়াডাঙ্গা	,,
১০. মহঃ নূরুল হক	গাংনী- মেহেরপুর	,,
১১. মহ: ইউনুস আলী	জীবননগর- দামুড়হুদা	,,

উৎস: সাক্ষাৎকার, আব্দুল মোমেন, মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক, কুষ্টিয়া, তারিখ: ০৭.০৪.২০১৪।

একাত্তরের অসহযোগ আন্দোলন

১৯৭১ সালের জানুয়ারি মাসে মুজিব-ইয়াহিয়া-ভুট্টো বৈঠক চলতে থাকে। ১৩ই ফেব্রুয়ারি তারিখে ইয়াহিয়া খান ঘোষণা দেন ৩রা মার্চ তারিখে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হবে। ১৯৭১ সালের ১লা মার্চ ইয়াহিয়া খান বেতার ভাষণে পূর্ব ঘোষিত ৩রা মার্চের জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্ট কালের জন্য স্থগিত ঘোষণা করেন। এর প্রতিবাদে কুষ্টিয়ায় তাৎক্ষণিকভাবে প্রতিবাদ মিছিল

[২১] সাক্ষাৎকার: আব্দুল মোমেন, মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক, কুষ্টিয়া, তারিখ: ০৭.০৪.২০১৪।

[২২] সাক্ষাৎকার: মঈন উদ্দীন, মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক, আলমডাঙ্গা, চুয়াডাঙ্গা, তারিখ: ২০.০৪.২০১৪।

বের করা হয়। বঙ্গবন্ধু ঐ দিন বিকেলে হোটেল পূর্বাণীতে সাংবাদিক সম্মেলনে ২রা মার্চ ঢাকা শহরে এবং ৩রা মার্চ সারাদেশে হরতাল আহ্বান করেন। এদিন বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ পেয়ে শাহজাহান সিরাজ, নূরে আলম সিদ্দিকী, আ. স. ম. আব্দুর রব ও আব্দুল কুদ্দুস মাখন এই চারজন "স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ" গঠন করেন।[২৩] ১লা মার্চের কুষ্টিয়া পরিস্থিতি সম্পর্কে আব্দুল মোমেন বলেন:

> কুষ্টিয়া সরকারি কলেজ মোড়ে আমিন ফার্মেসি নামে একটি ঔষধালয় ছিল। সেখানে রেডিও ভাষণে ৩রা মার্চের জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিতের ঘোষণা শুনি। তারপর কলেজ হোস্টেলের ছাত্রদের একত্রিত করি এবং তাৎক্ষণিকভাবে মিছিল বের করি। ২রা মার্চ আমি, আব্দুল জলিল, শামসুল হাদী, শেখ জলিল ও মারফত আলী এই পাঁচজন মিলে 'স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ' গঠন করি।[২৪]

২রা মার্চ সারা দেশের ন্যায় কুষ্টিয়া জেলাতেও স্বতঃস্ফূর্ত হরতাল পালিত হয়। স্কুল-কলেজ, কল-কারখানা, অফিস-আদালত ও ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠান সর্বত্র স্তব্ধতা নেমে আসে। এদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহাসিক বটতলায় ছাত্র-জনতার বিশাল সমাবেশে কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগ নেতৃবৃন্দ বাংলাদেশের মানচিত্র খচিত স্বাধীন বাংলার পতাকা উত্তোলন করে। বিকেলে পল্টন ও বায়তুল মোকাররমে বিশাল সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমগ্র ঢাকা নগরী জনসমুদ্রে পরিণত হয়। ২রা মার্চ সন্ধ্যার পর হঠাৎ করে সন্ধ্যা ৭টা থেকে সকাল ৭টা পর্যন্ত ঢাকা শহরে কারফিউ জারি করা হয়। সান্ধ্য আইনের প্রতিবাদে তাৎক্ষণিকভাবে কুষ্টিয়া, মেহেরপুর ও চুয়াডাঙ্গার পথে পথে জনতার ঢল নামে। ৩রা মার্চ অপরাহ্নে পল্টন ময়দানে লক্ষ লক্ষ মানুষের উপস্থিতিতে এক বিশাল জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। বঙ্গবন্ধু জনসভা থেকে পরবর্তী কর্মসূচি ঘোষণা করেন। ৬ই মার্চ পর্যন্ত প্রতিদিন সকাল ৬টা থেকে ২টা পর্যন্ত হরতাল এবং ৭ই মার্চ তারিখে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে (তৎকালীন রেসকোর্স ময়দান) ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা ঘোষণার কথা বলেন। ৩রা মার্চ কুষ্টিয়ার ঘটনাবলি সম্পর্কে তৎকালীন বৃহত্তর জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি ও কুষ্টিয়া জেলা স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়ক মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল জলিল সাক্ষাৎকারে বলেন:

> ৩রা মার্চ কুষ্টিয়া ইসলামিয়া কলেজ মাঠে হাজার হাজার ছাত্র-জনতার উপস্থিতিতে পাকিস্তানি পাতাকায় অগ্নিসংযোগ করা হয় এবং আমি আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করি। স্বাধীনতার ইশতেহার পাঠ করেন জেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক মুক্তিযোদ্ধা শহিদ শামসুল হাদী। উল্লেখযোগ্য ছাত্র নেতাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন আব্দুল বারী, আব্দুল মোমেন, শামসুল আলম দুদু, জাহিদা রোকেয়া, কাইয়ুম, সালাম, পাশা, জালাল, আবুল আহসান চৌধুরী, লোকমান হোসেন, শহিদুল ইসলাম, কিসলু, ফজলুল হক, জাফরী, মহিউদ্দিন, হেলাল, চন্দনাগসহ আরো অনেকে। আমরা জানতাম পাকিস্তান সরকার আমাদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলা করবে। তবুও দেশ ও জাতীয় স্বার্থে আমাদের যে দণ্ডই দেওয়া হোক না কেন আমরা প্রস্তুত ছিলাম বলেই সেদিন এ দায়িত্ব পালন করতে পেরেছিলাম।[২৫]

একই দিনে মেহেরপুর ও গাংনীতে সর্বাত্মক হরতাল পালনের পাশাপাশি মিছিল ও সমাবেশ অব্যাহত থাকে। গাংনীতে 'কালো দিবস' ঘোষণা করে কালো পতাকা উত্তোলন করা হয়। এদিন খাদেমুল

---

[২৩] রবীন্দ্রনাথ ত্রিবেদী, *একাত্তরের দশ মাস* (ঢাকা: কাকলী প্রকাশন, ২০১২), পৃ. ২১।

[২৪] সাক্ষাৎকার: আব্দুল মোমেন, মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক, কুষ্টিয়া, তারিখ: ০৭.০৪.২০১৪।

[২৫] সাক্ষাৎকার: আব্দুল জলিল, আহ্বায়ক, স্বাধীন বাংলা ছাত্র-সংগ্রাম পরিষদ (কুষ্টিয়া), কুষ্টিয়া, তারিখ: ০৭.০৪.২০১৪।

ইসলামের নেতৃত্বে 'স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী' গঠিত হয়। ৪ঠা মার্চ গাংনীর প্রতিটি ইউনিয়নে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠনের উদ্যোগ নেওয়া হয়।[২৬] ইতিপূর্বে মিছিলে যে ধরনের শ্লোগান দেওয়া হতো, এ সময়ে শ্লোগানেও পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। যেমন – তোমার দেশ, আমার দেশ বাংলাদেশ বাংলাদেশ; বীর বাঙালি অস্ত্র ধরো, বাংলাদেশ স্বাধীন করো। ৩রা মার্চ তারিখে ইসলামিয়া কলেজে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের পর গ্রামাঞ্চলের জনগণও সক্রিয়ভাবে আন্দোলনের সাথে জড়িয়ে পড়েন। ৪রা মার্চ তারিখে কুষ্টিয়া শহরের থানা ট্রাফিক মোড় টেলিফোন অফিসের সামনে থেকে মোহিনী মিল এলাকা পর্যন্ত বিশাল বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয়।[২৭]

উত্তাল মার্চের পঞ্চম দিন এবং লাগাতার হরতালের চতুর্থ দিন টঙ্গিতে সশস্ত্র বাহিনীর গুলিতে ২ জন নিহত ও ৩০/৪০ জন গুরুতর আহত হয়।[২৮] ঢাকায় বিকেলে আওয়ামী লীগ, শ্রমিকলীগ এবং ছাত্র ইউনিয়ন লাঠি মিছিল ও সমাবেশ করে। পাকিস্তান লেখক সংঘ, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, ছাত্র, সুধীজনেরা এর তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানান। এই ঘটনায় কুষ্টিয়া জেলার গাংনী ও ভেড়ামারাসহ বিভিন্ন অঞ্চলের বিক্ষুব্ধ জনতা প্রতিবাদে ফেটে পড়ে। এদিন চুয়াডাঙ্গা টাউন হল ফুটবল মাঠে প্রতিবাদ সমাবেশের আয়োজন করা হয়। সমাবেশ শেষে পাকিস্তানের পতাকা ও মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্‌র ছবি ভস্মীভূত করা হয়।[২৯] ৬ই মার্চ তারিখে সারাদেশের ন্যায় কুষ্টিয়া জেলাতেও সর্বাত্মক হরতাল পালিত হয়। এদিন পুনরায় ২৫শে মার্চ তারিখে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বানের কথা ঘোষণা করা হয়। পূর্ববাংলার মানুষের আন্দোলন থামানোর জন্যেই এ ঘোষণা বলে সবাই মনে করে। ৭ই মার্চের সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের জনসমাবেশে যোগদানের উদ্দেশ্যে ৬ই মার্চ তারিখে কুষ্টিয়ার রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দসহ সচেতন জনগণ ঢাকার পথে রওনা হন।[৩০] এদিন লাহোরে মুসলিম লীগ নেতা এয়ার মার্শাল (অবসরপ্রাপ্ত) নূর খান বলেন – 'আইনত শেখ মুজিবই দেশের শাসন পরিচালনার অধিকারী।'[৩১]

৭ই মার্চ বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলনের মহানায়ক শেখ মুজিবুর রহমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে লক্ষ লক্ষ লোকের বিশাল জনসমুদ্রে তেজোদ্দীপ্ত ভাষণ দেন। তিনি ১৯৪৭ থেকে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত বাঙালির নির্যাতনের ইতিহাস তুলে ধরেন। তারপর ২৫শে মার্চ জাতীয় পরিষদে যাওয়ার প্রশ্নে ৪টি শর্ত আরোপ করেন:

ক. অবিলম্বে সামরিক শাসন প্রত্যাহার করতে হবে;
খ. সমস্ত সেনাবাহিনী ব্যারাকে ফিরিয়ে নিতে হবে;
গ. গণহত্যার তদন্ত করতে হবে; এবং
ঘ. নির্বাচিত গণ-প্রতিনিধিদের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে।[৩২]

পরিশেষে স্বাধীনতার লক্ষ্যে সংগ্রামের ঘোষণা দিয়ে গ্রাম, ইউনিয়ন, মহল্লা, থানা ও জেলা পর্যায়ে সংগ্রাম কমিটি গঠনের নির্দেশ দেন। রেডিওতে সরাসরি ভাষণ সম্প্রচার করা হবে শুনে দৌলতপুরের

---

[২৬] রফিকুর রশীদ, *মেহেরপুর জেলার মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস*, পৃ. ৬২।

[২৭] সাক্ষাৎকার: শামসুল হুদা, মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক ও লেখক, কুষ্টিয়া, তারিখ: ১১.০৫.২০১৪।

[২৮] মোহাম্মদ হান্নান, *বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস ১৮৩০ থেকে ১৯৭১* (ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৯), পৃ. ৬১৮।

[২৯] রাজিব আহমেদ, *চুয়াডাঙ্গা জেলার মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস*, পৃ. ৭৬।

[৩০] সাক্ষাৎকার: আব্দুল মোমেন।

[৩১] *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৭ই মার্চ ১৯৭১।

[৩২] তদেব।

হাজার হাজার মানুষ গুটিকয়েক রেডিও-র সামনে উপস্থিত হচ্ছিল।[৩৩] কিন্তু হঠাৎ করে ৩:২০ মিনিটে রেডিও সম্প্রচার বন্ধ হয়ে যায়। সাধারণ মানুষ রেডিওতে সরাসরি ভাষণ শোনার প্রাণান্তকর চেষ্টা করেও সম্ভব হয়নি। প্রতিবাদে জনগণ তাৎক্ষণিকভাবে পশ্চিম পাকিস্তান ও ইয়াহিয়াবিরোধী মিছিল বের করে। দৌলতপুরের এই চিত্র কুষ্টিয়া জেলার সর্বত্র পরিলক্ষিত হয়।



৭ই মার্চের পর কুষ্টিয়ায় অসহযোগের চিত্র
উৎস: আলোকচিত্রী, আব্দুল হামিদ রায়হান-এর নিকট থেকে সংগৃহীত।

সন্ধ্যায় বিবিসি-র সান্ধ্য অধিবেশনে প্রচারিত খবরের মাধ্যমে জনগণ ঢাকার পরিস্থিতি সম্পর্কে জানতে পারেন। এ সময় বঙ্গবন্ধুর ভাষণের কিছু অংশ প্রচারিত হয়। এ খবর শোনার পর রাতের রাস্তায় আবার বিক্ষুব্ধ জনতার ঢল নামে। পরদিন সকালে রেডিও সম্প্রচার পুনরায় শুরু হয় এবং সকাল ৮:৩০ মিনিটে বঙ্গবন্ধু প্রদত্ত রেকর্ডকৃত ভাষণটি অবিকৃত অবস্থায় প্রচার করা হয়। বঙ্গবন্ধুর নির্দেশনা অনুযায়ী কুষ্টিয়ার মানুষ যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে শুরু করেন। এ লক্ষ্যে তীর, ধনুক, বাঁশের লাঠি, এসিড বাল্বসহ অন্যান্য দেশীয় অস্ত্রে সজ্জিত হতে থাকে। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ পুলিশের কাছে থেকে, ব্যক্তিগত ও অন্যান্য বাহিনীর সদস্যদের নিকট থেকে বন্দুক, অস্ত্র, গোলাবারুদ সংগ্রহের চেষ্টা করতে থাকে। এ সময়ে একদিন আলমডাঙ্গা রেল স্টেশনে জি.আর.পি পুলিশের নিকট থেকে মুক্তিযোদ্ধারা বন্দুক ছিনতাই করে নেয়।[৩৪] বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে কুষ্টিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে সংগ্রাম কমিটি গঠনের কাজ শুরু হয়ে যায়। ১১ই মার্চ বর্তমান মুজিবনগরে 'বৈদ্যনাথতলা সংগ্রাম কমিটি' গঠিত হয়। বৈদ্যনাথতলা সংগ্রাম কমিটি গঠন প্রসঙ্গে কমিটির সভাপতি দোয়াজ উদ্দিন মাস্টার বলেন:

---

[৩৩] সাক্ষাৎকার: মোঃ আওলাদ হোসেন, ছাত্রনেতা, দৌলতপুর, কুষ্টিয়া, তারিখ: ০৫.০৫.২০১৪।
[৩৪] সাক্ষাৎকার: আব্দুল হান্নান রতন, মুক্তিযোদ্ধা, আলমডাঙ্গা, চুয়াডাঙ্গা, তারিখ: ২২.০৩.২০১৪।

বৈদ্যনাথতলা ইপিআর ক্যাম্পে কমিটির অস্থায়ী কার্যালয় স্থাপন করি। ১৩ সদস্য বিশিষ্ট বৈদ্যনাথতলা কমিটির সদস্যবৃন্দ: ১. দোয়াজ উদ্দিন মাস্টার (সভাপতি), ২. আবুল মোমিন চৌধুরী, ৩. আইয়ুব হোসেন, ৪. রুস্তম আলী, ৫. আব্দুর রফিক, ৬. সৈয়দ আলী, ৭. জামাত আলী মোল্লা, ৮. পিন্টু বিশ্বাস, ৯. আবু তৈয়ব, ১০. সুশীল মল্লিক, ১১. আজবত আলী, ১২. সিরাজুল ইসলাম, এবং ১৩. আনোয়ার হোসেন। ইপিআর কুষ্টিয়া ফ্রন্টে চলে গেলে আমরা ক্যাম্পের দায়িত্বভার গ্রহণ করি। সীমান্তবর্তী বিএসএফ-এর সঙ্গে আমরা যোগাযোগ করি। ভারতের কাছ থেকে অস্ত্র, খাদ্যসহ সার্বিক সহযোগিতা আমরা চাই। বিএসএফ-এর পক্ষ থেকে আমাদের সহযোগিতার আশ্বাস দেওয়া হয়। আমার নেতৃত্বে সংগ্রাম কমিটি গ্রামে গ্রামে মিটিং, মিছিল করে জনসচেতনতা বাড়াতে কাজ করে।[৩৫]

এরই ধারাবাহিকতায় মেহেরপুর ও গাংনী থানাতে নূরুল হকের নেতৃত্বে ১০/১৫ দিনের মধ্যে সংগ্রাম কমিটি গঠিত হয়।

মেহেরপুর মহকুমা সংগ্রাম কমিটি

১. মোঃ সহিউদ্দিন (আহ্বায়ক) ২. মোঃ নূরুল হক, ৩. ইসমাঈল হোসেন, ৪. আব্দুল মান্নান মাস্টার, ৫. আ. কা. ম. ইদ্রিস, ৬. হিসাব উদ্দীন, ৭. জালাল উদ্দীন, ৮. শাহাবাজ উদ্দিন নিজ্জু, ৯. ডা. আবু আব্দুল্লাহ, ১০. ডা. আব্দুর রশিদ, ১১. ডা. মহিউদ্দিন, ১২. খাদেমুল ইসলাম, ১৩. আব্দুর রহমান, ১৪. এনামুল হক, ও ১৫. নঈম উদ্দিন।[৩৬]

মেহেরপুর শহর সংগ্রাম কমিটি

১. ডা. আবু আব্দুল্লাহ্, ২. নঈম উদ্দীন, ৩. ফইমউদ্দীন, ৪. আবু বিশ্বাস, ৫. মানিক মিয়া, ৬. ফাকের আলী, ৭. সিরাজুল ইসলাম পটল, ৮. আতাউল হাকিম, ৯. মোজাম্মেল হক, ১০. আশকারী পটল, ও ১১. শাজাহান খান বিশু।

গাংনী থানা সংগ্রাম কমিটি

১. মোঃ নূরুল হক, ২. মোঃ হিসাব উদ্দিন, ৩. মোঃ জালাল উদ্দীন, ৪. মোঃ আব্দুর রহমান, ৫. গোলাম রহমান, ৬. ডা. ইসমাঈল হোসেন, ৭. নূরুল হুদা, ৮. আব্দুল আজিজ, ৯. ডা. ওয়াজেদ আলী, ১০. মহসিন আলী বিশ্বাস, ও ১৩. ডা. মোক্তার হোসেন।

৮ই মার্চ তারিখে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ শেখ মুজিবের শর্তাবলি মেনে নেওয়ার জন্য ইয়াহিয়ার প্রতি আহ্বান জানান। মোজাফফর আহমেদ, ডাঃ কালিদাস বৈদ্য, নুরুল আমীন, খান এ সবুর, ও অলি আহাদ প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।[৩৭]

৯ই মার্চ পল্টনের জনসভায় মজলুম জননেতা মওলানা ভাসানী বলেন, "২৫শে মার্চের পর শেখ মুজিবের সহিত মিলে দুর্বার আন্দোলন গড়ে তুলবো।"[৩৮] একই দিনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জহুরুল হক হলে কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগ 'স্বাধীন বাংলাদেশ' প্রস্তাব পাশ করে। ১১ই মার্চ তারিখে সমগ্র পূর্ববাংলার ন্যায়

---

[৩৫] সাক্ষাৎকার: দোয়াজ উদ্দিন (মাস্টার), সভাপতি, বৈদ্যনাথতলা সংগ্রাম কমিটি, মুজিবনগর, মেহেরপুর, তারিখ: ০২.০৪.২০১৪।

[৩৬] বিস্তারিত দেখুন, রফিকুর রশিদ, *মেহেরপুর জেলার মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস*, পৃ. ৬৫-৬৭।

[৩৭] *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৯ই মার্চ ১৯৭১।

[৩৮] আবু ওসমান চৌধুরী, *এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম* (ঢাকা: সেবা পাবলিশার্স, ১৯৯১), পৃ. ৯০।

কুষ্টিয়া জেলাতেও অসহযোগ আন্দোলন চরম আকার ধারণ করে। এদিন টাঙ্গাইলে এক জনসভায় ভাসানী বলেন – "স্বাধীনতা ছাড়া আর কোন পথ খোলা নাই।" সেই সঙ্গে মুজিবের নির্দেশ মেনে চলার জন্য দেশবাসীকে আহ্বান জানান। একই দিনে করাচির দুটি বহুল প্রচারিত 'দৈনিক জাসারাত' ও 'দৈনিক মাশরিক'-তে মুজিবের চার দফার প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করা হয়।[৩৯] ১১ই মার্চ কুষ্টিয়া জেলা ছাত্রলীগ নেতা শামসুজ্জামান দুদু মানচিত্র খচিত একটি স্বাধীন বাংলার পতাকা চুয়াডাঙ্গায় নিয়ে আসেন। সেটি নিয়ে টাউন হল মাঠে মিছিল শেষে সমাবেশ করা হয়।[৪০] চুয়াডাঙ্গার ছাত্রলীগ নেতা হাফিজুর রহমান জোয়ার্দার স্বাধীন বাংলার একটি পতাকা তার বাইসাইকেলে করে শহর প্রদক্ষিণ করে। অনেকে আবেগাপ্লুত হয়ে পতাকাটি স্পর্শ করেন। এ সময়ে ডা. আসহাব-উল হকের বাড়ির ছাদে স্বাধীন বাংলার একটি পতাকা মার্চের মাঝামাঝি থেকে উড্ডীন ছিল।[৪১]

১২ই মার্চ তারিখে কুষ্টিয়ার ছাত্র-জনতা শহরে বিক্ষোভ মিছিল বের করে। দৌলতপুর, ভেড়ামারা, মিরপুর, কুমারখালী, আলমডাঙ্গা এবং খোকসাতে মিছিল ও সমাবেশের কথা শোনা যায়। এদিন লাহোরে এয়ার মার্শাল (অবসরপ্রাপ্ত) আজগর খান পশ্চিম পাকিস্তানিদের নির্যাতনের কথা সাংবাদিকদের সামনে তুলে ধরেন। ১৪ই মার্চ তারিখে বঙ্গবন্ধু ধানমণ্ডিস্থ বাসভবনে ন্যাপ প্রধান ওয়ালি খানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। সাক্ষাৎ শেষে তিনি পুনরায় দুর্বার অসহযোগ আন্দোলন চালিয়ে যেতে বলেন। এদিন ভুট্টো এক অসম্ভব প্রস্তাব দিয়ে বসেন। তিনি বলেন – পূর্বপাকিস্তানের ও পশ্চিম পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ দুই দলের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে। অথচ এ সময়ে পশ্চিম পাকিস্তানে প্রদেশ বলে কিছু ছিল না। ইয়াহিয়া নির্বাচনের আগে এক ইউনিট ব্যবস্থা ভেঙে চারটি প্রদেশে বিভক্ত করেছিল।[৪২] ১৪ই মার্চ তারিখে ঢাকার সকল দৈনিক সংবাদপত্র মিলে যৌথ সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাসে হয়তো এটি একটি বিরল ঘটনা ছিল। সম্পাদকীয়ের শিরোনাম ছিল – "আর সময় নাই।"[৪৩]

১৫ই মার্চ ইয়াহিয়া খান কঠোর সামরিক প্রহরায় ঢাকায় আসেন। ইয়াহিয়ার ঢাকা আগমনে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে প্রতিবাদ মিছিল হয়। কুষ্টিয়ার বিভিন্ন অফিস থেকে পাকিস্তানের জনক মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্‌র ছবি খুলে ফেলা হয়। কোথাও কোথাও ছবি পুড়িয়ে ফেলা হয়। ১৬ থেকে ২৩শে মার্চ পর্যন্ত বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে ইয়াহিয়ার কয়েক দফা বৈঠক হয়। বৈঠক চলাকালীন বঙ্গবন্ধু তাঁর গাড়িতে কালো পতাকা ব্যবহার করেন। বৈঠকে বঙ্গবন্ধু শুরু থেকেই ৭ই মার্চের ৪ দফার প্রতি গুরুত্বারোপ করেন। কিন্তু ইয়াহিয়া শাসনতান্ত্রিক জটিলতার কথা বলে সময়ক্ষেপণ করতে থাকে। যাহোক এ সময়ে কুষ্টিয়া জেলার বিভিন্ন স্কুল, কলেজ ও অফিস আদালতে কালো পতাকা উত্তোলন করা হয়। ২২শে মার্চ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া পুনরায় ২৫শে মার্চের অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করেন। প্রতিবাদে ঢাকার রাজপথ মিছিলের নগরীতে পরিণত হয়। এ প্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ২৩শে মার্চকে প্রতিরোধ দিবস পালনের ঘোষণা দেয়। এতদিন ২৩শে মার্চ 'পাকিস্তান দিবস' হিসেবে পালিত হলেও ১৯৭১ সালে বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে সমগ্র পূর্ববাংলায় এ দিনটি 'লাহোর প্রস্তাব' দিবস হিসেবে পালিত হয়। এদিন ভোর পাঁচটায় বঙ্গবন্ধু ধানমণ্ডির ৩২নং বাসভবনে মানচিত্র খচিত লাল সবুজ পতাকা উড়িয়ে

---

[৩৯] *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১২ই মার্চ ১৯৭১।

[৪০] রাজিব আহমেদ, পৃ. ৭৯।

[৪১] তদেব।

[৪২] মোহাম্মদ হান্নান, *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস* (ঢাকা: স্টুডেন্ট ওয়েজ, ১৯৯২), পৃ. ২৮৭।

[৪৩] তদেব, পৃ. ২৯০।

দেন।[৪৪] পাকিস্তান দিবস হওয়া সত্ত্বেও প্রেসিডেন্ট ভবন, ক্যান্টনমেন্টগুলো এবং বিমানবন্দর ছাড়া পূর্ববাংলার আর কোথাও চাঁদ-তারা পতাকা ওড়েনি।[৪৫] এদিন কুষ্টিয়া জেলার কোথাও পাকিস্তানি পতাকা ওড়েনি। বরং কালো পতাকার পাশাপাশি বাংলাদেশের পতাকা দেখা যায়। ২৩শে মার্চ তারিখে ভোড়ামারা পাইলট হাইস্কুল মাঠে পতাকা উত্তোলন প্রসঙ্গে স্কুলের তৎকালীন প্রধান শিক্ষক মোঃ রুহুল ইসলাম বলেন:

> ২৩শে মার্চ স্কুল মাঠে একটি প্রতিরোধ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় আমি সভাপতিত্ব করি। সমাবেশ প্রাঙ্গণে হাজারও জনতার উপস্থিতিতে আমি নিজ হাতে পতাকা উত্তোলন করি। জনসেবা ঔষধালয়ের মালিক নজিবুদৌল্লাহ খান পতাকাটি নিয়ে আসে। ভেড়ামারার ঈমান উদ্দীন তাৎক্ষণিকভাবে তাঁর ব্যক্তিগত বন্দুকটি মুক্তিযোদ্ধাদের দিয়ে দেন। তখন স্কুল মাঠেই ছাত্রদের অস্ত্র প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।[৪৬]

২৩শে মার্চ ভেড়ামারা পাইলট হাইস্কুল মাঠের ঘটনা প্রসঙ্গে নজিবুদৌল্লাহ খান বলেন:

> ২৩শে মার্চ বেলা ৩ টার দিকে পাইলট স্কুল মাঠে আমরা একটি সভা আহ্বান করি। আমার বাড়িতে একটি পাকিস্তানের পতাকা ছিল। এটার সাদা অংশ কেটে ফেলে চাঁদ তারার উপর লাল কাপড় লাগিয়ে তার মাঝে মানচিত্র খচিত বাংলাদেশের ম্যাপ লাগিয়ে তাৎক্ষণিকভাবে বাংলাদেশের পতাকা তৈরি করি। রুহুল স্যার বেলা ৩:৩০ মিনিটে পতাকা উত্তোলন করেন। এ সময় জাতীয় সংগীত গাওয়া হয়। জাতীয় সংগীত গেয়েছিলেন ওবায়দুল্লাহ খান ও তৎকালীন এম.পি. রাজা মিয়ার মেয়ে রুবী।[৪৭]

এছাড়া ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের আহ্বানে কুষ্টিয়ার ঘরে ঘরে সোনালি মানচিত্র খচিত সবুজ পতাকা উত্তোলন করা হয়। মুজিব-ইয়াহিয়া নিষ্ফল বৈঠকের পর ২৫শে মার্চ সমগ্র দেশবাসীর চোখে-মুখে ছিল উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার ছাপ। ২৫শে মার্চ সারাদিন জনগণ অসংখ্য খণ্ড খণ্ড মিছিল নিয়ে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে আসেন। তিনি সবাইকে সর্বাত্মক সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হতে বলেন। সন্ধ্যার পর ইয়াহিয়া ঢাকা ত্যাগ করেন। এর পর পরই শুরু হয়ে যায় ইতিহাসের বর্বরোচিত গণহত্যা। উদ্ভূত পরিস্থিতি বিবেচনা করে গ্রেফতার হওয়ার পূর্বে ২৬শে মার্চের প্রথম প্রহরে (২৫শে মার্চ দিবাগত রাত) বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। পরে ২৬শে মার্চ দুপুরে ও ২৭শে মার্চ যথাক্রমে এম. এ. হান্নান ও মেজর জিয়াউর রহমান চট্টগ্রাম কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে পুনরায় বঙ্গবন্ধুর পক্ষে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রটি পাঠ করে শোনান। পরবর্তীকালে ১০ এপ্রিল স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার গঠন করা হয়।

উপসংহার

ধর্মভিত্তিক চিন্তা-চেতনাই মিশ্রিত দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে ভারতবর্ষ ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়। যে আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়ে পূর্ববাংলার মানুষ পাকিস্তান আন্দোলনে শরিক হয়েছিল তা ধূসর হতে খুব বেশি সময় লাগেনি। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করেই ধর্মীয়

---

[৪৪] *দৈনিক আজাদ*, ২৪ মার্চ ১৯৭১।

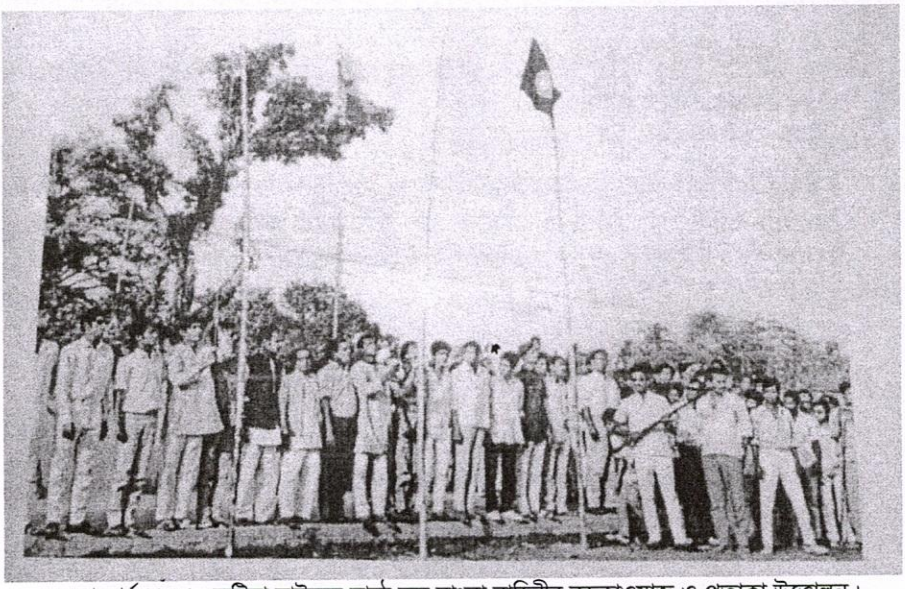
[৪৫] রবীন্দ্রনাথ ত্রিবেদী, পৃ. ৭১।

[৪৬] সাক্ষাৎকার: মোঃ রুহুল ইসলাম, প্রধান শিক্ষক (১৯৭১ সাল), ভেড়ামারা পাইলট হাইস্কুল, ভেড়ামারা, তারিখ: ১৯.০৮.২০১৩।

[৪৭] সাক্ষাৎকার: নজিবুদ্দৌলাহ খান, ভেড়ামারা, তারিখ: ০৬.০৫.২০১৪।

জাতীয়তাবাদের স্থলে স্থান লাভ করে বাঙালি জাতীয়তাবাদ। এই জাতীয়তাবাদী চেতনাকে ভিত্তি করেই ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে পূর্ববাংলার মানুষ বিপুলভাবে বিজয় লাভ করে। সামরিক শাসনবিরোধী আন্দোলনেও কুষ্টিয়া জেলা তথা পূর্ববাংলার মানুষ অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। এরই ধারাবাহিকতায় ৬২-র শিক্ষা আন্দোলন, ৬৬-র ৬ দফা, ৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান এবং ৭০-এর সাধারণ নির্বাচনে জাতীয় মুক্তির ইস্যুতে পূর্ববাংলার মানুষ আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে ম্যান্ডেট লাভ করে। আন্দোলন সংগ্রামের ধারাবাহিকতায় ৭১-এর মার্চ মাসে শুরু হয় অসহযোগ আন্দোলন এবং মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি। পাকিস্তান আমলে সমগ্র পূর্ববাংলার ন্যায় কুষ্টিয়া জেলার মানুষও উপরিউক্ত আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। পরবর্তীকালে ৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধুর ভাষণের পর কুষ্টিয়ার মানুষ সশস্ত্র প্রতিরোধের প্রস্তুতি নিতে শুরু করে। এরপর ২৬শে মার্চ বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণার খবর শুনে এই জেলার মানুষ সশস্ত্র যুদ্ধে লিপ্ত হয়। অবশেষে দীর্ঘ ৯ মাসের সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

পরিশিষ্ট: দুটি আলোকচিত্র



২৩শে মার্চ ১৯৭১, কুষ্টিয়া হাইস্কুল মাঠে জয় বাংলা বাহিনীর কুচকাওয়াজ ও পতাকা উত্তোলন।
উৎস: আলোকচিত্রী, আব্দুল হামিদ রায়হান-এর নিকট থেকে সংগৃহীত।



২৫শে মার্চ ১৯৭১, কুষ্টিয়া হাই স্কুল মাঠে তীর-ধনুক, লাঠি নিয়ে ছাত্র-জনতার সমাবেশ।
উৎস: আলোকচিত্রী, আব্দুল হামিদ রায়হান-এর নিকট থেকে সংগৃহীত।

ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ জার্নাল
সংখ্যা ২৩ (১৪২২ বঙ্গাব্দ)

স্থানীয় পর্যায়ে মুক্তিযুদ্ধঃ গোপালগঞ্জ জেলার মুকসুদপুর থানা

মোঃ আবুল বাশার[১]

Abstract: The Awami League led by Sheikh Mujibur Rahman won the general election in 1970 having absolute majority. But the military rules of Pakistan dithered over having power to him. As a result Bangabandhu gave a historic speech on 7th March of 1971 and called for non-cooperation movement. The situation did not improve and Bangabandhuu was arrested on March of 1971. The movement for independence began following his arrest and declaration's of independence. The movement spread throughout the country. Muksudpur (a police station of Faridpur at that time) joined the war of Liberation like other areas of Bangladesh. This paper narrates how Muksudpur participated in the war of liberation. Materials for the essay have been collected from personal interviews of local freedom fighters, published books and relevant sources.

ভূমিকা

১৯৭১ সালে তৎকালীন পূর্বপাকিস্তানে বাঙালি জাতির মুক্তির জন্য বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে পাক শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে দীর্ঘ নয় মাস যে যুদ্ধ পরিচালিত হয় ইতিহাসে তা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ নামে পরিচিত। এ স্বাধীনতা সংগ্রামে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে দেশের প্রত্যেকটি পাড়া-মহল্লায় বীর বাঙালি মুক্তিযোদ্ধারা দুর্গ তৈরি করে পাকবাহিনী ও তাদের দোসরদের পরাজিত করেছিলেন। এমনই একটি জনপদের নাম মুকসুদপুর।[২] এ অঞ্চলের বীর সন্তানেরা ১৯৭১ সালের ৭মার্চ-২৫ডিসেম্বর পর্যন্ত বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে সক্রিয় ভূমিকা রেখেছিলেন। এ ইতিহাস মুক্তিযুদ্ধের আঞ্চলিক ইতিহাস নামে পরিচিত। যার উপর ভিত্তি করে রচিত হয় জাতীয় ইতিহাস। প্রবন্ধটি এই অঞ্চলের মুক্তিযুদ্ধের কমান্ডার ও সাব সেক্টর কমান্ডারদের সাক্ষাৎকার, প্রত্যক্ষদর্শী ও প্রকাশিত গ্রন্থের তথ্য-উপাত্তের উপর ভিত্তি করে রচিত হয়েছে।

অঞ্চল পরিচিতি

মুকসুদপুর বর্তমানে গোপালগঞ্জ জেলার অধীনে একটি উপজেলা। এটি ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময়ে ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত একটি থানা ছিল। যুদ্ধের সময়ে ১৫টি বর্তমানে ১৭টি ইউনিয়ন নিয়ে গঠিত

---

[১] প্রভাষক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

[২] ১৯৭১ সালে মুকসুদপুর একটি থানা হিসেবে পরিচিত ছিল। পরবর্তী সময়ে অন্যান্য থানার মতো এটি একটি উপজেলায় রূপান্তরিত হয়।

এ উপজেলা। ঐ সময়ে এ উপজেলার আয়তন ছিল ১২৮ বর্গকিলোমিটার, জনসংখ্যা ২,০৬,১৯০ জন[৩], বর্তমানের আয়তন ৩০৯.৬৩ বর্গকিলোমিটার। এটির উত্তরে ফরিদপুর জেলাধীন নগরকান্দা ও ভাঙ্গা উপজেলা, পূর্বে ফরিদপুর ও মাদারীপুর জেলাধীন ভাঙ্গা ও রাজৈর উপজেলা, দক্ষিণে গোপালগঞ্জ জেলাধীন গোপালগঞ্জ সদর ও কাশিয়ানী উপজেলা এবং পশ্চিমে গোপালগঞ্জ ও ফরিদপুর জেলাধীন কাশিয়ানী ও বোয়ালমারী উপজেলা অবস্থিত।[৪] এ উপজেলার দিগনগর ও রাঘদি ইউনিয়নের মধ্য দিয়ে ঢাকা বরিশাল মহাসড়ক অবস্থিত হওয়ায় মুক্তিযুদ্ধের সময় পাক হানাদার বাহিনী ও তাদের দোসররা তাদের অবাধ চলাফেরার লক্ষ্যে দিগনগর ফেরিঘাট নিয়ন্ত্রণের জন্য এখানে ক্যাম্প স্থাপন করে পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে জুলুম, নির্যাতন, হত্যা, ধর্ষণ, লুট ও আগুন লাগিয়ে দেয়ার মাধ্যমে ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টি করে।

১৯৭০ সালের নির্বাচনে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়া সত্ত্বেও পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী ক্ষমতা হস্তান্তরে টালবাহানা শুরু করে। এক পর্যায়ে বঙ্গবন্ধু ৭ই মার্চ এক ঐতিহাসিক ভাষণের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামের ডাক দিলে ২৫শে মার্চ রাতে নিরীহ বাঙালি জনগণের উপর শুরু হয় নির্মম অত্যাচার। গ্রেফতার হন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। এরই মধ্য দিয়ে বাস্তবায়িত হয় অপারেশন সার্চ লাইট নামের সামরিক পরিকল্পনা। ২৬শে মার্চ এ সংবাদ শুনে এ অঞ্চলের হাজার হাজার বাঙালি 'জেলের তালা ভাঙ্গবো, শেখ মুজিবকে আনবো, তোমার দেশ আমার দেশ বাংলাদেশ বাংলাদেশ' ইত্যাদি স্লোগান দিতে দিতে ভাঙ্গা থানা অভিমুখে যায়।[৫] এই দিন দিগনগর থেকে ভাঙ্গা পর্যন্ত বিশাল জনসমুদ্রের সৃষ্টি হয়েছিল। ২৭শে মার্চ বাটিকামারী ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি মতিয়ারের নেতৃত্বে সংগ্রাম কমিটি গঠিত হয় এবং অবসরপ্রাপ্ত সেনা অফিসারদের নেতৃত্বে বাটিকামারী স্কুল মাঠে মুক্তিযুদ্ধের জন্য শারীরিক প্রশিক্ষণ শুরু হয়।[৬]

১৯৭০ সালের নির্বাচনে মুকসুদপুর কাশিয়ানী হতে জাতীয় পরিষদে আঃ সালাম খানকে পরাজিত করে এম এ খায়ের ও প্রাদেশিক পরিষদে কেন্দ্রীয় বাণিজ্যমন্ত্রী ও মুসলিম লীগ নেতা ওয়াহিদুজ্জামানকে পরাজিত করে কাজী আঃ রশিদ বিপুল ভোটে জয়ী হন। এছাড়াও বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ রেকর্ড ও প্রচারে এম এ খায়ের প্রত্যক্ষ ভূমিকা রাখায় এই অঞ্চল পাকিস্তানিদের রোষানলে পতিত হয়। তারই ধারাবাহিকতায় এপ্রিলের প্রথম দিকে পাক আর্মি ঢাকা-বরিশাল মহাসড়ক দিয়ে যাওয়ার পথে বিশ্বম্ভরদির কাজির ব্রিজের নিকট আঃ রব মুন্সিকে গুলি করে হত্যা ও ফতেহপুট্টির রাধাবল্লভকে ট্রাকের পিছনে বেঁধে টেনে নিয়ে হত্যা করে দিগনগর ফেরিঘাটে কুমার নদীতে ফেলে দেয়। এছাড়াও এ রাস্তা দিয়ে যাওয়ার পথে রাস্তার দুই দিকে গুলি বর্ষণ করায় এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।[৭]

---

[৩] *Population Census of Bangladesh: Faridpur District Census Report* (Dhaka: Bangladesh Bureau of Statistics, 1974), p. 72.

[৪] *বাংলা পিডিয়া* (২০০৩), "গোপালগঞ্জ" ভুক্তি।

[৫] তৎকালীন ভাঙ্গা, ফরিদপুর জেলাধীন একটি থানা ছিল। বর্তমানে এটি উপজেলায় উন্নীত হয়েছে।

[৬] সাক্ষাৎকার: নাম: মোঃ ফিরোজ খান, বয়স: ৬২ বছর, পিতা: মৃত মোঃ মানিক খান, পেশা: শিক্ষকতা, গ্রাম+পো: বাটিকামারী, উপজেলা: মুকসুদপুর, জেলা: গোপালগঞ্জ। সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান: নিজ বাসভবন, তারিখ: ২০,১০,২০১৪ ইং। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা ও যুদ্ধ পরবর্তী থানা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার।

[৭] সাক্ষাৎকার: নাম: মোঃ শাজাহান মাতুব্বর, বয়স: ৬৫ বছর, পিতা: মৃত মোঃ আঃ লতিফ মাতুব্বর, পেশা: অবসর প্রাপ্ত সেনা সদস্য, গ্রাম: ফতেহপুট্টি, পো: দিগনগর, উপজেলা: মুকসুদপুর, জেলা: গোপালগঞ্জ। সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান: নিজ বাসভবন, তারিখ: ১৯,১০,২০১৪ ইং। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা।

অন্য দিকে এপ্রিল মাসে ভাঙ্গার কুখ্যাত রাজাকার মুন্নু মিয়ার নেতৃত্বে পাক বাহিনীর বড় একটি দল বাটিকামারী এসে হিন্দুদের দোকান বাড়িঘর লুট করে জ্বালিয়ে দেয়। ফেরার পথে পদ্মকান্দার অধিবাসী সুধীর চন্দ্র ও সতীশ রায়কে গুলি করে হত্যা করে দিগনগর ক্যাম্পে চলে যায়। এ ক্যাম্পে লোহাইড় গ্রামের কুখ্যাত রাজাকার তপু মিয়া অবস্থান করত। মাঝে মাঝে সে পাক সেনাদের সাথে এলাকায় নারকীয় ধ্বংসযজ্ঞ চালাত। একদিন সে দিগনগর স্কুলে বাংলাদেশের মানচিত্র খচিত পতাকা উত্তোলিত অবস্থায় দেখে পতাকায় গুলি করে।[৮] এপ্রিল মাসের ১৩ তারিখে মুকসুদপুর থানা সদরে প্রথম আর্মি আসে। তারা এসে স্থানীয় হিন্দুদের দোকান লুটের সময়ে রাইফেল দিয়ে আঘাত করলে মিস ফায়ারে ২ জন পাকসেনা মারা যায়। এসব সেনারা মুকসুদপুর থানা পাইলট স্কুলে অবস্থান করে। ৪ঠা মে তারা আঃ ওহাব মিয়াকে সভাপতি ও আঃ জলিল মিয়াকে সেক্রেটারি করে মুকসুদপুর থানায় ৪১ সদস্য বিশিষ্ট থানা শান্তি কমিটি গঠন করে।[৯] এ কমিটির নেতৃত্বে প্রত্যেকটি ইউনিয়নে স্থানীয় পাক সমর্থকদের নিয়ে শান্তি কমিটি গঠন করে নিরীহ জনগণের উপর নির্যাতন শুরু করে। যেমন ১৭ই মে খান্দারপাড়া গ্রামের আঃ খালেক মুন্সি ও জলিল চৌকিদার, গোয়াল গ্রামের ইউসুফ মুন্সি ও ওড়াকান্দি ইউপি চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে মুকসুদপুর সদর থেকে পাকবাহিনীর একটি দল বহু গ্রামের মঠবাড়ি ও বনবাড়ি গ্রাম এবং বাশবাড়িয়ার খোরাট গ্রামে ব্যাপক হত্যাযজ্ঞ চালায়। এ হত্যাযজ্ঞে ২৩ জন নিরীহ মানুষ শহীদ হন। এটি বনবাড়ির বিয়োগান্তক ঘটনা নামে পরিচিত।[১০] নগরকান্দার চাঁদহাট যুদ্ধের পর পাকবাহিনী সেখানে ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়ে মুকসুদপুর, বাটিকামারী হয়ে দিগনগর ফেরার পথে বাটিকামারীর হোসেন আলী, চাওচার মতি মণ্ডল ও সিদ্ধেশ্বর মণ্ডলকে হত্যা করে এবং সাধারণ মানুষকে গোলাবারুদ বহনে বাধ্য করে।[১১]

মুক্তিবাহিনী গঠন

যুদ্ধের প্রারম্ভে গোপালগঞ্জ মহকুমা সভাপতি ও সেক্রেটারি যথাক্রমে ডা. ফরিদ ও নাজির আহমদ তালুকদার ওরফে খোকা মোক্তারের নির্দেশে কাজি আঃ রশিদ এমপিএ ও এম এ খায়ের এমএনএ-এর নেতৃত্বে বনগ্রাম বঙ্গবন্ধু মাঠে সভা হয়। এ সভায় স্থানীয় অবসরপ্রাপ্ত সেনাসদস্য, পুলিশ, ইপিআরদের নিয়ে মুক্তিযোদ্ধা গঠনের ও প্রশিক্ষণের নির্দেশ প্রদান করা হয়। এ নির্দেশ মোতাবেক বাঁশ দিয়ে অস্ত্র তৈরি করে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। এর কয়েকদিন পর লোহাইড়ের ওয়াজেদ মোল্লা অস্ত্রসহ কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্ট থেকে পালিয়ে নিজ এলাকায় চলে আসেন। অন্যদিকে নগরকান্দা থানার সেনাসদস্য আজিজ মোল্লা মুক্তিযুদ্ধের প্রাককালে অস্ত্র নিয়ে পালিয়ে নিজ এলাকায় চলে আসেন। তিনি

---

[৮] সাক্ষাৎকারঃ নামঃ মোঃ শহীদুর রহমান মিয়া, বয়সঃ ৫২ বছর, পিতাঃ মৃত শেখ মোতাহার মিয়া, পেশাঃ ব্যবসায়ী, গ্রামঃ গদারভাজন্দী, পোঃ দিগনগর, উপজেলাঃ মুকসুদপুর, জেলাঃ গোপালগঞ্জ। সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থানঃ দিগনগর বাজার, তারিখঃ ১৩,১২,২০১৪ ইং।

[৯] সাক্ষাৎকারঃ নামঃ মোঃ জাফর আহমদ মল্লিক, বয়সঃ ৬৫ বছর, পিতাঃ মৃত রোকন উদ্দীন মল্লিক, পেশাঃ অবসরপ্রাপ্ত বাংলাদেশ রাইফেলস জুনিয়র ননকমিশন্ড অফিসার, গ্রামঃ গোপ্তরগাতী, পোঃ খান্দারপাড়া, উপজেলাঃ মুকসুদপুর, জেলাঃ গোপালগঞ্জ। সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থানঃ কলা অনুষদ শিক্ষক লাউঞ্জ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, তারিখঃ ১৩,১২,২০১৪ ইং। যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা।

[১০] মোঃ ফিরোজ খান, *মুকসুদপুরের মুক্তিযুদ্ধ* (ঢাকাঃ ঝিঙে ফুল, ২০০৯), পৃ. ৬৬।

[১১] সাক্ষাৎকারঃ নামঃ মোঃ লিয়াকত হোসেন, বয়সঃ ৬৪ বছর, পিতাঃ মৃত হাজী আপ্তাব উদ্দীন শেখ, পেশাঃ কৃষি, গ্রামঃ বর্নী, পোঃ দিগনগর, উপজেলাঃ মুকসুদপুর, জেলাঃ গোপালগঞ্জ। সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থানঃ বরইতলা বাসস্ট্যান্ড, তারিখঃ ২০,১০,২০১৪ ইং। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা ও যুদ্ধপরবর্তী উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার।

স্থানীয় ইপিআর, পুলিশ ও সেনাসদস্যদের নিয়ে সশস্ত্র মুক্তিবাহিনী গড়ে তোলেন। এ বাহিনীতে লোহাইড়ের ওয়াজেদ মোল্লা মুক্তিযুদ্ধের সূচনাতে অস্ত্রসহ যোগ দেন। ২৯শে মে ১৯৭১ সালে চাঁদহাট যুদ্ধের পর আজিজ মোল্লার সাথে মতপার্থক্য হওয়ায় তিনি অস্ত্র নিয়ে নিজ গ্রামে চলে আসেন। তিনি তৎকালীন বনগ্রাম ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সেক্রেটারি আশ্রাব আলী আশু মিয়াসহ স্থানীয় আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দকে ডেকে লোহাইড় বাবলাতলা মাঠে মিটিং করেন।[১২] কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের নির্দেশ মোতাবেক স্থানীয় অবসরপ্রাপ্ত ও পলাতক সেনাসদস্য, পুলিশ ও ইপিআরের সদস্যদের নিয়ে মুকসুদপুরে প্রথম মুক্তিবাহিনী গঠন করে বনগ্রাম ভূঁইয়া বাড়িতে ক্যাম্প স্থাপন করেন। ক্রমান্বয়ে তাঁর দল বড়ো হতে থাকলে লুৎফর ও আবু বকরের নেতৃত্বে বাটিকামারীর ভানির বাড়িতে ক্যাম্প স্থাপন করে পাক বিরোধী দুর্গ গড়েতোলেন। এ সময় ওয়াজেদ মোল্লার দলে জাফর আহমদ মল্লিক, কোহিনুর, আঃ মজিদ তালুকদার, আবু বকর ও লুৎফর অন্যতম ছিলেন।

অন্যদিকে কাজী আঃ রশিদ এম এ ভারতের নীলগঞ্জে যুব অভ্যর্থনা শিবির স্থাপন করেন। মুকসুদপুর থেকে মুক্তিযুদ্ধের প্রশিক্ষণ নেওয়ার জন্য আগত যুবকদেরকে এখানে কয়েক দিন রেখে টাকি ও পিপা ক্যাম্পসহ বিভিন্ন ক্যাম্পে পাঠাতেন। তাঁর সহযোগী ছিলেন টেকেরহাটের শাহজাহান সর্দার। মুক্তিযুদ্ধের শুরু থেকে এ অঞ্চলের মুক্তিযোদ্ধাদের খাদ্য সরবরাহ সহ অন্যান্য সহযোগিতায় মুক্তিযোদ্ধা আশুমিয়া দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। ক্যাপ্টেন নুর মোহাম্মদ বাবুল মেজর আবদুল জলিলের অধীনে অত্র অঞ্চলের সাবসেক্টর কমান্ডারের দায়িত্ব পালন করতেন। উল্লেখ্য যে তিনি আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম আসামি ছিলেন।[১০]এর কিছুদিন পর আঃ মান্নান সিকদারের নেতৃত্বে ভারত থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাগণ আগমন করলে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তি বৃদ্ধি পেতে থাকে। এসব মুক্তিযোদ্ধাগণ এসে মুকসুদপুরের বিভিন্ন স্থানে ক্যাম্প গঠন করেন।[১৩]

মুক্তিযুদ্ধকালীন থানা গ্রুপ কামান্ডারগণের তালিকা: আঃ ওয়াজেদ মোল্লা, জাফর আহমদ মল্লিক, আশরাফুজ্জামান কোহিনুর, আঃ মান্নান শিকদার, কে এম আবুল হাছান, ইদ্রিস হোসেন মোল্লা, মুজিবুর রহমান মজনু, শাজাহান শেখ, আঃ কাইয়ুম, সেলিম খান, নাছির আহমদ তালুকদার, অনিল কুমার মৃধা, খুরশিদ আলম খান ছিলেন অন্যতম।[১৪] এসব ক্যাম্পের মুক্তিযোদ্ধাগণ অতন্দ্র প্রহরী হয়ে মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস মুকসুদপুর অঞ্চলে যেসব যুদ্ধ করেছেন তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপ:

---

[১২] সাক্ষাৎকার: আশ্রাব আলী আশু মিয়া, বয়স: ৬২ বছর, পিতা: মোঃ আঃ আলী, পেশা: রাজনীতি, গ্রাম+পো: বনগ্রাম, উপজেলা: মুকসুদপুর, জেলা: গোপালগঞ্জ। সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান: বনগ্রাম ইউনিয়ন আওয়ামীলীগ পার্টি অফিস, তারিখ:১৪,১২,২০১৪ ইং। যুদ্ধকালীন সময়ের ছাত্রনেতা ও সংগঠক।

[১৩] আঃ ওয়াজেদ মোল্যার নেতৃত্বে বনগ্রাম ভূঁইয়া বাড়ি ক্যাম্প, লুৎফর ও আবু বকরের নেতৃত্বে বনগ্রাম ভানির বাড়ি ক্যাম্প, আঃ কায়ুমের নেতৃত্বে খান্দার পাড়া ইন্দুহাটি হাইস্কুল ক্যাম্প, আঃ মান্নান সিকদারের নেতৃত্বে বাটিকামারী রায় বাড়ি ক্যাম্প, ইদ্রিস হেসেন মোল্যার নেতৃত্বে বাটিকামারী বণিক বাড়ি ক্যাম্প, আবুল বাশার রঙ্গুর নেতৃত্বে মহারাজপুরের বোস বাড়ি ক্যাম্প, মাইনুদ্দীন(মনু) মৃধার নেতৃত্বে নারায়ণপুর মুন্সি বাড়ি ক্যাম্প, নাছির আহমেদ তালুকদারের নেতৃত্বে কাশালিয়ার মাজেদুর রহমানের বাড়ি ক্যাম্প, জাফর আহমদ মল্লিকের নেতৃত্বে ফুলারপাড়ের বোর্ড অফিস ক্যাম্প, আঃ জলিল মিয়ার নেতৃত্বে বাহিরবাগের ক্যাম্প, আঃ মান্নান সিকদারের নেতৃত্বে বহুগ্রামের মাঝিগাতি প্রাইমারি স্কুল ক্যাম্প, খুরশিদ আলমের নেতৃত্বে মাঝিগাতি পরেশবিশ্বাসের বাড়ি ক্যাম্প, আঃ মালেকের নেতৃত্বে বাসুদেবপুর প্রাইমারি স্কুল ক্যাম্প, আশ্রাফুল হক সেন্টুর নেতৃত্বে সিমেলশুর মৃধা বাড়ি ক্যাম্প, কোহিনুরের নেতৃত্বে বাশবাড়িয়ার ক্যাম্প, শাজাহান খানের নেতৃত্বে মোচনা হিন্দু বাড়ি ক্যাম্প, আঃ মজিদ তালুকদারের নেতৃত্বে ননীক্ষীর হাই স্কুল ক্যাম্প, ইত্যাদি।

[১৪] সাক্ষাৎকার: জাফর আহমদ মল্লিক, পূর্বোক্ত।

মুকসুদপুর থানা দখল

আ.ওয়াজেদ মোল্লা ও কোহিনুরের দুঃসাহসিক তৎপরতায় মুকসুদপুর এলাকা অনেকাংশে মুক্তিযোদ্ধাদের আয়ত্তে ছিল। ইতিমধ্যে ভারত থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাগণ এসে যোগ দিলে মুক্তিযোদ্ধদের শক্তি বৃদ্ধি পায়। এ সময় ছাত্রলীগ নেতা সুন্দরদীর মিরাজ খান ঠাকুর মুকসুদপুর থানা আক্রমণের পরিকল্পনা করেন। তারই ভিত্তিতে ফুলারপাড় বোর্ড অফিস ক্যাম্পে বসে ওয়াজেদ মোল্লা, জাফর আহমদ মল্লিক ও কোহিনুরের সাথে পরামর্শ করে আক্রমণের দিনক্ষণ ঠিক করা হয়। এ পরিকল্পনা মোতাবেক নগরকান্দার মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার আজিজ মোল্লাসহ পার্শ্ববর্তী ক্যাম্পে সংবাদ দেওয়া হয়। পরিকল্পনা মোতাবেক ৮ই আগস্ট রাতে বাশিপালের বাড়ির নিকট থেকে মুকসুদপুর থানার টেলিফোন সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে থানার চারিপাশ ঘিরে রাত ৩টার দিকে একযোগে আক্রমণ শুরু করে।[১৫] পরের দিন নগরকান্দার মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার আলতাফ তাঁর দল নিয়ে এ যুদ্ধে অংশ নেয় এবং আজিজ মোল্লা ১ পেটি গুলি পাঠায়। এ নতুন শক্তির যোগের ফলে ৯ই আগস্ট বিকাল ৪টায় মুকসুদপুর থানা মুক্তিবাহিনীর নিকট আত্মসমর্পণ করে। এ যুদ্ধে কমান্ডার কোহিনুর বিশেষ নৈপুণ্য প্রদর্শন করেন এবং নগরকান্দার বারু খান ও কাশিয়ানীর আলতাফ হোসেন আহত হন।[১৬] অন্যদিকে থানার ওসি সহ ১৮ জন পুলিশ ও ওহাব মিয়া, জলিল মিয়া সহ ৩১ জন রাজাকার মারা যায়। তাদের গণকবর এখনো থানার পার্শ্বে বিদ্যমান। এই ঘটনার একদিন পর গোপালগঞ্জ থেকে পাক বাহিনী এসে থানা পুন: দখল করে। অবস্থা বেগতিক দেখে তারা কয়েকজন রাজাকার রেখে চলে যায়। মুক্তিযোদ্ধারা ১০ আগস্ট থানা পুন:দখল করে।[১৭]

সিন্দিয়াঘাট ফাঁড়ি অভিযান

সিন্দিয়াঘাট মুকসুদপুর অঞ্চলে যোগাযোগের জন্য গড়ে ওঠা একটি নৌবন্দর। ব্রিটিশ আমলে এখানকার নিরাপত্তার জন্য একটি নৌ ফাঁড়ি স্থাপিত হয়। ৭১-এর যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে দালাল রাজাকারদের আশ্রয় প্রশ্রয়ে এ ফাঁড়ি চলছিল। এ অবস্থায় আজিজ মোল্লা, জাফর আহমদ মল্লিকের বিশেষ পরিকল্পনায় ১৮ জুলাই রাতে মুক্তিযোদ্ধারা ফাঁড়ি ঘেরাও করে। কিন্তু মুক্তিযোদ্ধাদের এ প্রস্তুতি ফাঁড়ি দারোগা কদম আলী দেখে ফেললে গুলি বিনিময় হয়। এতে দারোগা কদম আলী নিহত, মুক্তিযোদ্ধা মনজু ও আজিজ মোল্লার দেহরক্ষী শহীদ এবং আজিজ মোল্লা আহত হন। এ অবস্থায় অপারেশন অসমাপ্ত রেখে মুক্তিযোদ্ধারা চলে আসে।[১৮] উল্লেখ্য যে মাঝে মাঝে সিন্দিয়াঘাট ফাঁড়ির পুলিশ জলবোটে রাজাকার তপু মিয়া ও নওয়াব আলী রাতে পুলিশের সাথে অবস্থান করত। তাদেরকে আটক অথবা হত্যার উদ্দেশ্যে এ অভিযান চালানো হয়েছিল।[১৯] মুকসুদপুর থানা দখলের পর রাজাকারদের তৎপরতা কমতে থাকে। এ সময়ে থানা প্রশাসক আঃ মান্নান তালুকদারের বিশেষ নির্দেশনায় আঃ মজিদ তালুকদারের নেতৃত্বে মুক্তিযোদ্ধাদের একটি দল সিন্দিয়াঘাট LSD খাদ্য

---

[১৫] সাক্ষাৎকার: সুবেহদার আঃ মজিদ তালুকদার, বয়স: ৭০ বছর, পিতা মৃত মোঃ ইসহাক তালুকদার, অবসরপ্রাপ্ত বাংলাদেশ রাইফেলস জুনিয়র ননকমিশন্ড অফিসার, গ্রাম+পো: ননীক্ষীর, উপজেলা: মুকসুদপুর, জেলা: গোপালগঞ্জ। সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান: নিজ বাসভবন, তারিখ: ১৩,১২,২০১৪ ইং।

[১৬] সাক্ষাৎকার: মোঃ ফিরোজ খান, পূর্বোক্ত।

[১৭] সাক্ষাৎকার: জাফর আহমদ মল্লিক, পূর্বোক্ত।

[১৮] সাক্ষাৎকার: সুবেহদার আঃ মজিদ তালুকদার, পূর্বোক্ত।

[১৯] তপন বাগচী, *মুক্তিযুদ্ধে গোপালগঞ্জ* (ঢাকা: ঐতিহ্য প্রকাশনী, ২০০৭), পৃ. ১২৯।

গোডাউন লুট করে প্রায় ২০০ মণ চাল থানা প্রশাসকের নিকট জমা দেয়। উল্লেখ্য যে এ সময় এখানে কোন পুলিশ/রাজাকার পাওয়া যায়নি।[২০]

জলির পাড় যুদ্ধ

জলির পাড় মুকসুদপুর থানার হিন্দু ও খ্রিস্টান অধ্যুষিত একটি ইউনিয়ন। অনেক পূর্ব থেকেই এখানে একটি টোল অফিস ছিল। নদী পারাপারে টোল আদায় হতো। ৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের সময়ে এখানে প্রিয়লাল বাড়ৈর নেতৃত্বে একটি শান্তিকমিটি গঠিত হয়। তার সঙ্গে জড়িত ছিল ডা. নিশিকান্ত ও শ্যামুয়েল মাঝি। এ সময়ে বানিয়ারচর ক্যাথলিক মিশনের দায়িত্বপ্রাপ্ত ইতালীয় বংশোদ্ভূত খ্রিস্টান ধর্মগুরু ও যাজক ফাদার রিগ্যান মুক্তিযুদ্ধের সূচনা হতে বানিয়ারচরে অবস্থান করছিলেন। যিনি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে অসাধারণ অবদান রেখেছিলেন, যা তাঁর স্মৃতি কথা থেকে জানা যায় এভাবে;

> ১৯৭১ সালের ৩ মার্চ তিনি ঢাকা হতে বানিয়ারচরে আসেন (উল্লেখ্য যে তিনি যুদ্ধের অনেক পূর্ব হতেই এখানে দায়িত্বরত ছিলেন, চার্চের বিশেষ কাজে তিনি ঢাকা গিয়েছিলেন)। ১৮ এপ্রিল ফাদার অ্যান্থনী আলবার্টন এবং ফাদার চেচ্চি বানিয়ার চর আসেন। ২২ এপ্রিল যুদ্ধকালীন বানিয়ারচর ধর্মপল্লীর একটি স্মরণীয় দিন। এদিন বেলা ২টায় পাকিস্তানি ২টা জেট বিমান নদীর পাড় দিয়ে মেশিন গানের গুলি নিক্ষেপ করছিল। এদিন গুলির আঘাতে ৫ জন আহত হয়। নদীতে নোঙ্গর করা আমাদের দুটি লঞ্চের মধ্যে একটি অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এদিন ছিল হাটবার, ভয়ে সেদিন হাট বসেনি। ২০শে মে সকাল ৮ টায় টেকেরহাট থেকে দুটি মিলিটারি লঞ্চ বানিয়ারচর আসে। ফাদার চেচ্চি এবং আমি সৈনিকদের সাথে দেখা করলাম। তারা প্রথমে পানি পান করতে চায়, তবে তাদের উদ্দেশ্যে ছিল গ্রাম তল্লাশি করা। আমি তাদের কর্মকর্তাদের সাথে দেখা করলাম। তিনি বললেন যে খ্রিস্টানদের ভয় পাওয়ার কিছু নেই। কিন্তু খারাপ হল হিন্দুরা। তারা শেখ মুজিবুর রহমান সম্পর্কে বাজে মন্তব্য করল। আমি গ্রাম তল্লাশির ক্ষেত্রে অস্ত্র ব্যবহার না করার জন্য আবেদন জানালাম। তারা ২ জন যুবককে কুপিয়ে আহত করে। সৈন্যরা চলে যাওয়ার পর তাদের একজন আমাদের ডিসপেনসারিতে মারা যায়। গ্রামে তল্লাশি করার পর আরো কিছু সৈন্য এগিয়ে এলে আমরা তাদের অভিনন্দন জানাই। আমাদের এই অভিনন্দনের কারণ নিষ্পাপ লোকদের আগুনে ও গুলিতে মরতে দেখে আমাদের হৃদয় মন বিগলিত হয়েছিল। এটি যেন না হয়। আমরা প্রায় সারা দিনই গেটের সামনের রাস্তায় এবং গীর্জার সামনে দিয়ে পায়চারি করছিলাম। কারণ আমাদের গীর্জায়, ডিসপেনসারি এবং থাকার ঘরে সর্বস্তরের লোকেরা প্রাণভয়ে আশ্রয় নিয়েছিল। বিকালবেলা দুইজন পাকসেনা গেটের সামনে এগিয়ে এলে আমি তাদের সাথে দেখা করতে অগ্রসর হলাম। তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলাম তারা কি চায়। তারা প্রায় ৩০ ফুট দূর হতে আমার দিকে বন্দুক তাক করে । আমি প্রথমে পালিয়ে যেতে চাইলাম। কিন্তু পাকিস্তানি কর্মকর্তার পূর্বেকার উপদেশ মনে করে দুই হাত উপরে তুলে দাঁড়িয়ে থাকলাম। সৈন্যদের সাথে থাকা স্যামুয়েল হিরার ছেলে জ্ঞানরঞ্জন হিরাকে দিয়ে আমার দেহ তল্লাশি করে। কিছু না পেয়ে তারা আমার কাছে এসে পানি ও সিগারেট চায়। পানি ও সিগারেট পেয়ে তারা আমাদের বন্ধু বনে যায়। আমি তাদেরকে দয়া প্রদর্শন ও গ্রামের কাউকে ক্ষতি না করতে অনুরোধ করলাম। তারা বলল এখানে হিন্দু আছে? আমি বললাম এখানের সবাই আমাদের নিজস্ব লোক। তারা চলে গেলে পড়ন্ত বিকেলে

---

[২০] সাক্ষাৎকার: প্রকৌশলী আঃ মান্নান তালুকদার, বয়স ৯০ বছর, পেশা: অবসরপ্রাপ্ত পাকিস্তান বিমান বাহিনীর নন-কমিশন্ড অফিসার, গ্রাম+পো: উজানী, উপজেলা: মুকসুদপুর, জেলা: গোপালগঞ্জ। সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান: নিজ বাসভবন, তারিখ: ১১ ডিসেম্বর ২০১৪।

বানিয়ার চরের পূর্ব-দক্ষিণ দিকের বাড়ি থেকে গুলির শব্দ ,আগুন ও ধোঁয়া দেখে আমরা শংকিত হই। রাত্রে ও পরের দিন সকাল থেকে অনেক গুলিবিদ্ধ আহত মানুষ চিকিৎসার জন্য আমাদের হাসপাতালে আসছিল।

২৬শে মে পাকসেনারা পলিতা ও সেনদিয়া গ্রাম পুড়িয়ে ধ্বংস করে দেয়। যাদেরকে সামনে পায় তাদেরকে নির্বিচারে হত্যা করে। মৃত্যু আর ধ্বংসে সেনদিয়া গ্রাম শ্মশান ভূমিতে পরিণত হয়। ২৭শে মে পাকসেনারা জলিরপাড় বাজারে হানাদিয়ে একটি বোবা ছেলেকে হত্যা করে বাজারের অনেক কিছু লুট করে নিয়ে যায়। ২৮শে মে আবারো পাকসেনা জলির পাড় এসে লুট করে ও একজন খ্রিস্টান মহিলাকে বুট দিয়ে পাড়িয়ে আহত করে। ১২ই জুন সকাল ৮টায় ২৩ জন মিলিটারি বিশেষ ২টি লঞ্চে জলির পাড় এসে ভিড়ে। তাদের মধ্যে কয়েকজন বাঙালি ছিল। এদিন তারা সমস্ত বাজারটা পুড়িয়ে দেয়। শুধু বাজার নয়, গ্রামেও তারা ধ্বংসযজ্ঞ চালায়। যেমন; কলিগ্রামের ৫০টি , জলির পাড়ে ১৮টি ,বনগ্রামের ২৬টি বাড়ি আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেয়। বাজারে একজন ক্যাথলিক খ্রিস্টানকে দা দিয়ে কুপিয়ে খুন করে। অক্সফোর্ড মিশনের স্যামুয়েল বিশ্বাসকে আহত করে। বনগ্রামের মিলিটারিরা ৪ জনকে হত্যা করে ও শিশির, মন্মথ, উপেনদাস বাবু, মালাকার, নারায়ণ বাড়ৈসহ আরো অনেককে আহত করে। দুপুর ১টায় তারা ধ্বংসযজ্ঞের পর্ব শেষ করে ৬ টি খাসি ও অনেক জিনিসপত্র নিয়ে গ্রাম ত্যাগ করে। ১৪ই জুলাই কদমবাড়ির চেয়ারম্যান মিন্টু মিয়া এবং তেঁতুলবাড়ির চেয়ারম্যান বুদি বিশ্বাস নিহত হন। ২৭শে সেপ্টেম্বর মুক্তিবাহিনীর অত্র অঞ্চলের কমান্ডার হেমায়েত উদ্দিন আহত হয়ে আমাদের ডিসপেনসারিতে চিকিৎসা নেয় । ৬ই অক্টোবর কলিগ্রামে ২টি মিলিটারি লঞ্চ ভিড়ে। তারা এ দিন গ্রামের ২০০টি ঘর জ্বালিয়ে দেয়। ১০ই নভেম্বর মিলিটারি ৪র্থ বারের মতো আমগ্রাম পুড়িয়ে দেয় এবং ১১ জনকে হত্যা করে।

৩ ডিসেম্বর ভারতীয় সেনাদের সাথে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর প্রথম আক্রমণের সংবাদ শুনতে পাই। অবস্থা বুঝে পাকিস্তানি সেনারা লুণ্ঠন, নির্যাতন ও হত্যার পরিমাণ বৃদ্ধি করে। হেমায়েত উদ্দীনের চিকিৎসাকে কেন্দ্র করে আমরা শঙ্কিত হয়ে পড়ি। এ এলাকায় যাতে আক্রমণ করা না হয় তার জন্য ১৩ই ডিসেম্বর টেকেরহাট গিয়ে মেজরের সাথে সাক্ষাৎ করলাম। তিনি আক্রমণ না চালানোর আশ্বাস দিলেন। অবশেষে ১৬ই ডিসেম্বর পাকিস্তানি বাহিনী আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। সৃষ্টি হয় নতুন একটা দেশ। ১৭ই ডিসেম্বর আমাদের নতুন লঞ্চের নাম দিলাম 'মুক্তবাংলা'। এদিন বিকাল বেলা ৩০ জন মুক্তিযোদ্ধাদের একটি দল আমাদের মাঠে মিলিত হন। তাঁরা কুচকাওয়াজ ও ফাঁকা গুলি করে বিজয়ের আনন্দ প্রকাশ করল। মাঠে সেদিন শত শত লোক আমাকে কিছু বলতে বললে আমি বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের বিদ্রোহীর কবিতার সেই লাইনগুলি আবৃত্তি করলাম 'বল বীর বল উন্নত মম শির'।[২১]

বামনডাঙ্গার যুদ্ধ

মুকসুদপুর থানার মধ্যে যে ইউনিয়নে সবচেয়ে বেশি মুক্তিযোদ্ধা শহীদ হয়েছেন এবং পাকসেনা ও রাজাকার মারা গেছে তার নাম গোহালা ইউনিয়ন। এই ইউনিয়নে ৭ জন মুক্তিযোদ্ধা শহীদ হন। এই ইউনিয়নস্থ বামন ডাঙ্গার আবদুল হান্নান মিয়া ১৯৭০-এর নির্বাচনে আওয়ামীলীগের নমিনেশন চেয়ে ব্যর্থ হয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় শান্তি কমিটির সভাপতি হয়ে রাজাকার বাহিনী গঠনের মধ্য দিয়ে এই এলাকাকে স্বাধীনতা বিরোধীদের অভয়ারণ্যে পরিণত করে। যার ফলে এই ইউনিয়নে

---

[২১] ফাদার মারিনো রিগন, "স্বাধীনতা যুদ্ধের দিনগুলি," মাইকেল বাড়ৈ অনূদিত, *পানকৌড়ি* (বানিয়ারচর, গোপালগঞ্জ), ২০১৩ সংখ্যা, পৃ. ১০-১২।

মুক্তিযোদ্ধাদের কোন ক্যাম্প ছিল না। এপ্রিল মাসের শেষের দিকে স্থানীয় রাজাকারদের সহযোগিতায় পাকসেনারা গোহালা বাজারে আক্রমণ চালিয়ে ২০টি বাড়ি ও অসংখ্য দোকান পাট লুট করে আগুন জ্বালিয়ে দেয় এবং অনেককে ধরে নিয়ে শারীরিক নির্যাতন করে।[২২]

এ এলাকার যারা মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন তাঁরা পার্শ্ববর্তী ইউনিয়নে ক্যাম্প করে অত্র এলাকায় তৎপরতা চালাত। যার বিবরণ আঃ মান্নান তালুকদার দিয়েছেন এভাবে:

> স্থানীয় রাজাকাররা মুক্তিযোদ্ধাদের ধরে আনার জন্য বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করত। এমনই একটি কৌশল ছিল যে একদা বামনডাঙ্গার কয়েকজন স্থানীয় লোক ও দোকানদাররা মুক্তিযোদ্ধা আশ্রাফুজ্জামান কোহিনুরের কাছে গিয়ে অভিযোগ করে যে প্রত্যেকদিন সকালে পাকসেনা ও রাজাকাররা সম্মিলিত ভাবে এসে আমাদের উপর অত্যাচার চালায় ও দোকান লুটপাট করে নিয়ে যায়। এ সংবাদের ভিত্তিতে ১২ অক্টোবর কোহিনুর ৩০ জন মুক্তিযোদ্ধাদের একটি গ্রুপ নিয়ে বামনডাঙ্গা বাজারে আসেন, কিন্তু পাক সেনা ও রাজাকারদেও কোন তৎপরতা না দেখে তারা অপ্রস্তুত হয়ে দোকানে বসে চা খাচ্ছিলেন। এরই মধ্যে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ২০০ জনের পাকসেনা ও রাজাকারদের একটি দল এসে তাদের উপর অতর্কিত আক্রমণ করে। মুক্তিযোদ্ধারা কিছু বুঝে উঠতে না পেরে এদিক সেদিক পালাতে থাকে। দলীয় কমান্ডার কোহিনুরের ঘাড়ে, ডান পায়ের আঙ্গুলে, বুকে ও ডান হতের আঙ্গুলে গুলি লাগে। ফলে তিনি পালাতে না পেরে ওখানেই পড়ে থাকেন। মুক্তিযোদ্ধাদের পলায়নের পর কোন পাল্টাগুলি না হওয়ায় পাকসেনা ও রাজাকাররা বিজয়ী বেশে স্বাভাবিক ভাবে এই বাজারের উপর দিয়ে পায়ে হেটে আসতে থাকে। এই অবস্থায় আহত কোহিনুর LMG দিয়ে কিছুক্ষণ পর অতর্কিতভাবে প্রতিআক্রমণ করেন। এই আক্রমণে পাকসেনা ক্যাপ্টেন আতাখান সহ ৩৫ জন পাকসেনা ও রাজাকার নিহত হয়। অন্য দিকে এই যুদ্ধে আবুল কালাম আজাদ ও কুদ্দুস সহ ৩ জন মুক্তিযোদ্ধা শহীদ হন। এ যুদ্ধে কোহিনুর মারাত্মকভাবে আহত হন। সহযোদ্ধাদের সহযোগিতায় বানিয়াচর ক্রিশ্চিয়ান মিশনারিতে চিকিৎসাসেবা নেন। "আমার জীবনে কোহিনুরের মত সাহসী যোদ্ধা কখনো দেখিনি।[২৩]

এই ইউনিয়নে যে ৭জন মুক্তিযোদ্ধা শহীদ হন তাঁরা হলেন; ১. মোঃ শাহজাহান মিয়া, ২.জালাল উদ্দিন, ৩. মতিয়ার রহমান শেখ, ৪. শামসুল হক মল্লিক, ৫.নুরুল ইসলাম মল্লিক, ৬.হায়দার আলী মাতুব্বর, ৭. হারুন অর রশিদ। প্রথম জন ব্যতীত বাকি ৬ জন দিগনগর যুদ্ধে শহীদ হন।[২৪]

দিগনগরের যুদ্ধ

মুক্তিযুদ্ধে মুকসুদপুর থানার মধ্যে দিগনগর ইউনিয়ন সবচেয়ে ঘটনাবহুল। মুক্তিযুদ্ধের শুরুতেই পাকসেনারা যশোর ও ঢাকা থেকে ফরিদপুর আসে। ফরিদপুর-বরিশাল মহাসড়কের যোগাযোগ ব্যবস্থা উম্মুক্ত রাখার জন্য মুক্তিযুদ্ধের প্রায় প্রথম থেকেই গণহত্যাকারী পাকসেনাবাহিনী এবং তাদের দোসর রাজাকাররা স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রসহ দিগনগর ফেরিঘাটের (বর্তমান ব্রিজ) উভয় তীরে অবস্থান নেয় এবং বাংকার করে প্রতিরক্ষাব্যূহ তৈরি করে।[২৫]

সে সময়ে এখানে ব্রিজের কাজ সম্পূর্ণ হয়নি। এই অবস্থায় পারাপারের জন্য ছিল ফেরি। মুক্তিযুদ্ধের সূচনাতেই মুক্তিযোদ্ধারা ফেরিটি রাজৈর নিয়ে ডুবিয়ে রাখেন। নদী পারাপারের জন্য

---

[২২] মোঃ ফিরোজ খান, *মুকসুদপুরের মুক্তিযুদ্ধ*, পৃ. ১০০।

[২৩] তদেব।

[২৪] তদেব।

[২৫] দিগনগর মহান মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিস্তম্ভ-এ এসব তথ্য লেখা আছে।

পাকসেনারা বাগাট কাপালীদের নৌকা এনে জোড়া করে বেঁধে রশি টেনে তাদের গাড়ি পারাপার করত। বামনডাঙ্গার কুখ্যাত রাজাকার ও শান্তিকমিটির নেতা আঃ হান্নান মিয়ার নেতৃত্বে একটি দল, লোহাইড়ের তোফজ্জল হোসেন (তপুমিয়া) এবং দিগনগরের শান্তিকমিটির সভাপতি কায়ছার মিয়ার নেতৃত্বে রাজাকারদের নিয়ে পাকসেনাদের কার্যক্রম সার্বক্ষণিকভাবে এখানে চলছে। এ যুদ্ধের বিবরণ মুক্তিযোদ্ধা আবুল বাশার ফকির দিয়েছেন এভাবে:

> অগ্নিসংযোগ, লুট, ধর্ষণ, ইত্যাদি ঘটনা পুরো নয় মাস ধরেই অব্যাহত ছিল। যেমন, মুক্তিযোদ্ধা ভাজন্দির আবুল বাশার ফকিরের 'ফকিরবাড়ি', একই গ্রামের রতন মোড়লের বাড়ি লুণ্ঠনের চিত্র দেখে তাঁর বোন হার্টফেল করে মারা যায় কানুড়িয়ার মুক্তিযোদ্ধা সরাব আলীর বাড়ি লুট ও অগ্নিসংযোগ, বিশ্বম্ভরদীর গ্রামের মুক্তিযোদ্ধা সিদ্দিক মোল্লাকে ধরতে গিয়ে তাকে না পেয়ে তাঁর পিতা ও বড় ভাই ফজলুর রহমান মোল্লাকে ধরে নিয়ে যায়। খানজাপুরের আজিজ মুক্তিযুদ্ধে যাওয়ার অপরাধে তাঁর মামা মোছেদকে ধরে নিয়ে যায় এর প্রতিকারে মুক্তিযোদ্ধারাও রাজাকারদের পরিবারের বিভিন্ন সদস্যদের ধরে নিয়ে আসে। এখানকার পাকসেনা রাজাকাররা বেশকিছু নারী নির্যাতনের ঘটনাও ঘটিয়েছে যেমন ভাজন্দি গ্রমের রাশমোহনের স্ত্রীকে ধর্ষণ, এছাড়াও একই গ্রামের কাননবালা বণিককে সৈদ্দী গ্রামের মুজিবুর ধরে নিয়ে মুনির কান্দিতে আত্মগোপন করে থাকে। এ খবর বাটিকামারী ক্যাম্পে পৌঁছার পর মুক্তিযোদ্ধা ওয়ারেশ মুক্তিযোদ্ধাদের একটি দল নিয়ে মুনিরকান্দি থেকে মুজিবুর কাননবালাকে উদ্ধার করে নিয়ে আসার পথে মুজিবুরকে গুলি করে হত্যা করে। কাননবালা বাটিকামারী ক্যাম্পে মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে অবস্থান করে। উভয়ের সম্মতিতে মুক্তিযোদ্ধা ওয়ারেশ কানন বালাকে মুসলিম রীতি অনুযায়ী বিবাহ করেন। বিবাহের পর তারা ক্যাম্পের পাশে গৌড় বণিকের বাড়িতে থাকে। কাননবালা এখানে থেকে অস্ত্র প্রশিক্ষণ নিয়ে যুদ্ধে অংশ নেয়। অপর দিকে কানন বালার চাচাত বোন মীরা বণিককে পার্শ্ববর্তী আবু ফকির জোরপূর্বক বিবাহ করে। এ অবস্থায় মুক্তিযোদ্ধারা আবু ফকিরকে ধরে এনে মেরে ফেলে এবং মীরা বণিক বাটিকামারী কাননবালার সাথে অবস্থান করে। যুদ্ধকালীন সময়ে বাটিকামারী ক্যাম্পের মুক্তিযোদ্ধারা রাতের অন্ধকারে পদ্মকান্দা, বর্নি প্রভৃতি স্থানে গিয়ে ফায়ার করে চলে আসত। এরপর দিগনগর ক্যাম্পের পাকসেনা ও রাজাকাররা রাতভর গুলি চালাত।
>
> এর কারণ প্রসঙ্গে মুক্তিযোদ্ধা আবুল বাশার বলেন আমাদের উদ্দেশ্য ছিল ওদেরকে রাতভর জাগিয়ে রেখে শারীরিকভাবে দুর্বল করা ও তাদের গোলাবারুদ শেষ করা। বর্ষার সময়ে অক্টোবর মাসে দিগনগরে একটি মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে যা দিগনগর ট্রাজেডি নামে পরিচিত। তৎকালীন গোপালগঞ্জ জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক নাজির আহমদ তালুকদার ওরফে খোকামোক্তারের ছেলে নাছির আহমদ তালুকদারের নেতৃত্বে ২৫ জনের একটি দল রাতের অন্ধকারে নৌকায় করে দিগনগর ক্যাম্পে আক্রমণের জন্য যায়। নদীর পূর্বপাড়ে বিলের মধ্যে নৌকায় বসে আক্রমণ করে। উভয় পক্ষের মধ্যে গুলি বিনিময় হয়। এরই মধ্যে সকাল হয়ে গেলে পাকসেনারা তাঁদেকে ঘিরে ফেলে, ফলে মুক্তিযোদ্ধারা পানিতে ঝাঁপ দিয়ে আত্মরক্ষার চেষ্টা করে। এ অবস্থায় ৬ জন মুক্তিযোদ্ধা সাঁতরিয়ে আত্মরক্ষা করতে সক্ষম হন। অন্যদিকে নাছির আহমদ তালুকদারসহ বাকি ১৯ জন পাকসেনাদের হাতে ধরা পড়ে। পাকসেনারা তাঁর পিতাকে ধরার জন্য পুত্র নাছির তালুকদারকে বাঁচিয়ে রাখে এবং বাকী মুক্তিযোদ্ধাদেরকে নির্মমভাবে হত্যা করে। ১৬ই ডিসেম্বর দেশ স্বাধীন হওয়ার পর যশোর কারাগার থেকে নাছির আহমদ তালুকদার মুক্ত হয়ে দেশে ফিরে আসেন।[২৬]

---

[২৬] সাক্ষাৎকার: মোঃ আবুল বাশার ফকির, মুজিব বাহিনীর সদস্য, বয়স: ৬০ বছর, পিতা: দবিরদ্দিন ফকির, পেশা: অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ সদস্য, গ্রাম: ভাজন্দী, পো: দিগনগর, উপজেলা: মুকসুদপুর, জেলা: গোপালগঞ্জ। সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান: দিগনগর ফাজিল মাদ্রাসা। তারিখ: ১৯ অক্টোবর ২০১৪।

রাস্তা কাটার ঘটনা

এটি পদ্মকান্দার যুদ্ধ নামে পরিচিত। ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কে পাকসেনাদের অবাধে চলাচলের বিঘ্ন সৃষ্টির লক্ষ্যে বাটিকামারী ক্যাম্পে দিগনগর পাকারাস্তা কাটার সিদ্ধান্ত হয়। এ ঘটনার বিবরণ মুক্তিযোদ্ধা শাজাহান মাতুব্বর দিয়েছেন এভাবে:

> সিদ্ধান্ত মোতাবেক মুক্তিযোদ্ধা ও স্থানীয় সাধারণ মানুষ সম্মিলিতভাবে বিশ্বম্ভরদীর নিকট রাস্তা কাটতে যায়। রাস্তা কিছু অংশ কাটার পর রাত শেষ হয়েগেলে মুক্তিযোদ্ধারা ক্যাম্পে ফিরে আসে। কিছুক্ষণ পর এ রাস্তা দিয়ে পাক সেনাদের গাড়ি যাওয়ার সময় বিষয়টি তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ফলে তারা বাটিকামারী ক্যাম্পের দিকে যাওয়ার পথে পার্শ্ববর্তী গ্রাম জ্বালিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। পাকসেনাদের এ সিদ্ধান্তের খবর মুক্তিযোদ্ধাদের নিকট পৌছালে মুক্তিযোদ্ধারা তা প্রতিরোধের জন্য ইদ্রিস হোসেন মোল্লার নেতৃত্বে মুক্তিযোদ্ধাদের একটি দল মিরারডিং পর্যন্ত যায়। জহির ও হিরু মোল্লার নেতৃত্বে আরেকটি দল পদ্মকান্দার শেষ মাথায় অবস্থান নেয়। এ সময় পাকসেনারা এসে বর্নির হাবিবুর রহমান মৌলবীর বাড়ি পুড়িয়ে দেয়। এ অবস্থায় মুক্তিযোদ্ধারা পার্শ্ববর্তী আলেখার ভিটায় পজিশন নিয়ে ফায়ার করে। অন্য দিকে পাকসেনারা লকাইর বাড়িতে অবস্থান নিয়ে পাল্টা ফায়ার করে। এ অবস্থায় মুক্তিযোদ্ধারা ক্রলিং করে রাস্তার পাশে চলে আসে অন্য দিকে পাকসেনারা ক্রলিং করে বর্নির ১ম ব্রিজের নীচে এসে ফায়ার করে, এতে মুক্তিযোদ্ধারা ভীষণ বিপদে পড়ে যায়। এরমধ্যে পাকসেনাদের আরেকটি দল দক্ষিণ পার্শ্বের কানুডিয়া গ্রাম থেকে সজোরে ফায়ার করে, যা বৃষ্টির মতো গুলি কাদার ভিতর পড়তে থাকে। এ সময়ে জহিরের নেতৃত্বে থাকা দলটি পশ্চিম দিক থেকে কভারিং ফায়ার দিলে পাক সেনারা পিছু হটে। আটকে পড়া মুক্তিযোদ্ধারা প্রাণ ফিরে পায়। এরপর পাকসেনারা পদ্মকান্দা গ্রাম জ্বালিয়ে দেয়। পাকসেনাদের প্রতিরোধ করার মত রশদ না থাকায় মুক্তিযোদ্ধাগণ ক্যাম্পে ফিরে যায়। এ যুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধা আলী মিয়া মারাত্মকভাবে আহত হয় ও ২/৩ জন পাকসেনা নিহত হয়।[২৭]

দিগনগরের চূড়ান্ত বিজয়

মুকসুদপুর থানা দখলের পর পাকসেনাদের অত্র অঞ্চলের একমাত্র শক্ত ঘাঁটি ছিল দিগনগর ফেরি ঘাঁটের ক্যাম্প। ৬ই ডিসেম্বর ভারত কর্তৃক বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়ার পর পাকসেনাদের মনোবল দুর্বল হতে থাকে। দিগনগরও তার ব্যতিক্রম নয়। এছাড়াও দিগনগর পাকসেনা ক্যাম্প থেকে মহারাজপুরের আঃ সালাম তাঁদের যাবতীয় খবরাখবর বাটিকামারী ক্যাম্পে এনে দিত। এই সুযোগে নগরকান্দা থানা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার মহিউদ্দিন বনগ্রাম ক্যাম্পে এসে অত্র এলাকার ক্যাম্প কমান্ডারদের নিয়ে দিগনগর ফেরিঘাট আক্রমণের সিদ্ধান্ত নেয়। সিদ্ধান্ত মোতাবেক নগরকান্দা, ভাঙ্গা ও রাজৈর থানার মুক্তিযোদ্ধাদের সংবাদ দিয়ে ৯ই ডিসেম্বর রাতে দিগনগর ফেরি ঘাঁট চতুর্দিকে ঘিরে রাত এগারোটার দিকে লালবাতির সংকেতের মাধ্যমে একযোগে আক্রমণ করা হয়।[২৮] টানা যুদ্ধ চলতে থাকে। এলাকার লোকজন খাদ্য ও পানি দিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য করে।[২৯] যুদ্ধের দ্বিতীয় দিন মুক্তিযোদ্ধা আবুল কাশেম মোল্লা (লোহাইড়), জাফর আলী শিকদার (আলীপুর) গুলিবিদ্ধ হয়ে শহীদ হন। এ যুদ্ধে মুকসুদপুরের ইদ্রিস হোসেন মোল্লার গ্রুপ, ওয়াজেদ মোল্লার পক্ষে লুৎফরের, হিরু

---

[২৭] সাক্ষাৎকার: মোঃ শাজাহান মাতুব্বর।

[২৮] তদেব।

[২৯] সাক্ষাৎকার: মোঃ শাজাহান মাতুব্বর।

মোল্লার, কোহিনুরের, কাশালিয়ার সাজাহানের, ননীক্ষীরের মজনুর, মজিদ তালুকদারের, ছাগলছিড়ার সেলিম খানের, বনগ্রামের আঃ মান্নান শিকদারের, নগরকান্দার মহিউদ্দিন মোল্লা, নগরকান্দার আজিজ মোল্লা ও আলতাফ, ভাঙ্গার আঃ রাজ্জাক শিকদার ও হাসানের নেতৃত্বে মুজিব বাহিনীসহ মুক্তিযোদ্ধাদের অনেক গ্রুপ অংশনেয়।[৩০]

যুদ্ধ চলছিল এরই মধ্যে টেকেরহাট থেকে পাকসেনাদের একটি কোম্পানি পায়ে হেঁটে মার্চ করতে করতে দিগনগরের দিকে আসছিল। মুক্তিযোদ্ধারা খুব সহজেই তাদেরকে আটক করতে সক্ষম হয়। ছাগলছিড়ার শাহাবুদ্দিন খান তাদেরকে নিয়ে নিজ বাড়িতে আটক রাখে। দিগনগর যুদ্ধ চলতে চলতে মুক্তিযোদ্ধাদের গুলি ফুরিয়ে এলে মুজিববাহিনীর আবুল বাশার ও মুক্তিযোদ্ধা আজিজ শাহাবুদ্দিনের নিকট থেকে পাকসেনাদের গুলি বস্তা ভরে নিয়ে আসে। এ রশদ দিয়ে যুদ্ধ চলতে থাকে।[৩১] ৩য় দিন যুদ্ধ করতে করতে রাস্তার নীচ থেকে ক্রোলিং করে বাটিকামারীর হায়দার আলী খন্দকার পাকসেনাদের বাংকারের মুখের কাছে গিয়ে গ্রেনেড নিক্ষেপ করে। এ সময়ে পাকসেনাদের একটি গুলি তাঁর বুক ভেদ করে ঢুকলে সাথে সাথেই তিনি শহীদ হন। যুদ্ধের এক পর্যায়ে কিছু কিছু রাজাকার ও পাকসেনা ধরা পড়ে। অবশেষে তারা আত্মসমর্পণ করে ১২ই ডিসেম্বর। তপু মিয়াও ধরা পড়ে। এ যুদ্ধ অত্র অঞ্চলের মুক্তিযোদ্ধা ও জনগণের সাহসি ও বীরত্বের এক অনন্য দৃষ্টান্ত।[৩২]

থানা প্রশাসন

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে মুজিব নগর সরকারের অধীনে উজানির আঃ মান্নান তালুকদারের নেতৃত্বে মুকসুদপুর থানা প্রশাসন পরিচালিত হতো। যার বিবরণ তিনি দিয়েছেন এভাবে:

> তৎকালীন সময়ে মুকসুদপুর থানাঞ্চলে ১৫টি ইউনিয়ন ছিল। এ ১৫টি ইউনিয়নে তিনি ১৫টি দল গঠন করেছিলেন। এসব ইউনিয়নে যারা প্রধান ছিলেন তাঁরা হলেন; দিগনগর ইউনিয়ন – রোকন উদ্দিন মোল্লা, গোবিন্দপুর ইউনিয়ন – আতিয়ার রসুল মুন্সি, ট্যংড়াখোলা ইউনিয়ন – আতিকুর রহমান মিয়া, বহুগ্রাম ইউনিয়ন – আক্রামুজ্জামান উকিল মিয়া, খান্দার পাড়া ইউনিয়ন – ইদ্রিস আলী মিয়া, উজানী ইউনিয়ন – ঝলু মিয়া, জলীর পাড় ইউনিয়ন – মুকুন্দ বালা, গোহালা ইউনিয়ন – সেকান্দর হায়াত, রাঘদী ইউনিয়ন – রতন মিয়া, বাশবাড়িয়া ইউনিয়ন – আবুল খায়ের তালুকদার, কাশালিয়া ইউনিয়ন – আঃ মাজেদ, ননীক্ষীর ইউনিয়ন – টুকু মিয়া, মহারাজপুর ইউনিয়ন – আশ্রাফ আলী আশু মিয়া, বাটিকামারী ইউনিয়ন – আঃ মোতালেব মৃধা, মোচনা ইউনিয়ন – জুলফিকার আলী মুন্সি।[৩৩]

আঃ মান্নান তালুকদার মুক্তিযুদ্ধকালীন যুদ্ধলব্ধ সম্পদ জমা রেখে মুক্তিযোদ্ধাদের দৈনিক ২ টাকা করে প্রদান করতেন।[৩৪] এ ছাড়াও যুদ্ধবন্দীদেরকে বনগ্রাম হিন্দুবাড়ির দোতলায় রাখতেন। প্রশাসন চালানোর জন্য প্রত্যেক ইউনিয়নের ভূমি লিজ ও সরকারি খাজনা উঠিয়ে এক-চতুর্থাংশ ইউনিয়নে রেখে বাকি অর্থ কেন্দ্রে তথা থানায় পাঠানো হতো। এ সময়ে ৩৫০ জন মুক্তিযোদ্ধা তালিকাভুক্ত ছিল। যুদ্ধ দীর্ঘায়িত হলেও এ অঞ্চলে যেন খাদ্য সংকট না হয় সে জন্য তিনি খাদ্য মজুদ ও ব্যাপক হারে ইরিগেশনের ব্যবস্থা করেছিলেন।[৩৫]

---

[৩০] সাক্ষাৎকার: মোঃ আবুল বাশার ফকির।

[৩১] সাক্ষাৎকার: মোঃ আবুল বাশার ফকির।

[৩২] দিগনগর ফেরিঘাটের মহান মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিস্তম্ভ ১৯৭১-এ খোদিত তথ্য ।

[৩৩] সাক্ষাৎকার: প্রকৌশলী আঃ মান্নান তারুকদার।

[৩৪] সে সময় ২ টাকায় আড়াই সের চাল পাওয়া যেত।

[৩৫] সাক্ষাৎকার: প্রকৌশলী আঃ মান্নান তারুকদার।

যুদ্ধকালীন মুকসুদপুর থানার সংক্ষিপ্ত পরিসংখ্যান

মুক্তিযোদ্ধা - ১১৯৪ জন, মুজিব বাহিনী - ১৪৭ জন, শহীদ - ৪২ জন (যোদ্ধা), রাজাকার - ১০৪ জন,[৩৬] শান্তি কমিটি - ৪১ সদস্য বিশিষ্ট কেন্দ্রীয় কমিটি, ইউনিয়ন - ১৫টি, পাকসেনাদের নির্যাতনে শহীদ - ৮৮ জন (সাধারণ মানুষ) সম্মুখ যুদ্ধে শহীদ - ৩৩ জন।[৩৭]

উপসংহার

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চে গণহত্যার পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশের অন্যান্য স্থানের মতো মুকসুদপুরেও প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। পাক হানাদার বাহিনীর নির্মম ও নিষ্ঠুর অত্যাচারের বিরুদ্ধে স্থানীয় বাঙালি সেনা, পুলিশ ও ইপিআর সদস্যদের নিয়ে পাক বাহিনী প্রতিরোধ আন্দোলন শুরু হয়। এরপর ভারত হতে মুক্তিযোদ্ধাগণ এলাকায় আগমন করলে আন্দোলনে নতুন গতি লাভ করে। সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধাগণ দেশ স্বাধীনের প্রত্যয়ে অদম্য সাহসের মাধ্যমে দীর্ঘ নয় মাস বিভিন্ন স্থানে গেরিলা ও সম্মুখ যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। ১১ই ডিসেম্বর দিগনগর ফেরি ঘাটের যুদ্ধ জয়ের মধ্য দিয়ে মুকসুদপুর হানাদার বাহিনী মুক্ত অঞ্চল হিসেবে স্বীকৃতি পায়। তারই ধারাবাহিকতায় ১৬ই ডিসেম্বর ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে পাক বাহিনীর আত্মসমর্পণের মাধ্যমে বিশ্ব মানচিত্রে বাংলাদেশ নামক এক নতুন রাষ্ট্রের জন্ম হয়।

---

[৩৬] সাক্ষাৎকার: প্রকৌশলী আঃ মান্নান তালুকদার।

[৩৭] সাক্ষাৎকার: মোঃ জাফর আহমদ মল্লিক।

ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ জার্নাল
সংখ্যা ২৩ (১৪২২ বঙ্গাব্দ)

মার্কিন সংবাদপত্রে একাত্তরের শরণার্থী প্রসঙ্গ

মোঃ আহসানুল কবীর*

Abstract: During the Great Liberation War of 1971, approximately 10 million Bangladeshi people took shelter in different refugee-camps in India to save themselves from the brutal attack of the West Pakistani armed forces. Though the authority of the United States of America was supporting the cause of the then West Pakistan, the mass media and the common citizens of the United States were in favour of the Liberation War of Bangladesh. Therefore, the refugee issue got special importance in the newspaper of the United States which largely focused on the condition of the refugees, the reasons for their leaving the country, the socio-economic pressure as a result of the refugee-issue experienced by the Indian Government and, above all, the assistance given by India. This paper focused mainly on providing a detailed overview of the refugee-issue of 1971 as reflected in the United States newspaper.

ভূমিকা

১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে পাক হানাদার বাহিনীর নির্মম আক্রমণ থেকে বাঁচতে প্রায় এক কোটি মানুষ পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে শরণার্থী হিসেবে আশ্রয় গ্রহণ করে। এর ফলে ভারতের অর্থনীতিতে যে চাপ সৃষ্টি হয় তা সামলাতে দেশটিকে হিমশিম খেতে হয়। শুধু মাত্র এপ্রিল ও মে এই দুই মাসে ৪৩ লক্ষ লোক ভারতে শরণার্থী হিসেবে আশ্রয় গ্রহণ করে।[১] পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর নির্মম ও অমানবিক হত্যাযজ্ঞ এসময়ে বিশ্বের সকল দেশের গণমাধ্যমে প্রচারিত হয়। অধিকাংশ দেশের গণমাধ্যম মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে সংবাদ প্রচার করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকার মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করলেও সেদেশের সকল শ্রেণী ও পেশার মানুষ এবং গণমাধ্যম মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে দাঁড়িয়েছিল। এ সময়ে যুক্তরাষ্ট্রের ছোট বড় প্রায় সকল সংবাদপত্র পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর হত্যাযজ্ঞের খবর প্রচার করে। *Newsweek, The New York Times, Wall Street Journal, Time, Herald Tribune Internatinal, Daily American, The Evening Star, Los Angeles Times*-সহ অন্যান্য পত্রিকা যে খবর প্রচার করে তাতে মুক্তিযুদ্ধের প্রায় সব বিষয় উঠে আসে। এসব খবরের মধ্যে অন্যতম একটি বিষয় হলো শরণার্থী বিষয়ক সংবাদ। এসব পত্রিকার খবর থেকে ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময়কার শরণার্থীদের অবস্থা, দেশত্যাগে বাধ্য হওয়ার কারণ, ভারতে আশ্রয় গ্রহণ, ভারত সরকারের উপর চাপ পড়া, ভারতের সহায়তা প্রদান, সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে বাংলাদেশকে সহায়তার সক্রিয় বিবেচনাসহ চূড়ান্ত সহযোগিতা প্রভৃতি বিষয় ফুটে উঠেছে।

---

* প্রভাষক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

[১] মঈদুল হাসান, *মূলধারা: '৭১* (ঢাকা: ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ২০১০), পৃ. ৯৭।

মুক্তিযুদ্ধ ও শরণার্থী সমস্যা

সাংস্কৃতিক ঐক্যের অভাব সত্ত্বেও শুধুমাত্র ধর্মের উপর ভর করে দ্বিজাতিত্বতত্ত্বের ভিত্তিতে ১৯৪৭ সালে ভারতীয় উপমহাদেশ ভেঙে ভারত ও পাকিস্তান নামে যে দুটি রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয় তাতে পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলীয় ভূখণ্ড নতুন করে উপনিবেশিক শাসনে নিপতিত হয়।[২] তাই পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিক ব্যাপক ব্যবধান থাকার পরেও ১৯৪৭ সালে শুধুমাত্র ধর্মের কারণে যতটুকু কাছে এসেছিল, ১৯৫২ এর ভাষা আন্দোলন প্রশ্নে তারা এর থেকে বেশি দূরে সরে যায়।[৩] ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়েই বাঙালির কাছে স্পষ্ট হয়ে যায় তারা প্রকৃত অর্থে স্বাধীনতা লাভ করেনি। তাই ধাপে ধাপে এগিয়ে যায় স্বাধীনতার পথে যেটি অর্জিত হয় ১৯৭১ এর মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে।

যুদ্ধ মানেই মৃত্যু, যুদ্ধ মানেই ধ্বংসযজ্ঞ, সেই সাথে মানুষের বাস্তুচ্যুত হবার ঘটনা। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪-১৮), দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ (১৯৩৯-৪৫), আফগান যুদ্ধ (২০০১-বর্তমান), ইরাক যুদ্ধ (২০০৩-১১) সহ বিভিন্ন যুদ্ধের মতো ১৯৭১ সালে বাঙালির মুক্তিযুদ্ধে বহু মানুষকে শুধুমাত্র বেঁচে থাকার আশায় শরণার্থী হিসেবে পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে আশ্রয় নিতে হয়েছিল। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী কর্তৃক পরিকল্পিতভাবে বিপুল সম্পদ ধ্বংস, বাড়িঘরে অগ্নিসংযোগ, লুটতরাজ, খুন, ধর্ষণ, হত্যা ও নির্যাতনের কারণে স্বল্প সময়ের মধ্যে এ অঞ্চলে ঘটে যায় ইতিহাসের সর্ববৃহৎ গণ-বাস্তুচ্যুতি।[৪] বিভিন্ন সময়ে যুদ্ধে ব্যাপক সংখ্যক মানুষের শরণার্থী হওয়ার অভিজ্ঞতা থেকে জাতিসংঘ শরণার্থীর সংজ্ঞা নির্ধারণ করে। ১৯৫১ সালে জাতিসংঘ কনভেনশনে রিফিউজির সংজ্ঞায় বলা হয়:

> A refugee as someone who owing to well-founded fear of being persecuted for reasons of race, religion, nationality, membership of particular social group or political opinion, is outside the country of his nationality.[৫]

বাংলাদেশ থেকে বাস্তুচ্যুত হয়ে ভারতে আশ্রয় নেয়া শরণার্থীর সংখ্যা প্রধানত বাংলাদেশ সীমান্ত সংলগ্ন ভারতের রাজ্যসমূহে বেশি ছিল। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন মার্চ থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত বাংলাদেশ থেকে মোট ৯৮,৯৯,৩০৫ জন শরণার্থী ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে আশ্রয় নিয়েছিল।[৬] এরা সহায়-সম্বল, ভিটেমাটি ছেড়ে মাঠ-ঘাট-জলা পেরিয়ে শত শত মাইল অতিক্রম করে নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে দেশের সীমান্ত অতিক্রম করতে বাধ্য হয়। পিছনে পড়ে থাকে প্রিয় স্বদেশভূমি, নিজ ভিটা, সম্পদ, স্বজন এবং লেলিহান আগুন ও ধোঁয়ায় নিমজ্জিত বিস্তৃত জনপদ।[৭]

শরণার্থী ও মার্কিন সংবাদপত্র

২৫শে মার্চ কালরাত্রিতে পাকিস্তানি সৈন্যরা এদেশের সাধারণ মানুষের উপর আপারেশন সার্চ লাইট নামে নৃশংস হত্যাযজ্ঞ পরিচালনা করে। এ হত্যাযজ্ঞ সম্পর্কে লেখক Willem Van Schendel

---

[২] Imtiaz Ahmed, "Cultural Unity in the Indian Sub-continent: Beyond the Realm of Reality," Bhuian Md. Monoar Kabir ed., *Sino-South Asian Relations: Continuity and Change* (Chittagong: University of Chittagong, 2013), p. 1.

[৩] সাবিনা নার্গিস লিপি, "'স্মৃতি '৭১: শরণার্থী জীবনের প্রাথমিক চালচিত্র," *দ্যা চিটাগং ইউনিভার্সিটি জার্নাল অব্ আর্টস এন্ড হিউম্যানিটিজ*, সংখ্যা: ২৪, ২০০৮, পৃ. ৮৭।

[৪] এম এ হাসান, *'৭১ এর গণহত্যা ও যুদ্ধাপরাধ* (ঢাকা: তাম্রলিপি, ২০১০), পৃ. ৩৬।

[৫] Khalid Koser, *International Migration, A Very Short Introduction* (New York: Oxford University Press, 2007), p. 72.

[৬] হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পা.), *বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ দলিলপত্র: ৮ম খণ্ড* (ঢাকা: তথ্য মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ১৯৮৪), পৃ. ৫৫৯।

[৭] এম এ হাসান, *'৭১ এর গণহত্যা ও যুদ্ধাপরাধ*, পৃ. ৩৭।

বলেন, 'It was a puritive operation to eliminate Bengali nationalism and reassert West Pakistan's dominance over East Pakistan.'[৮] যে কয়েকটি দেশের প্রশাসন এ সময়ে পাকিস্তানি হত্যাযজ্ঞকে সমর্থন দিয়েছিল তার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রশাসন। তবে মার্কিন প্রশাসনে মাত্র দুজন ব্যক্তি প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সন এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রী হেনরি এ. কিসিঞ্জার ছাড়া মার্কিন প্রশাসন, কংগ্রেস, সিনেট, মার্কিন জনগণ, প্রচার মাধ্যম, সংবাদপত্র, শিল্পী, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবীসহ সকল স্তরের মানুষ বাংলাদেশের পাশে দাঁড়িয়েছিল।[৯] প্রকৃতপক্ষে মুক্তিযুদ্ধের সূচনালগ্ন থেকে চূড়ান্ত বিজয় অর্জন পর্যন্ত স্ব স্ব রাষ্ট্র ও সরকার তাদের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্বার্থের কথা বিবেচনা করে বাংলাদেশের পক্ষে বা বিপক্ষে অবস্থান নেয়। এসব দেশের নীতি ও কর্মকাণ্ড বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের গতিপ্রবাহকে প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত করে।[১০] এ সময়ে মার্কিন প্রশাসনের মুক্তিযুদ্ধ বিরোধিতা সত্ত্বেও ছোট বড় অধিকাংশ মার্কিন সংবাদপপত্র মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে অবস্থান নিয়ে বিশ্ববাসীর কাছে বাংলাদেশের মানুষের দুঃখ-দুর্দশা ও পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর নিষ্ঠুরতার পাশাপাশি বাংলাদেশ থেকে যে সকল মানুষ শরণার্থী হিসেবে ভারতে আশ্রয় নিয়েছিল তাদের করুণ জীবনচিত্র তুলে ধরেছে।

পাকিস্তান, সৌদি আরব ও চীনা সংবাদমাধ্যম বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে নেতিবাচক প্রচারণা চালিয়েছে। তারা ভারতে অবস্থানকারী শরণার্থীদের স্বীকৃতি না দিয়ে এসকল হতভাগা মানুষদেরকে ভারতের প্রত্যন্ত অঞ্চলের গরিব জনগোষ্ঠী বলে আখ্যায়িত করেছে।[১১] এক্ষেত্রে মার্কিন সংবাদপত্র বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশন করেছে।

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী কর্তৃক বাঙালিদের উপর চালানো নৃশংস হত্যাযজ্ঞের ফলে পূর্ব পাকিস্তান মৃত্যুপুরীতে পরিণত হয়। এ আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা পায়নি কেউ, ছাত্রাবাসের ছাত্র, বস্তিবাসী, পল্লীবাসী কৃষক, শিক্ষক, মধ্যবিত্ত বেকার যুবক, নারী, শিশু অথবা বৃদ্ধ।[১২] এ অবস্থায় পাকিস্তানি বাহিনীর হত্যাযজ্ঞ থেকে প্রাণ বাঁচাতে সাধারণ মানুষ দেশ ত্যাগ করে নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে ছুটে চলে ভারতের দিকে। বাঙালিরা দেশ ছেড়ে যেতে কেন বাধ্য হয়েছিল তা শরণার্থী শিবিরে নির্যাতিত মানুষের দিকে দৃষ্টি দিলে দেখা যায়। মার্কিন পত্রিকা *Newsweek* এর সংবাদদাতা টনি ক্লিফটন ভারতের শরণার্থী ক্যাম্প ও হাসপাতাল পরিদর্শন এর কিছু চিত্র তুলে ধরেন:

> Anyone who goes to the camps and hospitals along India's border with Pakstan comes away believing the Punjabi Army capable of any atrocity. I have seen babies who've been shot, men who have had their backs whipped raw. I've seen people literally struck by the horror of seeing their children murdered in front of them or their daughters dragged off into sexual slavery. The hospital in Agartala, the capital city of Tripura, is just half a mile from the border, and it is already overcrowded with the victims of the rampaging Pakistani Army.[১৩]

---

[৮] Willem Van Schendel, *A Histoy of Bangladesh* (New Delhi: Cambridge University Press, 2009), p.161.

[৯] সিরু বাঙালি, *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ: বহির্বিশ্বে শত্রু-মিত্র* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০১১), পৃ.২৪৮।

[১০] সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, "বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বহির্বিশ্বের ভূমিকা," সালাউদ্দীন আহমদ ও অন্যান্য (সম্পা.), *বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাস (১৯৪৭-১৯৭১)* (ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৭), পৃ. ৩৮৩।

[১১] সিরু বাঙালি, *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ: বহির্বিশ্বে শত্রু-মিত্র*, পৃ. ২৪৮।

[১২] মঈদুল হাসান, পৃ. ১৫৩।

[১৩] *Newsweek*, June 28, 1971.

পাক হানাদার বাহিনীর এরকম ভয়াবহ হত্যা ও নির্যাতনের মাত্রা প্রথম দিকে ঢাকায় বেশি থাকলেও এরপর তারা আক্রমণের পরিধি বৃদ্ধি করে। ফলে মহিলা, পুরুষ, শিশু, বৃদ্ধ সকলে জীবন বাঁচাতে ঘর ছেড়ে ভারতের দিকে ছুটে চলে। তারা নিজের জন্মভূমিতে চেনা গাছপালা মাঠে আর নিরাপদবোধ করছে না।[১৪] *Herald Tribune International* একজন ভারতীয় উর্ধ্বতন কর্মকর্তার বরাত দিয়ে বলে, 'Refugees from East Pakistan poured into India today, fleeing from advancing Pakistan Army Troops.'[১৫] সংবাদপত্রটি কলকাতার *The Stateman*-এর বরাত দিয়ে আরো জানায়, 'At least 31,000 refugess had entered India this week along the 1,349 mile border with East Pakistan.'[১৬] এপ্রিল মাসের ১০ তারিখে ভারতে বাংলাদেশের প্রবাসী সরকার গঠিত হয় এবং ১৭ এপ্রিল শপথ গ্রহণ করে।[১৭] প্রবাসী সরকার সংগঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনকারী আমির-উল ইসলাম শরণার্থীদের সীমান্ত পার হওয়ার বিষয়টি উল্লেখ করে বলেন, 'বাংলাদেশ থেকে খবর আসছে যে সর্বত্র হানাদার বাহিনীর আক্রমণের প্রচণ্ডতা বৃদ্ধি পেয়েছে। তারা গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে দিচ্ছে। হানাদার বাহিনীর অত্যাচার যত বৃদ্ধি পাচ্ছে শরণার্থীর সংখ্যাও সেই হারে বেড়ে চলেছে। ২৫শে মার্চের পর ঢাকা থেকে যে হারে মানুষ গ্রামে চলে গিয়েছিল আজো সেই হারে বাংলাদেশ থেকে মানুষ সীমান্ত পার হয়ে আসছে।'[১৮]

মার্চ ও এপ্রিল মাসে মানুষ যেভাবে পারছে সবাই ভারতের দিকে চলে যাচ্ছে। বেগম মুশতারী শফি এপ্রিল মাসের প্রথম দিকে তার পরিবার নিয়ে মিরেশ্বরাই হয়ে ভারতের দিকে যাত্রা করেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'হ্যাঁ, আজ আমিও উদ্বাস্তু, ছিন্নমূল, বাস্তুহারা। ভাবতে ভাবতে আমরা এসে গেলাম বাধেঁর কাছে। এখানে আরেক দৃশ্য। হাজার হাজার মানুষ – নারী, পুরুষ, শিশু – পোঁটলা-পুঁটলি, বোঁচকা-বুঁচকি মাথায় নিয়ে চলেছে হেঁটে। কোথা থেকে আসছে আর কোথাই বা যাচ্ছে বোঝা যায় না। মনে হয় ওরা যেন হাঁটছে অনন্তকাল ধরে।'[১৯] তিনি যখন জোয়ারগঞ্জ নদীর ঘাটে এলেন সেখানকার পরিস্থিতির বর্ণনা দিলেন এভাবে: 'নদীর পাড়ে অসংখ্য মানুষ: নারী-পুরুষ, বাচ্চাকাচ্চা, বাক্স-প্যাটরা, যার যা আছে যতটুকু নিতে পেরেছে – এমনকি অনেকের সাথে দেখলাম হাঁস-মুরগি-ছাগলও রয়েছে – সবই নিয়ে এসে জড়ো হয়েছে এখানে, খেয়া পারাপারের জন্য অপেক্ষা করছে। সবার গন্তব্য সীমান্তের ওপার।'[২০] এ প্রসঙ্গে *Wall Street Journal*-এর প্রতিবেদক Peter R. Kann মার্চ-এপ্রিলের ঘটনাবলি বর্ণনা করে বলেন – 'By ox-cart and by rikshaw, on bicycles and occasional truck, but mostly by foot people and soldiers of Bangladesh – the Bengal Nation are retreating towards the Indian border.'[২১] আনিসুজ্জামানের বিবরণ থেকে জানা যায়, 'স্রোতের মত লোক আসছে, রামগড় পেরিয়ে চলে যাচ্ছে সাব্রুমে, এখানেও থাকছে না আশ্রয়ের খোঁজে চলছে আগরতলার দিকে।'[২২]

---

[১৪] পূরবী বসু, "দুঃসময়ের অ্যালবাম," আবুল হাসনাত (সম্পা.), *মুক্তিযুদ্ধের গল্প* (ঢাকা: অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ১৯৯৭), পৃ. ৩২৩।

[১৫] *Herald Tribune International*, April 15, 1971.

[১৬] Ibid.

[১৭] মোহাম্মদ সেলিম, *বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক (১৯৭১-১৯৮১)* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০৯), পৃ. ৪৮।

[১৮] মোঃ আমির-উল ইসলাম, *মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি* (ঢাকা: কাগজ প্রকাশন, ১৯৯১), পৃ. ৪৯।

[১৯] বেগম মুশতারী শফী, *স্বাধীনতা আমার রক্তঝরা দিন* (ঢাকা: মূর্ধন্য প্রকাশনী, ১৯৮৯), পৃ. ৭৬।

[২০] তদেব, পৃ. ১৬৫।

[২১] *Wall Street Journal*, 21 April, 1971.

[২২] আনিসুজ্জামান, *আমার একাত্তর* (ঢাকা: সাহিত্য প্রকাশ, ১৯৯৭), পৃ. ৫০।

বাংলাদেশ থেকে ব্যাপক সংখ্যক শরণার্থী ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করার কারণে দেশটিতে আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিকসহ নানা সমস্যা দেখা দেয়। কয়েকটি রাজ্যে এরা শ্রমবাজারে স্থানীয় বাসিন্দাদের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠে।[২৩] ১৯৭১ সালে ক্ষুদ্র রাজ্য ত্রিপুরায় জনসংখ্যা ছিল ১৫ লক্ষ সেখানে তাদের ১৪ লক্ষ শরণার্থীকে আশ্রয় দিতে হয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তবর্তী বালুরঘাট, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, চব্বিশ পরগণাতে স্থানীয় অধিবাসী ও বাঙালি শরণার্থীদের সংখ্যা সমান হয়ে গিয়েছিল।[২৪] ত্রিপুরা তখন হয়ে উঠেছিল আরেকটি বাংলাদেশ। কি বাঙালি কি পাহাড়ি সবাই ছিল আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সাহায্যকারী বন্ধু, এবং তাদের মন থেকে তাদের হৃদয় থেকে।[২৫] এ উপচেপড়া শরণার্থীর কারণে স্কুল কলেজ, হাসপাতালসহ সকল স্থাপনায় ব্যাপক চাপ পড়ে। কিন্তু এ অবস্থায় উন্নত দেশগুলি এই বিপুল সংখ্যক শরণার্থীদের সাহায্যে এগিয়ে আসেনি। বিষয়টি মার্কিন পত্রিকায় উঠে আসে এভাবে:

> Prime Minister Indira Gandhi complained today that 'no prosperous country' or any of the 'upolders of democracy' has tried to help the nearly three million East Pakistani refugees now in India. She also said refugee influx has created a major problem for India and will severely affect its economic, social and political life. ...All hospitals, school and other public buildings in the border areas are overloaded with refugees.[২৬]

ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে আশ্রয় নেওয়া এই বিপুল সংখ্যক মানুষকে শরণার্থী শিবিরগুলোতে মানবেতর জীবন যাপন করতে হয়েছে। শরণার্থী শিবিরে যাদের ঠাঁই হয়নি তারা খোলা আকাশের নীচে থাকতো। এ অবস্থায় শরণার্থী শিবিরে মরণঘাতী হিসেবে কলেরার প্রকোপ দেখা দেয়। *Herald Tribune International* পত্রিকায় দুর্দশার কথা উল্লেখ করে বলা হয়:

> 150 refugees had died of cholera in a camp at Karimpur, 70 miles north of Calcutta. Labour and Rehabilitation Minister R. K. Khadilkar said the 20 new camps each housing 50,000 refugees are being set up to simplify administration. At present there are more than 400 camps in the border areas of West Bengal, Assam, Meghalaya and Tripura. Each camp houses upto 10,000 refugees. About two million refugees sleep in the open air or have found temporary shelter with friends and relatives.[২৭]

কলেরা আক্রান্ত মানুষদের জন্য সাহায্য সংস্থা অক্সফাম ওষুধ নিয়ে এগিয়ে আসে। সিনেটর এডওয়ার্ড কেনেডি শরণার্থী ক্যাম্প পরিদর্শন করেন। এ সময়ে শুধু নদীয়াতেই কলেরায় প্রায় দশ হাজার শরণার্থীর মৃত্যু হয়।[২৮] মার্কিন কবি অ্যালেন গিনসবার্গও শরণার্থী শিবির পরিদর্শন করে সেখানে যে অন্নহীন, শীর্ণদেহ, মহামারী ও মৃত্যু দেখেছেন তা 'সেপ্টেম্বর অন যশোর রোড' কবিতায় লিপিবদ্ধ করেছেন।[২৯]

---

[২৩] মোহাম্মদ সেলিম, পৃ. ১৯।

[২৪] সাবিনা নার্গিস লিপি, "বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ: ভারতের নারী সংগঠন ও নারী ব্যক্তিত্ব," *দ্যা চিটাগং ইউনিভার্সিটি জার্নাল অব্ আর্টস এন্ড হিউম্যানিটিজ*, সংখ্যা: ২৬, ২০১০, পৃ. ১০।

[২৫] হারুন হাবীব, "আমাদের জন্মের ঋণ," আবুল হাসনাত (সম্পা.), *মুক্তিযুদ্ধের গল্প* (ঢাকা: অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ১৯৯৭), পৃ.৫৪৫।

[২৬] *Herald Tribune International*, May 19, 1971.

[২৭] Ibid, May 31, 1971.

[২৮] Salam Azad, *Contribution of India in the War of Liberation of Bangladesh* (Dhaka: Ankur Prakasani, 2003), p. 211.

[২৯] সাবিনা নার্গিস লিপি, "'স্মৃতি '৭১: শরণার্থী জীবনের প্রাথমিক চালচিত্র," পৃ. ৯৯।

বাংলাদেশ থেকে যাওয়া শরণার্থীরা ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা, মেঘালয়, আসাম, বিহার প্রভৃতি রাজ্যে স্থাপিত ক্যাম্পে আশ্রয় গ্রহণ করে। শরণার্থীদের ব্যয়ভার বহন করতে গিয়ে ভারতের অর্থনীতি চাপের মুখে পড়ে। বিষয়টি ভারতীয় কর্মকর্তার ভাষ্যে ফুটে ওঠে:

> The strain on India has become almost unbearable. ... P. N. Luthara, the former Indian Army Officer in charge of the refugee program told, 'I am now responsible for the care of a small country.' It is costing India $3 million a day to feed, clothe, house and provide vital medicine for the Bengalis a financial drain that is crippling to the already marginal Indian economy. Worse yet, lack of available funds have meant a shortage of virtually everything in the refugee camps and the inevitable result has been suffering disease and death.[৩০]

পূর্ব পাকিস্তানে ইয়াহিয়া খান যে নির্বিচার হত্যাযজ্ঞ শুরু করেন তার ফলে অগণিত বাঙালি শরণার্থী হিসেবে ভারতে কিংবা কিছু সংখ্যক মিয়ানমারে বা অন্যত্র আশ্রয় গ্রহণ করে। জুনের মাঝামাঝিতেই ভারতে শরণার্থী সংখ্যা ৬০ লাখে পৌঁছায়। এই দেশত্যাগী শরণার্থীর দীর্ঘ সারি ডিসেম্বরে সরাসরি যুদ্ধ শুরু হওয়া পর্যন্ত অব্যাহত থাকে।[৩১] আগস্টের প্রথম দিকে শরণার্থীর সংখ্যা ৭৫ লক্ষ অতিক্রম করে। মার্কিন পত্রিকা রিপোর্ট করে বানের স্রোতের মতো মানুষ পার্শ্ববর্তী ভারতের রাজ্যগুলোতে প্রবেশ করছে। এক সময়ে ভারতে দৈনিক শরণার্থী প্রবেশের সংখ্যা প্রায় পঞ্চাশ হাজারে পৌঁছায়। বেসরকারী সাহায্য সংস্থা অক্সফাম-এর তরুণ স্বেচ্ছাসেবক জুলিয়ান ফ্রান্সিস ভারতে গমনকারী শরণার্থীদের সংখ্যা গুনতে চেষ্টা করেন, মিনিটে প্রায় ১০০ জন। এই শরণার্থীদের খাবার, পোশাক, ওষুধ প্রভৃতির জন্য ভারত দৈনিক দশ লক্ষাধিক ডলার ব্যয় করে বলে রিপোর্টে বলা হয়। মার্কিন পত্রিকায় শরণার্থীদের ভারতে প্রবেশের সংখ্যা ও তাদের পিছনে ব্যয়ের বিষয়টি উঠে আসে,

> It has been four months since civil war broke out between East and West Pakistan, and the refugees still pour in. No one can count them precisely, but Indian officials, by projecting camp registrations, calculate that they came at the rate of 50,000 a day. India is feeding the refugees for a mere 1.10 rupees per persons per day, but even that amounts to more than $1,000,000 a day. The first six months alone, Indian officials say, will cost $400 million.[৩২]

ভারতে আশ্রয়গ্রহণকারী এই বিপুল সংখ্যক বাংলাদেশী উদ্বাস্তুদের সহায়তার লক্ষ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ব্যক্তিকেন্দ্রিক উদ্যোগ লক্ষ করা যায়। *নিউজউইক* সাহায্যের অর্থনীতির কথা বলতে গিয়ে জর্জ হ্যারিসন ও রিঙ্গো স্টার-এর উদ্যোগের কথা উল্লেখ করেছে। সহায় সম্বলহীন, ঘরবাড়িহারা যেসব বাঙালি ভারতে শরণার্থী হিসেবে আছে তাদের জন্য জর্জ হ্যারিসন নিউইয়র্কে ম্যাডিসন স্কয়ারে একটি কনসার্টে গান গাইবেন। বব ডিলান, জর্জ হ্যারিসন, রবিশংকর 'কনসার্ট ফর বাংলাদেশ' নামে এ অনুষ্ঠান থেকে প্রাপ্ত অর্থ শরণার্থীদের কল্যাণে ব্যয় করেছিলেন। ব্যক্তিকেন্দ্রিক উদ্যোগের বিষয়টি মার্কিন পত্রিকায় উঠে আসে,

> If some Americans are still only vaguely aware of the plight of the Bengali refugees, Beatles George Harrison and Ringo Starr intend to pound the message home this week. In their first public appearance together since the

---

[৩০] *Newsweek*, August 02, 1971.

[৩১] আবুল মাল আবদুল মুহিত, *বাংলাদেশ জাতিরাষ্ট্রের উদ্ভব* (ঢাকা: সাহিত্য প্রকাশ, ২০০০), পৃ. ২৭৭।

[৩২] *Time*, August 02, 1971.

> famous rock group split up, George and Ringo plan a benefit performance at New York's Madison Square Garden, with all proceeds to go to homeless Bengali children.[৩৩]

এদের মতো অনেক বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বাঙালি শরণার্থীদের সাহায্যে এগিয়ে আসে। এর মধ্যে ইন্টারন্যাশনাল রেসকিউ কমিটি, ক্যাথলিক রিলিফ সার্ভিস, ইউনেস্কো অন্যতম। এসময়ে বাঙালি শরণার্থীদের বিশ্বের সবচেয়ে বেশি সংখ্যক মানুষের বাস্তুচ্যুত হওয়া সম্পর্কে IRC-প্রধান Dr. Daniel L. Weiner বলেন, "Bengali refugees must now form the largest group of displaced persons in the world."[৩৪]

এই বিরাট সংখ্যক শরণার্থী দেশটির জন্য অসহনীয় হয়ে ওঠে যা থেকে সংঘাতের আশঙ্কা প্রকাশ পায়। এ সম্পর্কিত পত্রিকার রিপোর্টে দেখা যায়,

> India charges that military terror in East Pakistan since the central government moved against the Bengali separatist on March 25 has driven 9 million refugees across her border. Those people, the Indians say, are an intolerable drain on already vastly overtaxed economic resources and force that could result in a political catastrophe or internal warfare.[৩৫]

ভারতে আশ্রয়গ্রহণকারী এই বিপুল সংখ্যক শরণার্থীর ব্যয়ভার বহনের জন্য ভারত সরকার অনেক প্রকল্পে অর্থায়ন কাঁটছাট করে। শরণার্থীদের জন্য ভারত সরকারের মোট খরচ হয় ৩৫০ কোটি রুপি। এর মধ্যে ১৩০ কোটি রুপি ছিল আর্ন্তজাতিক সহায়তা। জাতিসংঘ মহাসচিবের আহবানে যে আর্ন্তজাতিক সাহায্য মিলে তা ছিল মাত্র ২১.৫ কোটি মার্কিন ডলার।[৩৬] এই বিপুল ব্যয় ভারতের জন্য বোঝা এবং শরণার্থী সমস্যা নিরাপত্তার জন্য হুমকি বলে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করেন। এ সম্পর্কিত Newsweek এর সংবাদে বলা হয়:

> Taking care of the refugees means cutting a lot of our programs, it means a certain austerity in living, cutting government spending and reorienting various schemes and programs. ...It is indeed a very vary heavy. …But the major danger is not this burden, which is heavy enough. It is social and political tensions which are growing out of this problem. And, we feel that there is even a very real threat to our security.[৩৭]

শরণার্থী সংকটের দীর্ঘ মেয়াদি প্রতিক্রিয়া ভারতকে শঙ্কিত করে তোলে। ফলে সমস্যা সমাধানের জন্য ভারতের প্রধানমন্ত্রী পশ্চিমা দেশসমূহ সফর করেন। এর মূল উদ্দেশ্য ছিল ভারতে আশ্রিত ৯৭ লক্ষ বাংলাদেশীর ব্যাপারে একটি রাজনৈতিক সমাধানের জন্য পাকিস্তান সরকারের উপর আর্ন্তজাতিক চাপ সৃষ্টি করা।[৩৮] কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট পাকিস্তানের মানবতাবিরোধী কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে দেশটিকেতেমন কোন চাপ প্রয়োগ করলেন না। মার্কিন প্রশাসন যদি কেবল একটি মাত্র পদক্ষেপ গ্রহণ করতো, বাঙালিদের সাথে ইয়াহিয়ার একটি রাজনৈতিক সমাধানে আসার উদ্যোগ নিত, তাহলে মুহূর্তের মধ্যেই দুর্বিষহ শরণার্থী সমস্যাটির সমাধান হয়ে যেত।[৩৯] কিন্তু মার্কিন প্রশাসন পাকিস্তানকে

---

[৩৩] *Newsweek*, August 02, 1971.
[৩৪] Ibid.
[৩৫] *The New York Times*, October 11, 1971.
[৩৬] আবুল মাল আবদুল মুহিত, পৃ. ২৮০।
[৩৭] *Newsweek*, November 15, 1971.
[৩৮] *Time*, November 29, 1971.
[৩৯] খালেদুর রহমান শাকিল (সম্পা.), *আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমে আমাদের মুক্তিযুদ্ধ* (ঢাকা: অন্বেষা প্রকাশ, ২০১৩), পৃ. ২৩১।

চাপ প্রয়োগের পরিবর্তে সমর্থন দিয়ে যাচ্ছিল। সেক্ষেত্রে ভারতের পক্ষে মুক্তিবাহিনীকে শক্তিশালী করা এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে সাহায্য করা ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না। এমতাবস্থায় নিজেদের নৈতিক অবস্থান শক্তিশালী করার লক্ষ্যে এবং বাস্তবতাকে স্বীকার করে ৬ই ডিসেম্বর ভারত বাংলাদেশ সরকারকে কূটনৈতিক স্বীকৃতি প্রদান করে এবং ১০ই ডিসেম্বর মুক্তিবাহিনীর সাথে যৌথ কমান্ড প্রতিষ্ঠা করে।[৪০]

মার্কিন সংবাদপত্রে শরণার্থীদের খবর প্রকাশের প্রতিক্রিয়া

মুক্তিযুদ্ধকালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বে অন্যতম পরাশক্তি হিসেবে বিবেচিত হওয়ায় দেশটির সংবাদমাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে সংবাদ প্রচার নিঃসন্দেহে তাৎপর্যপূর্ণ। এ সময়ে মার্কিন পত্রিকায় উঠে আসা ভারতে আশ্রয় নেওয়া প্রায় এক কোটি শরণার্থীর মানবেতর জীবন যাপন সম্পর্কে প্রচারিত সংবাদ বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আর্কষণ করে। এর ফলে বিশ্বে বাংলাদেশের পক্ষে শক্তিশালী জনমত গড়ে ওঠে। মার্কিন জনগণ এবং গণমাধ্যম বাংলাদেশের পক্ষে শক্তিশালী অবস্থান গ্রহণ করায় অনেক ক্ষেত্রে বাংলাদেশের প্রতি মার্কিন প্রশাসনের মনোভাব নমনীয় হতে বাধ্য হয়। এ সম্পর্কে আবুল মাল আবদুল মুহিত বলেন, 'পাকিস্তানি বর্বরতার জন্য এবং শরণার্থীদের দুর্দশার জন্য প্রায় সর্বত্র জনমত ও সংবাদমাধ্যম বাংলাদেশের সমর্থনে যায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ও তাঁর বুদ্ধিদাতা হেনরি কিসিঞ্জার ছিলেন পাকিস্তানের ঘোর এবং অনমনীয় সমর্থক, কিন্তু জনমতের চাপে বিশেষকরে কংগ্রেস ও সংবাদ মাধ্যমের সক্রিয় ভূমিকার ফলে তাঁরা পাকিস্তানকে খুব একটা সাহায্য করতে পারেননি।'[৪১] পাকিস্তানকে তৃতীয় পক্ষের মাধ্যমে সাহায্য করার চেষ্টা থেকেও নির্বাহী বিভাগকে নিবৃত করতে হয়। এমনকি নিক্সনের আণবিক সমাধানের বিবেচনাও সংবাদ মাধ্যমের সতর্কতার জন্য নিয়ন্ত্রণে থাকে।[৪২] তৎকালনীন সময়ে মার্কিন সংবাদপত্রে বাংলাদেশের প্রকৃত চিত্র উঠে আসার কারণে ব্যক্তি ও বিভিন্ন সংগঠন বাংলাদেশের সাহায্যে এগিয়ে এসেছে। বিশ্বের বিবেকবান মানুষ বাংলাদেশের পক্ষে পাকিস্তানি হত্যাযজ্ঞের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়। যার ফলে বাংলাদেশের বিজয় অর্জন ত্বরান্বিত হয়েছে নিঃসন্দেহে।

উপসংহার

মুক্তিযোদ্ধাদের সংগ্রাম, ভারতীয় সহায়তা এবং বাঙালির সম্মিলিত প্রচেষ্টা বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে অনিবার্য করে তুলেছিল। আর গণমাধ্যম এ প্রচেষ্টাকে বিশ্বের বিবেকবান মানুষের কাছে অকাতরে তুলে ধরেছিল। এসকল গণমাধ্যমের মধ্যে অত্যন্ত প্রভাবশালী মার্কিন সংবাদত্রের ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মার্কিন সংবাদপত্রের কর্মীরা বিবেকতাড়িত হয়ে বাঙালির জীবনের যে দুঃখগাঁথা বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরেছিল তার মধ্যে ভারতে আশ্রিত প্রায় এক কোটি শরণার্থীর অমানবিক জীবনচিত্র অন্যতম। যেহেতু আমাদের আলোচনার বিষয় মার্কিন সংবাদপত্রে সীমাবদ্ধ তাই সেখানে দেখা যায় ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ শুরুর পর থেকে দেশটির সংবাদপত্রগুলি বাঙালির জীবনের নিদারুণ কষ্ট, যন্ত্রণা, অন্যদেশে পরবাসী হওয়ার মতো দুঃজনক বিষয়গুলো তুলে এনেছে অত্যন্ত নিঁখুতভাবে। মার্কিন প্রশাসনের বিরোধিতা সত্ত্বেও এ কাজ তারা করেছে বিবেকের তাড়নায় বলে অনুমান করি। এ সকল সংবাদপত্রের কর্মীদের নিরলস প্রচেষ্টার ফলে শরণার্থী জীবনের যে করুণচিত্র দেখতে পাই, তাতে শরণার্থী জীবনের অসহায় অবস্থার দুঃখগাঁথা আমাদের সামনে ফুটে ওঠে।

---

[৪০] আবুল মাল আবদুল মুহিত, পৃ. ৩১৪।

[৪১] তদেব, পৃ. ২৭১।

[৪২] আবুল মাল আবদুল মুহিত, *স্মৃতি অম্লান ১৯৭১* (ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৬), পৃ. ১৭৪।

ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ জার্নাল
সংখ্যা ২৩ (১৪২২ বঙ্গাব্দ)

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও লন্ডনে বাংলাদেশ মিশনের তৎপরতা

সাবিনা নার্গিস লিপি*

Abstract: The first Bangladesh Mission started its journey at Kolkata in 1971 (18 April) and another Mission was opened in London in August (27th August). The Bangladesh Mission in London was headed by Justice Abu Sayeed Chowdhury. Outside India it was London where first Bangladesh Mission was opened. Diplomatic enterprises were led through this Mission which helped to mobilize public and government opinion throughout the world. Using the declassified documents (Foreign Commonwealth Office report, Prime Minister Office Report, preserved at the National Archives, UK) this paper attempts to highlight the activities of this Bangladesh Mission (London), different endeavors of this Mission to internationalize the Bangladesh Liberation War and the attitudes of the sheltered country (Britain) towards this Mission.

ভূমিকা

মুক্তিযুদ্ধের সফলতায় আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সহানুভূতি, সমর্থন, সহযোগিতা গুরুত্বপূর্ণ অনুঘটক। এ ধরনের সমর্থন লাভে মুক্তিকামী জাতি কর্তৃক গঠিত স্বাধীন সরকার ও তাদের মিশনসমূহ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে।[১] আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ (১৯৭১) ও স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের যৌক্তিকতা তুলে ধরতে বাংলাদেশ মিশন (লন্ডন) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল। কার্যত ভারতের বাইরে এ মিশনের মাধ্যমেই বৈশ্বিক পরিমণ্ডলে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে উপস্থাপন করা সহজ হয়েছিল। বাংলাদেশ মিশন প্রধান আবু সাঈদ চৌধুরী ও বিভিন্ন ব্যক্তির স্মৃতিকথায় বা গবেষণায় বিক্ষিপ্তভাবে এ মিশন উপস্থাপিত হলেও এর গঠন, কার্যাবলি বা মিশনের প্রতি আশ্রিত দেশের (যুক্তরাজ্য) দৃষ্টিভঙ্গি

* সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম।

[১] ১৯৭১ সালের ১০ই এপ্রিল গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার গঠন করা হয়। ১৯৭১ এর ১৭ই এপ্রিল বর্তমান মেহেরপুর জেলার বৈদ্যনাথতলার (পরবর্তী নামকরণ মুজিবনগর) আমবাগানে বাংলাদেশ সরকারের আনুষ্ঠানিক শপথ গ্রহণ করা হয়। মুজিবনগরের নামানুসারে এ সরকার মুজিবনগর সরকার বা প্রবাসী সরকার হিসেবেও পরিচিত। বাংলাদেশের প্রথম ও পূর্ণাঙ্গ সরকার হিসেবে এবং স্বাধীনতা যুদ্ধকালীন সময়ে বিভিন্ন সরকারের কাছে প্রেরিত চিঠিপত্র ও দাপ্তরিক কাগজপত্রে এ সরকার গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার উল্লেখ করায় এ প্রবন্ধে বাংলাদেশ সরকার শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।

কিরূপ ছিল তা নিয়ে বিশেষ কোন মূল্যায়ন হয়নি।[২] বর্তমান প্রবন্ধে মার্চ '৭১ থেকে ডিসেম্বর '৭১ পর্যন্ত সময়ের FCO (Foreign Commonwealth Office) report, PREM (Prime Minister Office) report ও অন্যান্য তথ্য উপাত্তের ভিত্তিতে বাংলাদেশ মিশনের গ্রহণযোগ্যতা, তৎপরতা এবং বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে আন্তর্জাতিক পরিসরে উপস্থাপনে এর অবদান মূল্যায়ন করার প্রয়াস নেয়া হয়েছে।

বাংলাদেশ মিশন (লন্ডন) গঠনের প্রেক্ষাপট

মুক্তিযুদ্ধের সময়ে বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর হিসেবে মানবাধিকার কমিশনের অধিবেশনে যোগ দিতে জেনেভায় অবস্থান করছিলেন। ২৫শে মার্চে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্রদের নির্মম হত্যাকাণ্ডের খবর শোনার পর ২৬শে মার্চ সন্ধ্যায় জেনেভা থেকে তিনি লন্ডনে প্রত্যাবর্তন করেন। ঢাকার অবস্থা জানার জন্য তিনি ব্রিটিশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দক্ষিণ এশিয়া বিভাগের প্রধান আয়ান সাদারল্যান্ডের সাথে যোগাযোগ করেন (২৭শে মার্চ)। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে অবস্থানকালীন সময়ে ঢাকা থেকে প্রেরিত টেলেক্স মারফত তিনি প্রকৃত ঘটনা অবহিত হন এবং সাথে সাথেই তিনি পাকিস্তান সরকারের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেন।[৩] এরপর থেকেই বাংলাদেশের পক্ষে তিনি ব্যক্তি উদ্যোগে কাজ করতে শুরু করেন।

উপযুক্ত সংগঠন গঠনের উপর সমষ্টিগত সাফল্য অনেকাংশে নির্ভর করে – এ সত্যকে ধারণ করে তিনি দ্বিধাবিভক্ত প্রবাসী বাঙালিদের ঐক্যবদ্ধ করার লক্ষ্যে কাজ করেন। ব্রিটিশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের সাথে সাক্ষাৎ, মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে প্রচারণা, ব্রিটেনের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলরদের সঙ্গে যোগাযোগ করে বাঙালিদের উপর পশ্চিম পাকিস্তান সরকারের অত্যাচারের চিত্র তুলে ধরেন। ইতোমধ্যে ১০ই এপ্রিল, ১৯৭১-এ বাংলাদেশ সরকার গঠিত হয়। এ সরকার গঠনের কয়েক দিনের মধ্যে অর্থাৎ ২৩ এপ্রিল তাঁকে এ সরকারের বিশেষ দূত হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়।[৪] বিশেষ দূত হিসেবে এপ্রিল ১৯৭১-এ নিয়োগ পেলেও আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশ মিশন (লন্ডন)-এর উদ্বোধন হয় আরও ৩ মাস পর (২৭শে আগস্ট ১৯৭১)। তবে আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের আগে থেকেই তিনি বিশেষ দূত হিসেবে তাঁর দায়িত্ব পালন করছিলেন। মিশন স্থাপনের মাধ্যমে তাঁর সমস্ত কাজ একটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পায়।

---

[২] বাংলাদেশ মিশন, লন্ডন সম্পর্কিত বইয়ের জন্য দেখুন, আবু সাঈদ চৌধুরী, *প্রবাসে মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলি*, (ঢাকা: ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৯০); হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পা.), *বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ দলিলপত্র*, ৪র্থ খণ্ড (ঢাকা: গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, তথ্য মন্ত্রণালয়, ১৯৮২); আবদুল মতিন, *স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রবাসী বাঙালি* (লন্ডন: র‍্যাডিক্যাল এশিয়া পাবলিকেশন্স, ১৯৮৯); তাজুল মোহাম্মদ, *মুক্তিযুদ্ধ ও প্রবাসী বাঙালি সমাজ* (ঢাকা: সাহিত্য প্রকাশ, ২০০১); এইচ. টি. ইমাম, *বাংলাদেশ সরকার ১৯৭১* (ঢাকা, ২০০৪); ফায়েকুজ্জামান, *মুজিব নগর সরকার ও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০৮); Sukumar Biswas, *Bangladesh Liberation War: Mujibnagar Government Documents 1971* (Dhaka: Mowla Brothers, 2005).

[৩] আবু সাঈদ চৌধুরী, *প্রবাসে মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলি*, পৃ. ৪।

[৫] মতিন, *স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রবাসী বাঙালি*, পৃ.৫০।

[৬] George Lenczowski, *The Middle East in World Affaires* (London: Cornell University Press, 1980), p. 235.

একটি স্বাধীন রাষ্ট্র বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কূটনৈতিক দায়িত্ব পালনের জন্য মিশন বা কনসুলেট স্থাপন করে থাকে যা একটি স্বাধীন দেশের কূটনৈতিক যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত। স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে একটি মিশন কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের জন্য কার্যক্রম চালাতে সক্ষম, কিন্তু যুদ্ধকালীন সময়ে গঠিত প্রবাসী সরকারের মিশনগুলো ভিন্ন পরিস্থিতিতে তাদের কার্যক্রম চালাতে হয় বলে আশ্রিত দেশের সরকারের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অনুমতি প্রয়োজন হয়ে থাকে। বিশ শতকে এ রকম মিশন দুর্লক্ষ্য নয়। প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের সময় (১৯১৪-১৮) জার্মানি থেকে Von Hentig এবং Nieder Mayer তুরস্ক, ইরান হয়ে আফগানিস্থানে এসেছিলেন এবং আফগানিস্থানের বাদশাহ হাবিবুল্লার অনুমতি নিয়ে সক্রিয়ভাবে জার্মানির পক্ষে জার্মান মিশনের কার্যক্রম পরিচালনা করেন।[৫] যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ সরকারও এরকম মিশন গঠনের মাধ্যমে বিভিন্ন দেশের সাথে সম্পর্ক স্থাপন ও নতুন রাষ্ট্রকে স্বীকৃতিদানের জন্য যোগাযোগ অব্যাহত রেখেছিল। বাংলাদেশ সরকার শপথ গ্রহণের (১৭ই এপ্রিল) একদিনের মধ্যে কলকাতায় বাংলাদেশ মিশন গঠন করা হয় ১৮ই এপ্রিল ১৯৭১, যা ইতিপূর্বে পাকিস্তান মিশন নামে পরিচিত ছিল। কলকাতাস্থ পাকিস্তানের বাঙালি কর্মকর্তা হোসেন আলী পাকিস্তান সরকারের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে সদ্য প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন। এভাবে প্রথম মিশন যাত্রা শুরু করে। যুদ্ধকালীন সময়ে প্রায় ১১টি মিশন কাজ করেছিল।[৬] তবে লন্ডন মিশনের মাধ্যমেই বহির্বিশ্বে বাংলাদেশ পরিস্থিতি সম্পর্কে দ্রুত প্রচারাভিযান চালানো হয়।

বাংলাদেশ সরকারের তৎপরতা, মিশনের প্রচার প্রচারণার ফলে এবং স্ব-উদ্যোগে অনেক বাঙালি কূটনীতিক পাকিস্তান পক্ষ ত্যাগ করে নতুন সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে। তবে বাংলাদেশ সরকার বা মিশন গঠনের বহু আগেই (৬ ই এপ্রিল) পূর্ব পাকিস্তান থেকে আসা ২৫ শে মার্চের হত্যাযজ্ঞের খবর শুনেই বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন দিল্লীতে পাকিস্তান হাই কমিশনের সেকেন্ড অফিসার হিসেবে কর্মরত কে.এম. শিহাবউদ্দিন।[৭] পাকিস্তান সরকারের সাথে সম্পর্ক ছিন্নকারী কূটনীতিবিদদের মধ্যে তিনিই ছিলেন প্রথম। কলকাতাস্থ ডেপুটি হাই কমিশনার হোসেন আলীসহ দূতাবাসের ৫ জন কর্মকর্তা ও ৬৫ জন কর্মচারী বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করেন। একইভাবে ১৯৭১ সালে ফিলিপাইন, যুক্তরাষ্ট্র, ইরাক, ব্রিটেন,জাপান, আর্জেন্টিনা এবং অন্যান্য জায়গা থেকেও বাঙালি কুটনীতিকরা বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন।[৮] এ তালিকায় পরে

---

[৬] ১১টি মিশন হলো – (বাংলাদেশ মিশন) কোলকাতা, নিউদিল্লী, লন্ডন, নিউইর্য়ক, ওয়াশিংটন, হংকং, ম্যালিনা, কাঠমুন্ডু, বার্ণ, টোকিও । দেখুন, *বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ দলিলপত্র*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৮৫৭; হাসিনা আহমেদ, *১৯৭১: মুক্তিযুদ্ধের পত্র পত্রিকা* (ঢাকা: ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর বেঙ্গল স্টাডিজ, ২০১১), পৃ. ১২৪।

[৭] K.M. Shehabuddin, *There and Back Again: A Diplomat's Tale* (Dhaka: University Press Limited, 2006), p. 81.

[৮] পাকিস্তান সরকারের পক্ষত্যাগকারী কূটনীতিবিদদের মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য ছিলেন: আবুল ফতেহ – রাষ্ট্রদূত, ইরাক ; খুররম খান পন্নী – রাষ্ট্রদূত, ফিলিপাইন; আবুল মোমেন – রাষ্ট্রদূত (আর্জেন্টিনা); এম. হোসেন আলী- ডেপুটি হাই কমিশনার, কোলকাতা; আবুল মাল আবদুল মুহিত – অর্থনৈতিক কাউন্সিলর, ওয়াশিংটন; এনায়েত করিম – উপ-প্রধান, ওয়াশিংটন; মহিউদ্দিন আহমদ – সেকেন্ড সেক্রেটরি, লন্ডন; কে.এম.শিহাবউদ্দিন-সেকেন্ড সেক্রেটারী, নয়াদিল্লী; রেজাউল করিম – কাউন্সিলর, লন্ডন; শাহ্ আবু মোহাম্মদ শামসুল কিবরিয়া – পরিটিক্যাল কাউন্সিলর, ওয়াশিংটন; লুৎফুল মতিন – ডিরেক্টর অব অ্যাকাউন্ট এন্ড অডিট, লন্ডন। দেখুন, *বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ দলিলপত্র*, ৩য় খণ্ড, পৃ.৮৯৭ ; তাজুল মোহাম্মদ, পৃ ৬০; ফায়েকুজ্জামান, পৃ.১৬৭।

যোগ হয়েছিলেন আরও অনেকে, তবে ইউরোপে কর্মরত বাঙালি কূটনীতিকদের মধ্যে মহিউদ্দিন আহমদই প্রথম পাকিস্তান সরকারের সাথে সম্পর্কছেদ করেন। বিশ্বের বিভিন্ন সংবাদপত্র এ পদত্যাগের সংবাদগুলোকে গুরুত্ব সহকারে উপস্থাপন করেছিল। *The Times* (London) এর রিপোর্ট মতে, সেপ্টেম্বরের মধ্যেই প্রায় ৪০ জন কূটনীতিবিদ বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন।[৯] কূটনীতিকদের পদত্যাগের বিষয়টি যে তুচ্ছ নয় বরং এটা যে পাকিস্তান সরকারের গভীর নজরে আনার বিষয় এটা স্মরণ করিয়ে দিয়ে ব্রিটেনের *The Guardian*-এর সম্পাদকীয়তে মন্তব্য করা হয় "Diplomats are normally among the last people to resign when it happens it commands attention."[১০] পাকিস্তান সরকার বাঙালি কূটনীতিবিদদের পক্ষ ত্যাগ বন্ধ করতে তাদের ৭ই সেপ্টেম্বর ১৯৭১ এর মধ্যে পাসপোর্ট জমাদানের নির্দেশ দেওয়া সত্ত্বেও তা কার্যকর করতে পারেনি। সরকার গঠনের মাত্র আট মাসের মধ্যেই উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কূটনীতিবিদের পদত্যাগ নিঃসন্দেহে বাংলাদেশ সরকার এবং মিশনগুলোর ছিল বড়ো কূটনৈতিক সাফল্য।

বাংলাদেশ মিশন (লন্ডন) প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক পর্যায়

ভারতের বাইরে লন্ডনেই প্রথম বাংলাদেশ মিশন স্থাপিত হয়।[১১] রাজনৈতিক দিক থেকে লন্ডনে একটি মিশন স্থাপন বাংলাদেশ সরকারের জন্য প্রয়োজন ছিল। ইউরোপের মধ্যে লন্ডন সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক এবং বুদ্ধিবৃত্তি চর্চার কেন্দ্রস্থল হিসেবে পরিচিত। তাই মুক্তিযুদ্ধকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উপস্থাপনে ও গণতন্ত্রী বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য লন্ডনের মতো একটি কেন্দ্রস্থলই দরকার ছিল। আবু সাঈদ চৌধুরী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীনকে লিখিত এক পত্রে এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন বলেও জানিয়েছিলেন। অন্য একজন প্রবাসী বাঙালিকে লিখা চিঠিতেও তিনি শীঘ্রই এরকম একটি মিশন স্থাপনের মাধ্যমে আরও সংগঠিত উপায়ে মুক্তিযুদ্ধের কাজ করবেন বলে জানান।[১২] তবে মিশন স্থাপনের ঘোষণা তিনি দিয়েছিলেন লন্ডনে 'অ্যাকশন বাংলাদেশ' কর্তৃক আয়োজিত ১লা আগস্টের জনসভায়। মিশন স্থাপনের ঘোষণা এলেও এর জন্য স্থান নির্ধারণ ও এর খরচ সংকুলান একটি বড়ো সমস্যা হয়ে দেখা দেয়। এ দুই সমস্যার সমাধানে এগিয়ে এসেছিলেন দুই ব্যক্তি। বাংলাদেশ মিশনের জন্য স্থান পাওয়ার ব্যাপারে সাহায্য করেছিলেন আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থা 'War on want' এর চেয়ারম্যান ডোনাল্ড চেস্ওয়ার্থ। সে সময় চেসওয়ার্থ একটি ব্রিটিশ ট্রাস্ট 'টক-এইচ' নামক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিচালিত একটি আন্তর্জাতিক হোস্টেলের ওয়ার্ডেন পদে ছিলেন। ২৪ নম্বর পেমব্রিজ গার্ডেনে অবস্থিত এই হোস্টেলের নীচতলার কয়েকটি রুম নামমাত্র ভাড়ায় বাংলাদেশ মিশনকে ব্যবহার করার জন্য দেন।[১৩] সাধারণত ট্রাস্ট প্রপার্টি ভাড়া না নিয়ে অন্যকে দেওয়া যায় না। তাই নিয়মরক্ষার্থে চেস্ওয়ার্থকে এ ভাড়া নিতে হতো।

দূতাবাসের স্থান সমস্যার সমাধান হওয়ার পর এর মাসিক খরচের বিষয়টি মুখ্য হয়ে ওঠে। মাসিক খরচ ধার্য হয়েছিল প্রায় ২ হাজার ৫০০ ব্রিটিশ পাউন্ড। স্বাধীনতা যুদ্ধে লিপ্ত একটি সরকারের পক্ষে এ ধরনের ব্যয়ভার ছিল দুঃসাধ্য। এক্ষেত্রে ব্যক্তি উদ্যোগে এগিয়ে এসেছিলেন জহুরুল হক

---

[৯] *The Times*, 14 September, 1971.

[১০] *The Guardian*, 9 August, 1971.

[১১] আব্দুল মতিন, পৃ. ১৩৫।

[১২] *বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ: দলিলপত্র*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৮৯।

[১৩] আবু সাঈদ চৌধুরী, পৃ. ৯৯।

নামের এক সহৃদয় বাঙালি যিনি পাকিস্তান আর্মির হাত থেকে বেঁচে গিয়ে অসুস্থতার দোহাই দিয়ে লন্ডন চলে গিয়েছিলেন। লন্ডন আসার পূর্বে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের কাছ থেকে বাংলাদেশকে অর্থ সাহায্য করার অনুরোধ পেয়েছিলেন। লন্ডনে এসে আবু সাঈদ চৌধুরীর সাথে যোগাযোগ করলে তিনি দূতাবাসের মাসিক খরচের বিষয়টি তার সামনে উপস্থাপন করেন। জহুরুল হক তাতে সানন্দে রাজি হয়ে ২/৩ বছরের খরচের টাকা একসাথে দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু দূতাবাসের খরচ মাসিক হিসেবে নিতে আবু সাঈদ চৌধুরী সম্মত হন। সে পরিমাণ অর্থ প্রতিমাসে নিজস্ব তহবিল থেকে জহুরুল হক প্রদান করতেন সুবিদ আলী নামে একজন রোগীর পক্ষে এবং মিশনের পক্ষে সেটা গ্রহণ করতেন লুৎফুল মতিন।[১৪] এ পন্থা অবলম্বন করতে হয়েছিল ঢাকায় অবস্থানরত তাঁর আত্মীয়স্বজনকে পাকিস্তানি আর্মির হাত থেকে বাঁচানোর জন্য। এইভাবেই মিশনের জন্য অর্থ ও স্থান সমস্যার সমাধান হয়েছিল।

প্রয়োজনীয় অর্থ ও স্থানের বন্দোবস্ত হওয়ায় ২৭শে আগস্টে (১৯৭১), ২৪ নম্বর পেমব্রিজ গার্ডেন, ওয়েস্ট এন্ডে বাংলাদেশ মিশন উদ্বোধন করা হয়। প্রায় ৩০০ জন প্রবাসী বাঙালি ও অনেক বিদেশি সাংবাদিকদের উপস্থিতিতে মিশনের সামনে আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করা হয়। উদ্বোধনের দিন মিশনের সদস্যদের মধ্যে ছিলেন আবুল ফতেহ, মহিউদ্দিন আহমদ, লুৎফুল মতিন, শিল্পী আবদুর রউফ, মহিউদ্দিন চৌধুরী, আবদুস সালাম, এ.কে.এম. নুরুল হুদা ও ফজলুল হক চৌধুরী। ব্রিটিশ পার্লামেন্টের কয়েকজন সদস্য বাংলাদেশের সার্বিক সফলতা কামনা করে বক্তৃতা করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আবু সাঈদ চৌধুরী বলেছিলেন, লন্ডন থেকেই বিশ্বব্যাপী বাংলাদেশ মুক্তি আন্দোলনের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করা হবে এবং লন্ডনই হবে বহির্বিশ্বে বাংলাদেশ আন্দোলনের প্রধান কেন্দ্র।[১৫] বস্তুত পরবর্তী সময়ে মিশনের বিভিন্ন কর্মসূচিতে এর প্রতিফলন ঘটেছিল।

আনুষ্ঠানিকভাবে মিশন উদ্বোধনের আগেই (এপ্রিল মাসে) বাংলাদেশ সরকার বিচারপতি আবু সাঈদকে বিশেষ দূত ঘোষণা করে 'লেটার অব ক্রেডেন্স' বা পরিচয়পত্র প্রদান করে। বাংলাদেশ মিশন উদ্বোধনের পর তা আবার নতুন করে ব্রিটিশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়। সরকারের পক্ষ থেকে রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম, প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদ ও মুক্তিযুদ্ধের প্রথম সেনাপতি ওসমানী দীর্ঘ পত্র মারফত আবু সাঈদ চৌধুরীকে অভিনন্দন জানান এবং বহির্বিশ্বে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম দূতাবাস বলে উল্লেখ করেন।[১৬] যুদ্ধ শুরুর কয়েক মাসের মধ্যেই লন্ডনের মতো স্থানে মিশন স্থাপন একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এ ধরনের মিশন স্থাপনের ফলে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের যৌক্তিকতা আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠে।

বাংলাদেশ মিশন (লন্ডন) এর কার্যাবলি

মিশন স্থাপিত হওয়ার পর সরকারি কর্মচারী যাঁরা পাকিস্তান সরকারের পক্ষ ত্যাগ করে বাংলাদেশের পক্ষে আনুগত্য প্রকাশ করেছিলেন, তাদেরকে ১১ নং গোরিং স্ট্রিটের অফিস থেকে স্থানান্তর করে এ মিশনে নিয়ে আসা হয় মিশনের কার্যাবলি পরিচালনার জন্য। মিশনের কার্যাবলিকে নিম্নোক্তভাবে ভাগ করা হয় –

১) ইউরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন দেশ সফরের মাধ্যমে পাকিস্তানিদের অত্যাচারের চিত্র তুলে ধরা ও মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে প্রচারণা চালানো;

---

[১৪] তদেব, পৃ. ৯৯।

[১৫] আবদুল মতিন, পৃ. ১৩৫।

[১৬] আবু সাঈদ চৌধুরী, পৃ. ১০১।

২) বিশেষ বিভিন্ন সরকারের নিকট চিঠিপত্র আদান প্রদান করা; ও

৩) ব্রিটিশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপন করা।

এসব লক্ষ্য সামনে রেখে দূতাবাস স্থাপনের পরপরই আবু সাঈদ চৌধুরী প্রায় ১৫ দিনের জন্য ইউরোপ সফরে বের হন। স্ক্যান্ডিনেভিয়ান দেশগুলো সফরের মাধ্যমেই শুরু হয়েছিল তাঁর যাত্রা। প্রায় ৭ দিনের মতো তিনি নরওয়েতে অবস্থান করেছিলেন। নরওয়ের গুটিকয়েক প্রবাসী বাঙালিকে নিয়ে তাঁর প্রচারণার ফলে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন বিভিন্ন মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সেখানে স্থানীয় টিভি কর্তৃপক্ষকে সাক্ষাৎকার প্রদান, নরওয়ের প্রধান বিচারপতির সাথে সাক্ষাৎ এবং নরওয়ের মেয়রের সাথে দেখা করে বাংলাদেশ পরিস্থিতি সম্পর্কে তিনি ধারণা দেন। পরবর্তীতে সুইডেন গমন করে সেখানকার বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ গুনার মীরডাল, কিছু রাজনীতিবিদ, পররাষ্ট্র মন্ত্রনালয়ের কর্মকর্তা, প্রধান বিচারপতির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। পরবর্তী সফরের স্থান ছিল ফিনল্যান্ড, যেখানে আবু সাঈদ চৌধুরীর বন্ধু ব্রিটিশ কনসাল জেনারেল রয়ফক্স তাকে অভ্যর্থনা জানান। এছাড়া ফিনল্যান্ডে তিনি টেলিভিশনে সাক্ষাৎকার দেন ও বিশ্বশান্তি পরিষদের চেয়ারম্যানের সাথে সাক্ষাৎ করেন। একইভাবে ডেনমার্কে গিয়েও সেখানকার পার্লামেন্টের স্পিকারের সঙ্গে দেখা করেন। পার্লামেন্টের বৈদেশিক কমিটির প্রধান কিয়েন অলস্যোনর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। যিনি পরে ডেনমার্কের প্রতিরক্ষামন্ত্রী হয়েছিলেন। তাছাড়া সেখানকার বিভিন্ন প্রভাবশালী পত্রিকার সম্পাদকের সাথেও তিনি যোগাযোগ করেন।[১৭] মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে প্রচারণার জন্য বাংলাদেশ মিশন প্রধান যাদের সাথে দেখা করেছিলেন প্রায় প্রত্যেকের কাছ থেকেই তিনি সৌহার্দ্যপূর্ণ ব্যবহার পেয়েছিলেন এবং তারা ধৈর্যসহকারে বিষয়টি শুনে বিবেচনা করার আশ্বাস দিয়েছিলেন। দূতাবাস স্থাপনের আগে এত দীর্ঘ সময়ের জন্য তিনি ইউরোপ যাত্রা করেননি। পাকিস্তান সরকারের অত্যাচারের বিষয় তুলে ধরা, মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে প্রচারণা ও নতুন সরকারের স্বীকৃতির জন্যই তিনি এতো দীর্ঘ সফরের ব্যবস্থা করেছিলেন।

মিশনের জন্য উপর্যুক্ত সফরগুলি অনেক সফলতা বয়ে এনেছিল। উদাহরণস্বরূপ কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করা যায়। অসলোর (নরওয়ে) মেয়র আবু সাঈদ চৌধুরীকে দেওয়া উপহারে বাংলাদেশের বিশেষ প্রতিনিধি হিসেবে তাকে উল্লেখ করেন।[১৮] নরওয়ে সরকার স্বীকৃতি দেওয়ার আগেই সে দেশের মেয়র বাংলাদেশ নামে একটি নতুন দেশের অস্তিত্ব স্বীকার করে নেন। নরওয়ের পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর সাথে দীর্ঘ আলাপ আলোচনার পর স্কেন্ডিনেভিয়ান দেশসমূহের পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের সম্মেলনে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকে সমর্থন জানিয়ে বিবৃতি দেবেন বলে আশ্বাস দেন। এ সফরের মাধ্যমে দেশগুলোর কেউ কেউ মুক্তিসংগ্রামে প্রত্যক্ষভাবে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেন। সুইডেনের অর্থনীতিবিদ গুনার মীরডাল বাংলাদেশ মিশন প্রধানের অনুরোধে 'সুইডেন বাংলাদেশ অ্যাকশন কমিটির' চেয়ারম্যান হন। আবার 'সুইডিশ সোসালিস্ট ডেমোক্রেটিক পার্টি'-র মহাসচিব পার্টি থেকে বাঙালি মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্র সরবরাহ করার কথাও বলেন। আরও বাস্তব ও কার্যকর পদক্ষেপের ব্যাপারে অর্থাৎ পাকিস্তানকে অস্ত্র সরবরাহ না করার জন্য ডেনমার্ক সরকারকে অনুরোধ জানানোর পরামর্শ দিয়েছিলেন ডেনমার্ক টিভির এক উপস্থাপক। আবু সাঈদ চৌধুরী তাঁর টিভি সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে এ অনুরোধ ডেনমার্ক সরকারকে জানিয়েছিলেন। এসব প্রচারণা ও চেষ্টার ফলে ডেনমার্কের বেশ কয়েকটি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান পাকিস্তানে অস্ত্র সরবরাহে অসম্মতি জানায়।[১৯] এ সফরের

---

[১৭] তদেব, পৃ. ১০২-১২০।

[১৮] তদেব, পৃ. ১০৫।

[১৯] তদেব, পৃ. ১০৯, ১১৬।

এটি ছিল একটি অন্যতম সফলতা। ভূখণ্ডের ভেদরেখা লুপ্ত হয়ে বাঙালিদের এ মুক্তিসংগ্রামের সাথে তাদের একাত্মতা ছিল মিশনের জোরালো ও যুক্তিসংগত উপস্থাপনার ফসল।

মিশনের অন্যতম কাজ ছিল চিঠিপত্র আদান প্রদান। ব্রিটেনসহ ইউরোপের অন্যান্য দেশের সরকার প্রধান ও উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তাদের কাছে মিশন নিয়মিত বাংলাদেশ বিষয়ক চিঠিপত্র প্রেরণ করতেন। ব্যক্তি উদ্যোগেও চিঠির আদান-প্রদান চলছিল তবে মিশন স্থাপনের ফলে সেটা আরও ব্যাপকতা পায়, বাংলাদেশ স্টুডেন্ট অ্যাকশন কমিটির প্রতিনিধি দলের বিভিন্ন দলকে মিশন বিভিন্ন জায়গায় প্রেরণ করে। প্রায় ১০ দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত (১লা সেপ্টেম্বর থেকে ১০ই সেপ্টেম্বর, ১৯৭১) প্যারিসে আন্তর্জাতিক পার্লামেন্টারি ইউনিয়নের বার্ষিক সম্মেলনে তাদেরকে পাঠানো হয়। এই সম্মেলনের সভাপতি আদ্রে সেনারলাগারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে প্রতিনিধিবৃন্দ আবু সাঈদ চৌধুরীর লিখিত চিঠি তাঁর নিকট দেন, যেখানে বাংলাদেশ সরকারের পার্লামেন্টকে স্বীকৃতির জন্য অনুরোধ জানানো হয়। সম্মেলনে বিভিন্ন দেশ থেকে প্রায় ৭০০ প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। প্রত্যেক প্রতিনিধি দলের নেতার নিকট চিঠি পৌঁছে দেওয়া হয়। চিঠির সঙ্গে নতুন সরকারের সমর্থন বা পাকিস্তানের অত্যাচারের বিবরণ ছাড়াও বাংলাদেশ বিষয়ক লেখা প্রবন্ধ, বিশ্ব ব্যাংকের রিপোর্ট, বাংলাদেশ সরকারের নানা ভাষণের পুনর্মুদ্রণ, বাংলাদেশ বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ সংবাদের কাটিংও যুক্ত করা হতো। এ মিশন উদ্বোধনের কয়েক দিনের মধ্যেই রুমানিয়ায় 'বিজ্ঞান ও বিশ্ব শান্তি' শীর্ষক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে ছাত্রনেতা মোহাম্মেদ হোসেন আন্দোলন সম্পর্কিত প্রচার পুস্তিকা ও আবু সাঈদ চৌধুরীর চিঠি নিয়ে সম্মেলনের সভাপতির সঙ্গে দেখা করেন।[২০] প্রায় প্রত্যেক চিঠির বিষয়বস্তু ছিল বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দান, বঙ্গবন্ধুর মুক্তি এবং পাকিস্তানকে সমরাস্ত্র না দেয়ার দাবি। অনেক ক্ষেত্রে চিঠির প্রাপক আন্দোলনের সাফল্য কামনা করে জবাব দিতেন। এ ধরনের সহানুভূতিপূর্ণ ব্যবহার ও একাত্মতা প্রকাশ করার সাফল্যের পেছনে মিশনের ভূমিকা ছিল অনন্য।

কূটনৈতিক সম্পর্ক জোরদার করার উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করা ছিল মিশনের অন্যতম উদ্দেশ্য। মিশন স্থাপনের পূর্বে এবং মুক্তিযুদ্ধ শুরুর ক্ষণে ব্রিটিশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে যাওয়ার মধ্য দিয়ে আবু সাঈদ চৌধুরী মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে কাজ শুরু করেছিলেন। ব্রিটিশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দক্ষিণ এশিয়া বিভাগের প্রধান আয়ান সাদারল্যান্ড এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রীর একান্ত সচিব ব্যারিংটনের কাছ থেকেই ২৫শে মার্চের হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে আবু সাঈদ চৌধুরী অবগত হয়েছিলেন। এরপর থেকেই তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করেছিলেন তিনি। স্বাভাবিকভাবেই, মিশন স্থাপনের পর এ যোগাযোগ অব্যাহত রেখেছিলেন যদিও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা এ ধরনের যোগাযোগকে আনুষ্ঠানিকভাবে না দেখে ব্যক্তিগত যোগাযোগ হিসেবেই বিবেচনা করতেন।[২১] তবুও এ ব্যক্তি যোগাযোগের মাধ্যমে প্রাপ্ত তাদের সহানুভূতিপূর্ণ মনোভাব মিশন প্রধানের কাজে সাহায্য করেছিল। তৎকালীন পাকিস্তানে ব্রিটেনের শেষ রাষ্ট্রদূত স্যার সাইরিল পিকার্ড আবু সাইদ চৌধুরীর কাছ থেকে বাংলাদেশ পরিস্থিতির খোঁজ খবর নিতেন। তিনি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে শেখ মুজিবুর রহমানের অবস্থার কথা যতদূর জানতে পারতেন, তা তিনি আবু সাঈদ চৌধুরীকে জানাতেন।[২২] এঁদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সমর্থনে মিশনের কাজে গতি সঞ্চার হয়।

---

[২০] আবদুল মতিন, পৃ. ১৩৯।

[২১] *FCO' 37/977*, From I.J.M. Sutherland to Private Secretary, 30 December, 1971.

[২২] আবু সাঈদ চৌধুরী, পৃ. ১৪৪।

ব্রিটিশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আয়ান সাদারল্যান্ড এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহেই আবু সাঈদ চৌধুরীকে বৈদেশিক সাহায্য দপ্তরের মন্ত্রী রিচার্ড উডের সঙ্গে সাক্ষাতের ব্যবস্থা করে দেন। এপ্রিলেই ব্রিটিশ পররাষ্ট্র মন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আবু সাঈদ চৌধুরী প্রায় দেড় ঘণ্টা কথা বলেন। নিয়মতান্ত্রিকভাবে শৃঙ্খলা রক্ষা করে এবং লন্ডনে প্রধান কার্যালয় স্থাপন করে লন্ডন থেকেই বিশ্ববাসীকে পাকিস্তানের শোষণের কথা এবং মুক্তিযুদ্ধের প্রচারণার কথা ব্রিটিশ পররাষ্ট্র মন্ত্রীকে বললে তিনি নিষেধ করেননি। একই সাথে বাংলাদেশ স্বাধীন না হওয়া পর্যন্ত আবু সাঈদ চৌধুরী ব্রিটেনে অবস্থান করবেন বলে জানালেও পররাষ্ট্রমন্ত্রী কেবল প্রীতিপূর্ণ হাসেন, যা তিনি সম্মতিসূচক বলেই ভেবেছিলেন।[২৩] ব্রিটেন ছাড়াও ফিনল্যান্ড, সুইডেন, ডেনমার্কে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পদস্থ কর্মকর্তাদের সাথে আবু সাঈদ চৌধুরী সাক্ষাৎ করে। বাংলাদেশ সংগ্রামের সাথে তাঁদের পরিচিত করেন। মিশনের এ ধরনের কার্যাবলি ও প্রচারণার ফলে বিশ্বজনমতকে প্রভাবিত করার পাশাপাশি প্রত্যক্ষ কিছু ফল লাভে সহায়ক হয়েছিল। আন্তর্জাতিক বিভিন্ন ফোরামে (আন্তর্জাতিক পার্লামেন্টারী ইউনিয়ন ও গান্ধী পিস ফাউন্ডেশন সম্মেলন, কমনওয়েলথ পার্লামেন্টারী এসোসিয়েশন) এ প্রসঙ্গে গুরুত্বের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে এবং কার্যকর কিছু পন্থাও গ্রহণ করা হয়েছিল। ফ্রান্স পাকিস্তানের জন্য অস্ত্র সরবরাহ বন্ধ করে দেয়।[২৪] তেমনি যুক্তরাজ্য অস্ত্রের ব্যাপারে সরাসরি পাকিস্তানকে নাকচ না করলেও সরবরাহমতো অস্ত্র নেই জানিয়ে চিঠি দেয়।[২৫] এ কৌশলও বাংলাদেশকে পরোক্ষভাবে সাহায্য করেছিল। ব্রিটিশ পার্লামেন্টে ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী ঘোষণা দেন যদি পাকিস্তান কোনো সন্তোষজনক রাজনৈতিক সমাধান না করে তবে 'Aid to Pakistan Consortium' এর সদস্য হিসেবে ব্রিটেন পাকিস্তানকে আর নতুন কোন ফান্ড দিতে সম্মত হবে না।[২৬] তাছাড়া বাংলাদেশ মিশন (লন্ডন) প্রধানের সময়োচিত পদক্ষেপ ও প্রতিবাদের ফলে ব্রিটিশ ও মার্কিন সরকার পাকিস্তানের জন্য ছোট ছোট লঞ্চ প্রেরণ বন্ধ করে দিয়েছিল।[২৭] বাঙালিদের জন্য এটা ছিল একটা বড় সাফল্য। কারণ নদীমাতৃক দেশ হিসেবে এসব মোটরবোটের সাহায্যে বাংলাদেশের একেবারে প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে পৌঁছে বাঙালিদের উপর অত্যাচারের মাত্রা ও হত্যার সংখ্যা বাড়াতে পারতো। এভাবে লন্ডন ভিত্তিক কূটনৈতিক চাপ বৃদ্ধির ফলে বিশ্বজনমত বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রতি জোরদার হয়।

উপরোক্ত কার্যাবলি মিশন নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করতে পারেনি বরং মিশন এবং মিশন প্রধানকে নানা সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। মিশন গঠনের আগে ও পরে বাংলাদেশের বিভিন্ন সভা বা বাংলাদেশকে সাহায্য না করার জন্য পাকিস্তানি কূটনীতিবিদরা প্রচেষ্টা চালান। লন্ডন ও জেনেভায় এরকম দুটি সভায় পাকিস্তান সর্বতোভাবে চেষ্টা চালিয়েছিল সভা বন্ধ করার জন্য। লন্ডনস্থ রয়েল কমনওয়েলথ সোসাইটিতে আবু সাঈদ চৌধুরীকে আমন্ত্রণ জানানো হলে পাকিস্তান দূতাবাস (লন্ডন) প্রতিবাদ জানিয়ে আমন্ত্রণ প্রত্যাহার করতে বলেন। শেষ পর্যন্ত সালমান আলী (পাকিস্তান হাই কমিশনার) এ সোসাইটির ভাইস-প্রেসিডেন্টের পদ থেকে পদত্যাগ করেন। তবে সোসাইটি পাকিস্তান

---

[২৩] তদেব, পৃ. ১৬।

[২৪] মতিন, পৃ. ১৮০।

[২৫] *FCO' 37/977*, Arms Sales to Pakistan, From H-C Byatt to G.1., Bullard, 27 May 1971.

[২৬] Parliamentary Debates (Hansard), House of Commonce, 5th Series, vol-819, Col. 1436, 23 June. 1971

[২৭] আবু সাঈদ চৌধুরী, পৃ. ৫৬।

দূতাবাসকে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছিল কাউকে নিমন্ত্রণ করে তা প্রত্যাহার করার রীতি সোসাইটির নেই। তেমনি জেনেভায়ও এক সাংবাদিক সম্মেলন নিয়ে পাকিস্তানি রাষ্ট্রদূত বিভ্রান্তি ছড়াতে চাইলে সেটাও বরং আশাতীত প্রচার পায়।[২৮] তারপরও পাকিস্তান বাংলাদেশ মিশনের কার্যকলাপ সম্পর্কে ব্রিটেনের কাছে কূটনৈতিকভাবে প্রতিবাদ করেছে। মিশন উদ্বোধনের দিন লন্ডনে অবস্থানরত পাকিস্তানের হাই কমিশনার সালমান আলী ব্রিটিশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে গিয়ে প্রতিবাদ জানান এবং উদ্বোধনী অনুষ্ঠান বন্ধের কথা বলেন। তিনি বৈদেশিক সাহায্য দপ্তরের মন্ত্রী জোসেফ গোডবারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে যুক্তরাজ্যের একটি বন্ধু রাষ্ট্রের একটি অংশ বাংলাদেশ নাম নিয়ে লন্ডনে দূতাবাস স্থাপন পাকিস্তানের জন্য অবমাননাকর বলে মন্তব্য করেন। উত্তরে জোসেফ গোডবার ব্রিটেনে যে কারও বাক ও কাজের স্বাধীনতা স্বীকৃত বলে পাকিস্তান হাইকমিশনারকে স্মরণ করিয়ে দেন। পাকিস্তানের প্রতিবাদ সত্ত্বেও সম্ভাব্য যে কোনো আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য বরং পুলিশি পাহারার ব্যবস্থা করে নির্বিঘ্নে অনুষ্ঠান সম্পন্ন করার জন্য ব্যবস্থা করে দেয় ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ।[২৯] যদিও এ মিশনকে ব্রিটেন কূটনৈতিক মর্যাদা দেয়নি তবে পরোক্ষভাবে সাহায্য মিশন পেয়ে যাচ্ছিল।

বাংলাদেশ মিশন (লন্ডন) এর প্রতি ব্রিটিশ সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি

বাংলাদেশ মিশনের (লন্ডন) প্রতি ব্রিটিশ সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি কিরূপ ছিল তা আলোচনা আবশ্যক। মুক্তিযুদ্ধ শুরুর সময় থেকেই ব্রিটেন এ বিষয়ে নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করে আসছিল এবং একীভূত পাকিস্তানের মধ্যেই একটি রাজনৈতিক সমাধান তাদের কাম্য ছিল। পাকিস্তান সরকারের কাছে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড হিথের প্রেরিত বিভিন্ন চিঠিতেও বারবার সেই তাগাদাই ছিল।[৩০] বাংলাদেশকে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দেওয়ার পূর্ব পর্যন্ত বাংলাদেশ মিশন বা বাংলাদেশী প্রতিনিধিদের সাথে সাক্ষাতের বিষয়ে ব্রিটিশ কর্মকর্তারা সতর্কতা অবলম্বন করেছিলেন। আবু সাঈদ চৌধুরীর সাথে আনুষ্ঠানিক সাক্ষাতে কোনো ধরনের অসুবিধা আছে কিনা তা খতিয়ে দেখতে সংশ্লিষ্ট বিভাগকে নির্দেশ দেন ব্রিটিশ স্বরাষ্ট্র সচিব।[৩১] এছাড়া বাংলাদেশ মিশন থেকে মিশন কর্মকর্তা প্রেরিত চিঠি গ্রহণেও সতর্কতা অবলম্বন করা হতো। বাংলাদেশ মিশন থেকে রেজাউল করিম ব্রিটিশ প্রশাসনকে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে চিঠি প্রদান করতেন। ব্রিটিশ সরকার প্রত্যুত্তর না দিয়ে চিঠির বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভাগকে এ সংক্রান্ত সরকারের সাধারণ রীতি উল্লেখ করে বলা হতো: 'In accordance with our usual practices, we shall not sending any reply to Karim's letter.'[৩২] কার্যত আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি জানানোর (৪ঠা ফেব্রুয়ারি ১৯৭২) প্রায় ১১ দিন পর বাংলাদেশ মিশন ব্রিটিশ পররাষ্ট্র মন্ত্রাণালয় থেকে আনুষ্ঠানিক চিঠি পায়।[৩৩]

---

[২৮] তদেব,পৃ. ১৩৭।

[২৯] তদেব,পৃ. ১০১।

[৩০] *FCO 37/888*, /Text of Edward Heath's Message to Yahaya Khan, Tel No. 445, 7 April, from FCO to Islamabad,; PREM 15/568, Record of the Prime ministeres meeting with Mia Arshed Hossain at 10 Dowring Street, 27 April, 1971.

[৩১] *FCO 37/977*, From I.J.M. Sutherland to Private Secretary, 30 December, 1971.

[৩২] *FCO 37/977*, From Sutherland to Mr Moss, 30 December, 1971.

[৩৩] *FCO 37/977,* From Rezaul Karim (Bangladesh Mission) to Andrew C Stuart, South Asian Department, 18 February 1972.

বাংলাদেশ মিশন এবং মিশন প্রধান কিছু পরোক্ষ সাহায্য ব্রিটিশ প্রশাসনের কাছ থেকে পেয়েছিলেন। ব্রিটিশ প্রশাসন আবু সাঈদ চৌধুরীর নিরাপত্তার জন্য দুজন স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের অফিসারকে নিয়োজিত করেছিল। পাকিস্তান সরকারের কোন গুপ্তচর তাঁকে কিডন্যাপ করতে পারেন এ ধরনের সংবাদের ভিত্তিতে তাঁকে নিরাপত্তা দেয়া হয়েছিল। এ দুজন অফিসার তাঁকে নানা ধরনের পরামর্শ দিতেন। যেমন ট্রেনে ওঠার সময়ে একেবারে সামনের সারিতে না থাকতে বা অপরিচিত কাউকে তাঁর ফোন নম্বর না দিতে।[৩৪] এছাড়া মিশন উদ্বোধনের দিন সম্ভাব্য পাকিস্তানি আক্রমণের কথা চিন্তা করে পুলিশি পাহারার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ১৭ই জুন (১৯৭১) বাংলাদেশ সরকার আবু সাঈদ চৌধুরীকে আনুষ্ঠানিকভাবে দূত ঘোষণা করে একটি কার্ড প্রেরণ করে। সে কার্ডের একটি কপি বাকিংহাম প্যালেসে পাঠানো হয়। বাকিংহাম প্যালেস থেকে প্রাপ্তি স্বীকার করে একটি চিঠি আবু সাঈদ চৌধুরীকে পাঠানো হয়েছিল। কারও কারও মতে এটা পরোক্ষ স্বীকৃতি।[৩৫] বাংলাদেশ যখন বিজয়ের প্রায় কাছাকাছি তখন ব্রিটিশ কর্মকর্তাদের কিছু টেলিগ্রাম মিশন প্রধান আবু সাঈদ চৌধুরীর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা ও সাক্ষাৎ করাকে ব্রিটিশ সরকারের জন্য লাভজনক বলে মন্তব্য করেছিল। Sutherland তাঁর চিঠিতে লিখেন –

> I think that there would be advantage in my seeing him; he (Abu Sayeed Chowdhury) represents the more moderate, pro-British element in Bangladesh which we wish to encourage. He is most anxious to re-establish economic and commercial links in advance of recognition. We can count on him as an eloquent advocate of the Brithish Connection; he is keen for Bangladesh to remain within the Commonwealth.''[36]

সরকারের অপ্রত্যক্ষ সাহায্যের পাশাপাশি প্রত্যক্ষ সাহায্য পেয়েছিল ব্রিটিনের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলো থেকে, বিশেষত লেবার পার্টির সহযোগিতা মিশন বরাবরই পেয়েছিল। মিশন স্থাপনের ১৮ দিনের মধ্যে লেবার পার্টির সদস্য জন স্টোন হাউসের সহযোগিতায় মিশন ৩টি টেলিফোন সংযোগ পায়।[৩৭] তাছাড়া লেবার পার্টির সদস্য জন স্টোনহাউসের ব্যক্তি উদ্যোগে হাউস অব কমন্সে বাঙালি বিমান মল্লিকের ডিজাইন করা বাংলাদেশের প্রথম ডাকটিকিটের প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়।[৩৮] স্টোন হাউস ১৯৬৯-৭০ সালে উইলসন মন্ত্রীসভার টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী ছিলেন এবং ১৯৭১ সালে হাউস অব কমন্সের সদস্য ছিলেন। তাই ডাক টিকিট প্রদর্শনীর সময়ে বাংলাদেশ মিশন ও মিশনের টেলি যোগাযোগের বিষয়ে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা সহজেই পেয়েছিল।

কিছু কিছু ক্ষেত্রে বাংলাদেশ মিশন থেকে প্রাপ্ত অভিযোগের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট বিভাগকে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে ব্রিটিশ প্রশাসন নির্দেশ দিত। এরকম একটি ঘটনা ছিল, ২৫শে ডিসেম্বর ১৯৭১। ঐদিন কিছু দুষ্কৃতিকারী 'বাংলাদেশ অ্যাকশন কমিটি'র অফিসের সামনে ৩টি বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে পালিয়ে যায়।

---

[৩৪] আবু সাঈদ চৌধুরী, পৃ. ১০১।

[৩৫] আবদুল মতিন, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে প্রবাসী বাঙালির ভূমিকা, সালাউদ্দিন আহমদ ও অন্যান্য (সম্পা.), *বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাস (১৯৪৭-৭১)* (ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ২০১০), পৃ. ২৩।

[36] FCO 37/977, From Sutherland to Mr Wilford and Mr Tomilson, 29 December, 1971.

[৩৭] আবু সাঈদ চৌধুরী, পৃ. ১৫৫।

[৩৮] FCO 37/929, Bangladesh Postage Stamps, From N.J. Barrington to Sutherland, 26 July, 1971.

যদিও কোন ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। তারপরও আবু সাঈদ চৌধুরী দক্ষিণ এশিয়া বিভাগের প্রধানকে এ ঘটনা অবহিত করে মিশনের সামনে পুলিশি নজরদারি বাড়ানোর অনুরোধ জানান। রেজাউল করিম (বাংলাদেশ মিশন) এ ব্যাপারে লিখিত চিঠি দেন। দক্ষিণ এশিয়া বিভাগ (SAD) এ চিঠি মেট্রো পুলিশ এর নিকট হস্তান্তর করে। এ চিঠির বরাতে জানা যায় মেট্রো পুলিশ খুবই সহযোগিতাপূর্ণ মনোভাব নিয়ে তাদের সাহায্য করেছিল। চিঠিতে করিম উল্লেখ করেন – "It would not have been necessary to write with a request of this nature as the metropoliton police have been very co-operative."[৩৯] মিশনের এই চিঠি প্রমাণ করে প্রশাসনিক সহায়তা তারা পেতেন। এ ধরনের সাহায্য ব্রিটিশ সরকারের ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির চিত্রই তুলে ধরে। সুতরাং উপরোক্ত আলোচনার মাধ্যমে ধারণা করা অসঙ্গত নয় যে সতর্কতার মাঝেও ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক বেশ কিছু পরোক্ষ সাহায্য পেয়েছিল মিশন।

ব্রিটিশ সরকারকে সমালোচনার মুখেও পড়তে হয় এ রকমের সহযোগিতাপূর্ণ মনোভাব প্রদর্শনের জন্য। পাকিস্তানের আঞ্চলিক অখণ্ডতার বিরুদ্ধে ব্রিটেনকে ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে বলে অভিযোগ করে পাকিস্তান। Pakistan Aid Consortium-এ পাকিস্তানের জন্য নতুন বরাদ্দ বাতিল হলে এই সমালোচনা আরো বৃদ্ধি পায়। ব্রিটেনের উৎসাহে অন্যান্য রাষ্ট্রও (কানাডা, জার্মানি) Aid Consortium-এ একই মনোভাবের পরিচয় দিয়েছে বলে অভিযোগ করা হয়।[৪০] পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ভারতের প্রতি ব্রিটেনের পক্ষপাতমূলক আচরণের কথা বলেছেন।[৪১] তাছাড়া পূর্বে উল্লেখিত হাউস অব কমন্সে বাংলাদেশের ডাকটিকিট প্রদর্শনীর বিষয়ে পাকিস্তানের হাইকমিশনার ব্রিটিশ পররাষ্ট্র দপ্তরে অভিযোগ করেন। পররাষ্ট্র দপ্তর এ ব্যাপারে ব্যাখ্যা দিলেও পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষ তাতে সন্তুষ্ট হয়নি।[৪২] তাদের সমালোচনার মূল কথা ছিল ভারত ব্যতীত ব্রিটেনেই একমাত্র দেশ যেখান থেকে মুক্তিসংগ্রামের কাজ অপ্রতিহতভাবে চলছিল।

উপসংহার

১৯৭১-এর আগস্ট থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত মিশনের মূল কাজ ছিল প্রচারণার মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষে ইউরোপীয় জনমতকে প্রভাবিত করা, নতুন দেশকে স্বীকৃতি প্রদান, পাকিস্তানের জন্য অস্ত্র ও অর্থনৈতিক সহায়তা বন্ধ করা। ডিসেম্বরে বাংলাদেশের বিজয় সুনিশ্চিত হলে ইউরোপ ও বিশ্বের অন্যান্য দেশের স্বীকৃতি লাভ ও যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠনে সাহায্য-সহযোগিতা লাভ মিশনের মুখ্য উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়ায়। মিশন প্রধান আবু সাঈদ চৌধুরী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, বিচারপতি ও মানবাধিকার কমিশনের সাথে যুক্ত থাকার কারণে ইউরোপের বিভিন্ন সরকারি, বেসরকারি ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ করা সহজ হয়েছিল। নিঃসন্দেহে তার এই ব্যক্তি পরিচিতি মিশনের জন্য সুফল বয়ে এনেছিল এবং তিনি ব্যক্তি পরিচিতির সমস্ত প্রভাব নিয়োগ করেছিলেন মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে। প্রচার-প্রচারণার কেন্দ্রস্থল হিসেবে লন্ডনকে বিবেচনা করাও ছিল দূরদর্শিতার পরিচায়ক। লন্ডন শহরের

---

[৩৯] FCO 37/977, Letter from Mission of the people's Republic of Bangladesh to Sutherland, 29 December, 1971.

[৪০] *দৈনিক আজাদী*, ১ লা সেপ্টেম্বর, ১৯৭১, ১১শ বর্ষ, ১৪৭ সংখ্যা, পৃ. ১।

[৪১] *The Observer,* August 2, 1971, No 139, P-2.

[৪২] FCO 37/923, Anglo-Pakistan Relation, Telegram from FCO to Islamabad, No. 1346, 27 July, 1971.

আন্তর্জাতিক চরিত্র ও লন্ডন থেকে ইউরোপের অন্যান্য দেশ ও আমেরিকার সাথে সহজ যোগাযোগ ব্যবস্থা মিশনের কার্যাবলি বিস্তৃত করতে সহায়ক হয়েছিল। সদ্য জন্ম নেওয়া একটি দেশের মিশনকে ব্রিটেনের মতো একটি দেশের সুদৃষ্টিতে আনার পেছনে মিশন এবং মিশনের সাথে সংশ্লিষ্টদের ভূমিকা ছিল অনন্য, যার অনিবার্য ফল ছিল স্বাধীনতা প্রাপ্তির দুই মাসের মধ্যেই এই নতুন দেশকে ব্রিটেনের স্বীকৃতি এবং দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক উন্নয়ন। পুরনো এই উপনিবেশ শক্তির সঙ্গে নতুন দেশের সম্পর্ক স্থাপন যে লাভজনক হবে মিশনের এই মনোভাব সচেতনভাবে জাগ্রত ছিল। বাস্তাবানুগ কার্যাবলি গ্রহণের মাধ্যমে মিশন পরিণত হয়েছিল মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম কূটনৈতিক ফ্রন্টে – যে ফ্রন্টে অস্ত্রের লড়াই না থাকলেও ছিল বাক ও বুদ্ধিমত্তার লড়াই। একটি অনিশ্চিত ভবিষ্যতকে সামনে রেখে লন্ডনের বাংলাদেশ মিশন যে ভূমিকা রেখেছিল তা অবশ্যই মুক্তিযুদ্ধকে আন্তর্জাতিক পরিসরে উপস্থাপনে সহায়ক হয়েছিল।

ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ জার্নাল
সংখ্যা ২৩ (১৪২২ বঙ্গাব্দ)

আবুল মনসুর আহমদের সামাজিক দায়বোধ ও সাহিত্যচিন্তা

আ. ন. ম. ফজলুল হক*

Abstract: Abul Mansur Ahmad is well-known to the Bengali society as a journalist, a political activist, and a literary person. The Bengali society and politics of the 20th century are the main elements of his writings. Especially he tried most to uphold the life and social problems of the middle class. His literary outlook is basically the manifestation of his social philosophy. He developed himself through family tradition and exposed his ideas and findings through literature, journalism and politics. He was a social representative of a particular society in a particular time. In this article the researcher wanted to present the social responsibility and literary thoughts of Abul Mansur Ahmad as reflected his writings.

ভূমিকা

সাংবাদিক, রাজনৈতিক কর্মী এবং সাহিত্যিক হিসেবে আবুল মনসুর আহমদ বাঙালি সমাজে সুপরিচিত। প্রায় ৬০ বছর তিনি রাজনীতি ও সমাজ-ভাবনাকে ধারণ এবং লালন করেছেন। বিশ শতকের বাঙালি সমাজ ও রাজনীতি তাঁর সাহিত্যচিন্তার প্রধান উপাদান। বিশেষত, মধ্যবিত্ত শ্রেণির জীবনবোধ ও সামাজিক সংকটকে তুলে ধরতে চেষ্টা করেছেন মনসুর। তাঁর সাহিত্যচিন্তা মূলত নিজস্ব সমাজদর্শনেরই প্রতিফলন। পারিবারিক ঐতিহ্য এবং উপলব্ধির নিবিড়তায় তিনি নিজেকে তৈরি করেছেন। প্রকাশ করেছেন সাহিত্যের নানান মাধ্যমে, সাংবাদিকতায় এবং রাজনীতির ময়দানে। ব্যঙ্গ-রচনায় তাঁর সাফল্য বেশি। সমাজের বিচিত্র অসঙ্গতি এবং দুর্নীতিকে রস-প্রয়োগে তিনি পাঠকের কাছে গ্রহণযোগ্য ও আকর্ষণীয় করে তুলেছেন। দায়িত্ববোধ, ক্ষমতা, মানবাধিকার আবুল মনসুর আহমদের চেনতাকে আলোড়িত করেছে। একটি বিশেষ সময়ে বিশেষ সমাজের প্রতিনিধি তিনি। তাঁর বক্তব্য, রচনা ও সাধনা যেন সমকালের খণ্ড খণ্ড ইতিহাস। আর সর্বোপরি, প্রকাশের ভার, সৃজনশীলতা ও মননশীলতার বিচারে তিনি সমকালীন ও উত্তরকালীন। সাংবাদিকতা, রাজনীতি ও সাহিত্যচর্চায় আবুল মনসুর আহমদ সাধারণভাবে চলমান সমাজের সংকট এবং বিশেষভাবে মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিকাশ ধারাকে পর্যবেক্ষকের দায়বোধ থেকে তুলে ধরার রচেষ্টা করেছেন। বর্তমান প্রবন্ধে তাঁর সেই দায়বোধের স্বরূপ উদঘাটনের দিকে নজর দেওয়া হয়েছে।

১.১ ব্যক্তিত্ব ও মনন

রাজনীতি, সাংবাদিকতা এবং সাহিত্যের প্রতি অপার নিষ্ঠা আর সমাজ-গঠন ও মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার চলমান সংগ্রামে নিবেদিত-প্রাণ এক সাধক আবুল মনসুর আহমদ (জন্ম : ৩ সেপ্টেম্বর ১৮৯৮

* সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর।

ধানিখোলা, ময়মনসিংহ; মৃত্যু : ১৮ মার্চ ১৯৭৯ ঢাকা)। কখনো রাজনীতির মঞ্চে ও সরকারের মন্ত্রীসভায়, কখনো সংবাদপত্র সম্পাদনায় বা কলামে, কখনো সাহিত্যে, কখনোবা আইনজীবী হিশেবে নিজের নামের মহিমা প্রচার ও প্রতিষ্ঠার পথ তৈরি করেছেন এই মনীষী। ১৯৩০-৩৮ সময়কালে ময়মনসিংহ জজকোর্ট ও কলকাতার আলীপুর জজকোর্টে আইনপেশায় নিয়োজিত থাকার সময়টুকু বাদ দিলে ১৯২০ থেকে প্রায় আমৃত্যু ৬ দশককাল তিনি চিন্তা-মনন ও কর্মে গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা রেখেছেন।

তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের পদার্থবিজ্ঞান ও গণিত বিশারদ এবং সাহিত্যিক আলেক্সন্দর সল্‌জনিৎসিন, যিনি নৈতিকশক্তি আর প্রাতিস্বিক ঐতিহ্যকে ধারণ করে বন্দিশিবির থেকেও শিল্পের গোলাপ ফুটিয়েছেন, ১৯৭০ সালে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার গ্রহণকালে বক্তৃতায় বলেছিলেন –

> আদিম মানুষের মতো কেউ একজন, এক অদ্ভুত সামুদ্রিক প্রাণীকে – সে এক অদ্ভুত হয়তো বালির মধ্যে লুকিয়ে ছিল, অথবা এমন কিছু যা হঠাৎ করেই আকাশ থেকে পড়েছে– বেশ অদম্য আর বক্র, আবার বোধহীনের মতো চকচকে, ভেতর থেকে উজ্জ্বল প্রভা বেরিয়ে আসছে, একেক সময় একেক রূপ নিচ্ছে, মনে হচ্ছে, যেন একে যে-কোনো রূপেই ব্যবহার করা যাবে, হাতের মুঠোয় নিয়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে ওঠে ... সে রকমই শিল্পকে আমরা আমাদের হাতের মুষ্টিতে ধরে রেখেছি, আত্মপ্রত্যয়ীর মতো মনে করি – এ আমাদের নিজস্ব সম্পদ, এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ন্ত্রণ করি, একে নতুনত্ব দিই, পুনর্নির্মাণ করি, এর ফতোয়া দিই, টাকার জন্য বিক্রি করি, একে নিয়ে প্রভাবশালীদের সঙ্গে বাকবিতণ্ডা করি এবং বিনোদনের সামগ্রীতে পরিণত করি বিভিন্ন সঙ্গীতের আসরে আর রাতের ক্লাবগুলোতে এবং এক সময় এটি গতিনিরোধক কিংবা লাঠিতে পরিণত হয়, দিক-পরিবর্তনের রাজনীতির অথবা ক্ষীণ সামাজিক প্রয়োজনে।'[১]

আবুল মনসুর আহমদের রাজনীতিলগ্নতা এবং সাংবাদিক ও সাহিত্যিক দায়বোধের বিবেচনায় এই কথাগুলো বিশেষভাবে স্মরণ করার প্রয়োজন পড়ে। মধ্যবিত্ত কৃষক-পরিবারের সন্তান আবুল মনসুর আহমদকে জীবনের পথ পারি দিতে হয়েছে নানান প্রতিকূলতার ভেতর দিয়ে। তাঁর কর্ম-পরিসরের পুরোটি ভুবন জুড়ে সমানতালে চলেছে রাজনীতি-সাধনা ও সাহিত্যচর্চা। তিনি তাঁর প্রতিবেশকে ধারণ করেছেন প্রজ্ঞা আর আশাবাদের প্রবল তাড়নায়। সমাজচিন্তক মনসুর ছিলেন সোসিও-পলিটিক্যাল রাইটার। সাধারণ মানুষের বোধের ভুবনে আলোড়ন তুলতে চেয়েছিলেন এই দার্শনিক। কখনো কখনো তিনি আবেগতাড়িত হয়েছেন, হয়েছেন নিজের ধর্ম ও জাতির প্রতি পক্ষপাতী। কিন্তু সর্বোপরি তাঁর লক্ষ্য ছিল শান্তি, উদার-নৈতিকতা ও মানবতাবাদ। সাধনার সমস্ত প্রহর জুড়ে তিনি নির্ভর করেছেন আত্ম-অনুভব ও আত্ম-বিশ্বাসের ওপর। সে কারণেই, সত্য-সুন্দর আর কল্যাণের পথে প্রসারিত তাঁর রাজনৈতিক মনীষা এবং সাহিত্যিক অভিলক্ষ্য। ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে অর্জনের দিক থেকে অবশ্যই কীর্তিমান মানুষ আবুল মনসুর আহমদ। তিনি সময়ের এক নিরন্তর যাত্রী। পথ পেরোনোর সময় এত মুখ এত ছবি দেখেছেন তিনি – তার সবগুলো সামাজিক-রাজনৈতিক অভিজ্ঞানকে আশ্রয় করে হয়ে উঠেছে তাঁর সাহিত্যের উপাদান। কোনো আত্মপ্রচার বা কীর্তিগাথা নয়, মনসুর এঁকেছেন স্রেফ জীবনের ছবি। জীবনের ছবি আঁকতে গিয়ে তিনি পরিচিত ভুবন থেকে আর জীবন-জিজ্ঞাসা থেকে সংগ্রহ করেছেন সারি সারি খণ্ডচিত্র। চিত্রগুলো হয়তো ক্ষুদ্র, আঁচড়গুলো মিহি, কিন্তু সবকিছু মিলিয়ে তৈরি হয়েছে এক অপূর্ব কাহিনি-ছবি। আবুল মনসুর আহমদের কাছে শেষপর্যন্ত অনুভবঘন-জীবনযাপনই জীবনের বৃহত্তর মহত্তর কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আবুল মনসুর 'ধর্মীয় কড়াকড়ি'র পারিবারিক ঐতিহ্যের মধ্য দিয়ে শৈশব-কৈশোর পার করেছেন। 'ফরাজি' পরিবারের ছেলে আহমদ আলী ফরাজি পরবর্তীকালে আবুল মনসুর আহমদ হিশেবে পরিচিতি লাভ করেছেন। তাঁর চাচা মুনশী ছমিরুদ্দিন ফরাজির মক্তবে শিক্ষায় হাতেখড়ি। বাড়ির বৈঠকখানায় বসত এই ফ্রি মাদ্রাসা। কায়দা-আমসেপারা-কোরআন এবং বর্ণ ও বানান শিক্ষা ছিল তাঁর প্রাথমিক

---

[১] হায়াৎ মামুদ, সম্পা., *নোবেল-ভাষণ : বাক্ থেকে পামুক* (ঢাকা: ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ, ২০০৮), পৃ. ৫৩।

পাঠের তালিকায়। ১৫ বছর বয়সে ৬ষ্ঠ শ্রেণিতে পড়ার সময়ে দরিরামপুর মাইনর স্কুলের শিক্ষক কৈলাস বাবুর প্রেরণায় সাহিত্যচর্চা শুরু করেন আবুল মনসুর আহমদ। ১৯২০ সালে ঢাকা কলেজে দর্শনশাস্ত্রে অনার্স পড়ার সময়ে জড়িয়ে পড়েন সক্রিয় রাজনীতিতে। তৎকালীন খেলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন তিনি। ওই বছরেই যোগ দেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের স্বরাজ পার্টিতে। পরবর্তীকালে ১৯২৯ সালে কলকাতা রিপন কলেজ থেকে অর্জন করেন এলএলবি ডিগ্রি।

২.১ সাংবাদিকতায় দায়বোধ

১৯২৩ সালে মওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদীর সাপ্তাহিক 'ছোলতান' পত্রিকায় সহ-সম্পাদক হিশেবে মনসুরের সাংবাদিক-জীবনের আরম্ভ। তিনি বাঙালি মুসলমান সমাজে সাংবাদিকতার অন্যতম পথিকৃৎ। সমকালে কাজী নজরুল ইসলাম অবশ্য সাংবাদিকতা ও সাহিত্যে প্রবল প্রভাবের সাথে বিচরণ করেছেন। আবুল মনসুরের খানিকটা বিশেষত্ব হলো সমকালে শিক্ষিত বাঙালি মুসলমান তরুণসমাজকে সাংবাদিকতা পেশায় প্রবেশে অনুপ্রেরণা প্রদান। অবশ্য তিনি মনে-প্রাণে সাহিত্যিকই হতে চেয়েছিলেন। কিন্তু মওলানা আকরম খাঁ-র সাপ্তাহিক 'মোহাম্মদী', মৌলবী মজিবর রহমানের 'দি মুসলমান', 'দৈনিক কৃষক', এ কে ফজলুল হকের 'নবযুগ', শহীদ সোহরাওয়ার্দীর 'দৈনিক ইত্তেহাদ' প্রভৃতি পত্রিকায় নিরলসভাবে দায়িত্ব পালন এবং অসীম নিষ্ঠার পরিচয়ের কারণে সাংবাদিক ও সম্পাদক আবুল মনসুর আহমদ প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলেন। তৎকালীন সময়ে সংবাদপত্র ছিল রাজনীতির প্রচারমাধ্যম বা মুখপত্র। সাংবাদিকতার মধ্য দিয়ে সমাজ-রূপান্তরের কারিগরেরা ব্রিটিশ শাসিত ভারতে বাঙালির চিন্তা ও স্বাধীনতার চেতনাকে নানানভাবে প্রচার করেছেন। রাজনৈতিক কর্মসূচি, দাবি ও ভাষা, অভিলক্ষ্য ও আদর্শ প্রচারে যে অনন্য ভূমিকা রেখেছিল সংবাদপত্রসমূহ তাঁর পেছনে নজরুল-মনসুরদের অবদান অসামান্য। তখন যেন সাংবাদিকতা ও রাজনীতি ছিল একই সুতোয় বা শেকলে বাঁধা! আবুল মনসুর আহমদ ছিলেন পেশাদার সাংবাদিক। স্বরাজ-প্রতিষ্ঠা এবং হিন্দু-মুসলিম বন্ধুত্ব স্থাপনে তাঁর চিন্তা ছিল অগ্রগামী।

২.২ রাজনৈতিক দায়বোধ

১৯২০ সালে রাজনীতির পাঠ গ্রহণ করা তরুণ আবুল মনসুর আহমদ পরবর্তীকালে বর্ণাঢ্য রাজনৈতিক জীবন পার করেছেন। ১৯৩০ সালে 'নিখিল বঙ্গ প্রজা সমিতি'র ময়মনসিংহের সেক্রেটারি নিযুক্ত হন। ১৯৪৪ সাল থেকে পাকিস্তান-আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। তিনি ছিলেন কৃষক-প্রজা পার্টির অন্যতম কর্ণধার, মুসলিম লীগের প্রচার সম্পাদক এবং আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতা-নেতা। ১৯৪৬-এ মুসলিম লীগের প্রার্থী হিশেবে গণপরিষদ সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৫৩-১৯৫৮ পর্যন্ত আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছেন। যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনের ২১ দফার অন্যতম প্রণেতাও তিনি। ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্টের পক্ষ থেকে নির্বাচিত হয়ে প্রাদেশিক স্বাস্থ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৫৬ সালে আতাউর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামী কোয়ালিশন মন্ত্রিসভায় শিক্ষামন্ত্রী এবং ১৯৫৬-৫৭ সময়কালে পাকিস্তান কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা – সোহরাওয়ার্দীর মন্ত্রিসভার শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব লাভ করেন। রাজনীতি-সমাজ-সংস্কৃতি প্রভৃতি ক্ষেত্রে আবুল মনসুর আহমদের অবদান কালের পরিক্রমায় অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। চিন্তা ও বক্তব্য প্রকাশে তিনি ছিলেন অকুণ্ঠ-সাহসী। 'আবহমানকালের ধর্মনিরপেক্ষ বাঙালি সংস্কৃতির বদলে পূর্ব বাংলায় ধর্মভিত্তিক স্বতন্ত্র সংস্কৃতি সৃষ্টির প্রস্তাব উত্থাপন' করেন তিনি।[২] '১৯৬৭ সালে রবীন্দ্র সঙ্গীত পাকিস্তানের আদর্শের পরিপন্থী এই বক্তব্য উপস্থাপন করে পাকিস্তান সরকার রেডিও টেলিভিশন থেকে প্রচার না করার সিদ্ধান্ত নিলে তিনি সমর্থন জ্ঞাপন

---

[২] সেলিনা হোসেন ও নূরুল ইসলাম, সম্পা., *চরিতাভিধান* (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৯৭), পৃ. ৫৯।

করেন।'[৩] তৎকালীন সময়ে পরিচিত আওয়াজ 'পাক-বাংলার কালচার' প্রতিষ্ঠার পক্ষে তিনি ছিলেন নিবেদিত-প্রাণ কর্মী। অবশ্য রাজনৈতিক সংস্কার, গণতন্ত্রের বিকাশ ও চর্চায় চিন্তার প্রাগ্রসরতা, জাতীয়তাবাদের চেতনা প্রচারে তাঁর ভাবনা-পরিসর বেশ উজ্জ্বল। সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা এবং পূর্ববাংলার (তথা পূর্ব-পাকিস্তানের) স্বার্থরক্ষার ব্যাপারে তিনি ছিলেন আপসহীন নেতা। ভারতের স্বাধীনতা-অর্জনের পথে রাজনৈতিক বিচিত্র উত্থান-পতনের দিকে তাঁর সতর্ক দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল সবসময়ে। এবং ১৯৪০ সালে মুসলমানদের জন্য আলাদা রাষ্ট্রভূমির আন্দোলন – পাকিস্তান আন্দোলনকে তিনি জোরালোভাবে সমর্থন করেছেন।[৪] সমকালীন রাজনীতি-বিষয়ে তাঁর ধারণা ও দূরদর্শিতা সত্যিই বিস্ময়কর।

রাজনীতিবিদ আবুল মনসুর আহমদের আত্মজৈবনিক রচনা *আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর* (প্রথম প্রকাশ ১৯৬৮) আমাদের রাজনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাসের এক বিরাট দলিল। সাহিত্য, সাংবাদিকতা, আইন-ব্যবসা প্রভৃতি বিচিত্র পেশার নানান অভিজ্ঞতার সমন্বয় ঘটেছে এখানে। বাস্তব-অভিজ্ঞতার আলোয় তিনি সাজিয়েছেন রাজনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাস। বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে এটি একটি অবশ্যপাঠ্য গ্রন্থ। ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে প্রজা-আন্দোলন, খিলাফত ও অসহযোগ-আন্দোলনসহ নানাবিধ আন্দোলন-সংগ্রাম, সাম্প্রদায়িকচেতনা, অবিভক্ত ভারত ও পাকিস্তানে বিভিন্ন রাজনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠন ও সংস্থার ক্রম-জনপ্রিয়তা, সভা-সমিতি, নিখিল ভারতের নির্বাচন, পাকিস্তান-আন্দোলন, দেশভাগ, ভাষা-আন্দোলন, পাকিস্তানের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, শিক্ষা-সংকট, বাণিজ্য-বিস্তার, পূর্ব-পাকিস্তানের জনগণের প্রতি পাকিস্তান সরকারের অবিচার, স্বাধিকার চেতনা, স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয়, বাংলাদেশের প্রথম জাতীয় নির্বাচন, শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনৈতিক দূরদর্শিতা এবং ভ্রান্তি, পার্লামেন্টারি ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা, স্বাধীন বাংলাদেশের সংবিধান-প্রসঙ্গ স্থান পেয়েছে এই গ্রন্থে। গ্রন্থটি সাধু ভাষারীতিতে রচিত। এই সুবৃহৎ বইটির 'দুসরা অধ্যায়'-এর 'ধর্ম-চেতনা বনাম রাজনীতি-চেতনা'-অংশ থেকে খানিকটা পাঠ গ্রহণ করছি –

> শিক্ষকদের প্রভাব ছাত্রদের উপর অবশ্যই পড়িয়া থাকে। এক আরবী-ফারসী শিক্ষক ছাড়া আমাদের স্কুলের পঁয়ত্রিশ জন শিক্ষকের সবাই হিন্দু। এঁরা প্রকাশ্য রাজনীতি না করিলেও কথা-বার্তায় ও চালে-চলনে স্বদেশী ছিলেন। এঁদের দুই-তিন জনকে আমি খুবই ভক্তি করিতাম। এঁদের প্রভাব আমার মনের উপর ছিল অসামান্য। হঠাৎ একদিন একদল পুলিশ স্কুলে আসিয়া কয়েকজন ছাত্রকে গ্রেফতার করিয়া নিল। এদের মধ্যে দুই-চার জন আমার সুপরিচিত। তাদের জন্য খুবই চিন্তিত ও দুঃখিত হইলাম। গ্রেফতারের কারণ খুঁজিলাম। 'রাজবন্দী', 'অন্তরীণ' ইত্যাদি শব্দ এই প্রথম শুনিলাম। কানে রাজনীতির বাতাস গেল। কিছু-কিছু আন্দায করিতে পারিলাম। ইংরেজের প্রতি বিদ্বেষ বাড়িল। যুদ্ধে জার্মানির জয় কামনা করিলাম।[৫]

২.৩ সাহিত্যিক দায়বোধ

গত শতকের বিশ ও ত্রিশের দশকে তরুণ বাঙালি মুসলমান সাহিত্যিকদের মধ্যে যে প্রগতিশীল আন্দোলন গড়ে ওঠে তার সঙ্গেই আবুল মনসুর আহমদের মন-মানসিকতার সাযুজ্য ছিল অধিক। সাহিত্য-সাধনায় তিনি ছিলেন প্রবলভাবে সমাজলগ্ন। ব্যঙ্গরচনা তাঁর প্রধান অবলম্বন। সমাজের মুখোশধারী মানুষের স্বরূপ প্রকাশে তিনি আন্তরিক শিল্পী। মূলত কথাশিল্পী তিনি – গল্প আর উপন্যাস

---

[৩] আশরাফুল হক রাজিব ও অন্যান্য, সম্পা., *হাজার বছরের সেরা বাঙালি* (ঢাকা: অনন্যা, ২০০০), পৃ. ১৪৭-১৪৮।

[৪] *বাংলাপিডিয়া* (২০০৩), "আবুল মনসুর আহমদ" ভুক্তি।

[৫] আবুল মনসুর আহমদ, *আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর* (ঢাকা: খোশরোজ কিতাব মহল, ২০০২), পৃ. ২০-২১।

তাঁর বিচরণের ক্ষেত্র। এছাড়া প্রবন্ধ, শিশু-কিশোরতোষ রচনা এবং আত্মজীবনী লিখেও খ্যাতি অর্জন করেছেন। সাহিত্যচর্চার জন্য ১৯৬০ সালে পেয়েছেন বাংলা একাডেমি পুরস্কার। ১৯৭৯ সালে পেয়েছেন সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় পুরস্কার স্বাধীনতা পদক। সমাজের ভেতরে দৃষ্টি প্রসারিত করে তিনি বাস্তবকে তুলে ধরতে চেষ্টা করেছেন।

আবুল মনসুর আহমদ লেখালেখি শুরু করেছেন বিশ শতকের বিশের দশকে। তখন সাহিত্য-শিল্পের প্রবল পরিবর্তনের সময়। কল্লোল যুগের লেখকেরা সক্রিয়, ছিল মুসলিম সাহিত্য সমাজের মুখপত্র 'শিখা' (১৯২৬)। সাংবাদিকতা, রাজনীতি আর লেখালেখি চলেছে সমানতালে। তবে, ষাটের দশকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে সত্তরের দশকের প্রায় শেষ অবধি সক্রিয় রাজনীতি থেকে স্বেচ্ছায় অবসর নিয়ে আমৃত্যু লেখালেখিতে ব্যাপৃত ছিলেন। সমকালীন বাঙালি মুসলমান সমাজের দুঃখ-দুর্দশা, অশিক্ষা-কুশিক্ষা, অনাচার-কুসংস্কার প্রভৃতি তাঁকে বিশেষভাবে আলোড়িত করেছে। কেবল ধর্মচিন্তায় নয় – প্রায় সমগ্রজীবন এবং সমস্ত ভাবনা জুড়েই বর্তমান ছিল তাঁর স্বাজাত্য-প্রীতি। তিনি সমাজকে দেখেছেন ব্যক্তির অভিমত, চিন্তা আর নানান প্রবণতার ভেতর দিয়ে। তাঁর প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ *আয়না* (প্রথম প্রকাশ ১৯৩৫) গল্পগ্রন্থের প্রথম গল্প 'হুজুর কেবলা'র আরম্ভটি এ রকম –

> এমদাদ তার সবগুলি বিলাতি ফিনফিনে ধুতি, সিল্কের জামা পোড়াইয়া ফেলিল; ফ্লেক্সের ব্রাউন রঙের পাম্পশুগুলি বাবুর্চিখানার বঁটি দিয়া কোপাইয়া ইলশা-কাটা করিল। চশমা ও রিস্টওয়াচ মাটিতে আছড়াইয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিল; ক্ষুর স্ট্রপ, শেভিংস্টিক ও ব্রাশ অনেকখানি রাস্তা হাঁটিয়া নদীতে ফেলিয়া দিয়া আসিল; বিলাসিতার মস্তকে কঠোর পদাঘাত করিয়া পাথর বসানো সোনার আংটিটা এক অন্ধ ভিক্ষুককে দান করিয়া এবং টুথক্রীম ও টুথব্রাশ পায়খানার টবের মধ্যে ফেলিয়া দিয়া দাঁত ঘষিতে লাগিল।[৬]

এর পরের ২টি বাক্যে লেখক জানাচ্ছেন – 'অর্থাৎ এমদাদ অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করিল! সে কলেজ ছাড়িয়া দিল।' প্রত্যেক লেখকই যে নিজের আত্মজীবনী লেখেন তাঁর সমস্ত লেখার ভেতর দিয়ে, আবুল মনসুর আহমদের এই গল্পটিও তারই নিদর্শন। গল্পের নায়ক এমদাদ। 'কলেজে এমদাদের দর্শনে অনার্স ছিল।' সত্যি কথাটি হলো – লেখক নিজেই ১৯২০ সালে ঢাকা কলেজে দর্শন বিষয়ে অনার্স পড়ার সময়ে অসহযোগ আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে সম্পৃক্ত হয়ে পড়েন। তিনি অনার্স ডিগ্রি সম্পন্ন করতে পারেননি – ডিগ্রি পাস কোর্সের সার্টিফিকেট অর্জন করেছিলেন ১৯২৩ সালে। কর্মময় রাজনৈতিক জীবন মনসুরকে রাজনৈতিক বিষয়ে ব্যঙ্গ-রচনায় উদ্বুদ্ধ করেছে প্রবলভাবে। দুর্নীতিগ্রস্ত সমাজ, রাজনৈতিক নেতাদের চিন্তার অস্বচ্ছতা, টিপিক্যাল বাঙালি প্রবণতা এবং তথাকথিত সমাজসেবকদের প্রকৃত রূপ তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। সমকালীন সামাজিক দুর্গতি মনসুরের সমাজ-সাহিত্য ভাবনার মূল বিচরণ-ভূমি। সমাজ-রূপান্তরের কারিগরদের কাজ সত্যের সন্ধান। নামাজ-ধর্ম-পীর প্রভৃতি বিষয়ে বিভিন্ন মনীষীর ভিন্ন ভিন্ন মত রয়েছে। আবুল মনসুর আহমদ আমাদের সমাজের ধর্মলগ্নতা বিষয়ে তাঁর নিজস্ব চিন্তা প্রকাশের চেষ্টা করেছেন। ধর্মীয় ফিলোসফি তাঁর রাজনৈতিক চেতনাকেও প্রভাবিত করেছে। তাঁর মুক্তবুদ্ধি, উদারচিন্তা ও সৎসাহস শিক্ষিত বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের অহঙ্কার ও আত্মতৃপ্তিকে কিছুটা হলেও নাড়িয়ে দিয়েছে। সামাজিক প্রতারণা আর কল্যাণবিমুখতা থেকে পাঠ নিয়ে তিনি মানবিক বোধে স্নাত হতে পেরেছেন। রাষ্ট্রের অধিকাংশ মানুষ যেখানে প্রশ্নহীন – জিজ্ঞাসাবিমুখ, সেখানে তিনি সমাজসেবাকে জীবনের ব্রত ও চূড়ান্ত ধ্যান-জ্ঞান হিশেবে গ্রহণ করেছেন। রাজনীতি ছিল তাঁর মঞ্চ আর সাহিত্য ছিল অস্ত্র। তিনি উনিশ ও বিশ শতকীয় সাহিত্য-প্রবণতাকে আত্মস্থ করেছিলেন। প্রসঙ্গত, 'উনিশ ও বিশ শতকের গোড়ার দিকে বাঙালি মুসলমানের নবজাগরণের ঊষালগ্নে সৃষ্টিমুখর সাহিত্য জাতীয় দিক-নির্দেশনা প্রদান ও আত্মপরিচয় প্রতিষ্ঠার প্রয়াসে অপরিসীম

---

[৬] আবুল মনসুর আহমদ, *আয়না* (ঢাকা: আহমদ পাবলিশিং হাউস, ২০০৭), পৃ. ১২২।

অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিল।[৭] *আয়না* গ্রন্থটির জন্য কাজী নজরুল ইসলাম 'আয়নার ফ্রেম' শিরোনামে ভূমিকা লিখে দিয়েছিলেন। প্রথম প্রকাশের ওই ভূমিকার শেষাংশ এখানে উদ্ধৃত করছি –

> আবুল মনসুরের ব্যঙ্গের একটা অসাধারণ বৈশিষ্ট্য এই যে, সে ব্যঙ্গ যখন হাসায় তখন হয় সে ব্যঙ্গ কিন্তু কামড়ায় যখন, তখন হয় সে সাপ; আর সে কামড় গিয়ে যার গায়ে বাজে তার মুখের ভাব হয় সাপের মুখের ব্যাঙের মত করুণ। কিন্তু সে হাসির পিছনে যে অশ্রু আছে, সে কামড়ের পিছনে যে দরদ আছে, তা যাঁরা ধরতে পারবেন, আবুল মনসুরের ব্যঙ্গের সত্যিকার রসোপলব্ধি করতে পারবেন তাঁরাই। বন্ধুবরের এই রসাঘাত কশাঘাতের মত তীব্র ও ঝাঁঝালো। কাজেই এ রসাঘাতের উদ্দেশ্য সফল হবে, এটা নিশ্চয়ই আশা করা যেতে পারে।[৮]

প্রসঙ্গত, ১৯২৬ থেকে ১৯২৯ সালের মধ্যে 'সওগাত' পত্রিকায় কাজ করার সময় *আয়না*-র গল্পগুলো প্রথম সে পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। যার মধ্যে ছিল হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের সাম্প্রদয়িকতা-বিষয়ক রচনা 'ধর্ম-রাজ্য', আর্যসন্ন্যাসীদের গো-হত্যা বন্ধের আন্দোলন-সংক্রান্ত 'গো দেওতাকা দেশ', ধর্মীয় ভণ্ডামি-বিষয়ক লেখা 'হুজুর কেবলা' রাজনৈতিক-সামাজিক চেতনা-সম্পৃক্ত গল্প 'বিদ্রোহী-সংঘ'। *আয়না* গ্রন্থাকারে প্রকাশের অল্পকালের মধ্যেই আবুল মনসুর আহমদ বাংলা সাহিত্যে একজন শক্তিশালী ব্যঙ্গ-রচয়িতার মর্যাদা লাভ করতে সমর্থ হন। পরবর্তী গল্পগ্রন্থ *ফুড কন্‌ফারেন্স* (প্রথম প্রকাশ ১৯৪৪)-এর রচনাগুলো ১৯৩১ থেকে ১৯৩৭ সময়কালে রচিত। তৎকালীন শেরে বাংলার মন্ত্রীসভার আমলকে এই গ্রন্থের গল্পগুলোর স্যাটায়ার স্পর্শ করেছিল বলে মনে করা হয়। বিশেষ করে নামগল্পসহ 'সায়েন্টিফিক বিযিনেস' ও 'জনসেবা ইউনিভার্সিটি' বেশ সাড়া জাগানো কাহিনি। দুঃশাসন, দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতির প্রতিবাদে প্রবলকণ্ঠ এইসব রচনা। 'ফুড কন্‌ফারেন্স' গল্পের কিছু অংশ তুলে ধরা যেতে পারে –

> দেশে হাহাকার পড়েছে; কারণ নাকি খোরাকির অভাব। সে হাহাকার অবশ্যি ভদ্রলোকেরা শুনতে পাননি; ভাগ্যিস অভুক্ত হতভাগ্যদের গলায় চিৎকার করে কাঁদবার শক্তি নেই। ... অভুক্ত কঙ্কালসার আধ-ল্যাংটা হাজার হাজার নর-নারী প্রাসাদশোভিত রাজধানীর রাস্তাঘাটে কাতার করছে। তাতে রাস্তায় সৌন্দর্য নষ্ট হচ্ছে। এইসব রাস্তায় আগে-আগে গাউন শাড়ি পরা পরীর ভিড় হতো। আর আজ কিনা সেখানে অসুন্দর অসভ্য কুৎসিত অর্ধোলঙ্গ স্ত্রীলোকেরা ভিড় করছে! কি অন্যায়! ... গ্র্যান্ডহোটেলে ফুড কমিটির বৈঠক। শেরে-বাংলা মহিষে-বাংলা সিংগীয়ে-বাংলা টাটুয়ে-বাংলা গাধায়ে-বাংলা কুত্তায়ে-বাংলা পাঁঠায়ে-বাংলা বিল্লিয়ে-বাংলা শিয়ালে-বাংলা প্রভৃতি নেতৃস্থানীয় সমস্ত বাঙালিই ফুড কমিটির সদস্য মনোনীত হয়েছেন। মন্ত্রীরা এক্স অফিসিও মেম্বার। তাঁরা অবশ্য কমিটির মেম্বর হিসেবে আর মাইনে পাবেন না; তবে মিটিং-এ হাজির হওয়ার জন্য ফিস্ পাবেন। সদস্যের মধ্যে শেরে-বাংলার ভাগ্‌নের সংখ্যাই বেশি। কিন্তু তাতে কারুর আপত্তি করার উপায় নেই; শেরে-বাংলার সঙ্গে চুক্তি হয়েছে সেই শর্তেই। আর খোদ শেরে-বাংলা বলেন, শেরে বাংলার ভাগ্‌নে হলে ব্রিলিয়েন্ট হতেই হবে, যথা, শিয়ালে-বাংলা।[৯]

প্রায়শই আমরা খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের কথা বলি। কিন্তু সেই ব্রিটিশ ভারত থেকে স্বাধীন বাংলাদেশ পর্যন্ত আজ অবধি বিদেশের পণ্যের ওপর আমাদের নির্ভরতা রয়েছে বহাল-তবিয়তে। এই নির্ভরতা, পণ্য-উৎপাদন, বাজার-অর্থনীতি – এসবের পিছনের কথা আবুল মনসুর তুলে ধরেছেন তাঁর 'গ্রো মোর ফুড' গল্পের ক্যানভাসে। তিনি লিখেছেন –

---

[৭] হোসেন হোসেন, *বাঙালি মুসলমানের আলোকবর্তিকা ও অন্যান্য প্রবন্ধ* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৫), পৃ.৪।

[৮] রফিকুল ইসলাম, সম্পা., *আবুল মনসুর আহমদ রচনাবলী* (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৯৮), পৃ. ৪৭১।

[৯] রফিকুল ইসলাম, সম্পা., *আবুল মনসুর আহমদ রচনাবলী, প্রথম খণ্ড* (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০০৫), পৃ. ৮৭-৯০।

> ভারতবর্ষ দেশটা ছিল বরবারই উর্বর। এ দেশের মাটিও ছিল আগে থেকেই খুব লায়েক। আমরা ইচ্ছা করলেই বে-এন্তেহা ফসল আবাদ করতে পারতাম। কিন্তু আমরা এতদিন ইচ্ছেই করিনি। ইচ্ছেটা আমাদের হলো না দুটো কারণে। প্রথমত বেশি ফসল আবাদ করার দরকার ছিল না; দ্বিতীয়ত বেশি রকম ফসল আবাদ করা আইনসঙ্গত ছিল না। দরকার ছিল না এই জন্য যে, এদেশে বেশি ফসল হলে বিদেশ থেকে আমদানি বন্ধ হয়ে যেতো। এটা ঠিক হতো না, কারণ ভারতবর্ষ ধলা আদমিদের মার্কেট– বাংলা ভাষায় যাকে বলা হয় বাজার। বাজারটা হচ্ছে গিয়ে বেচাকেনার জায়গা। বাজারে ফসল আবাদ হয় কে, কবে শুনেছেন! ভদ্দরলোকদের সুবিধের জন্য ধানক্ষেত ভেঙ্গে বাজার বসানো নতুনও নয়, অন্যায়ও নয়। অতএব ভারতবর্ষ স্বভাবতই এবং আইনানুসারেই ভাল মানুষদের বাজার হয়েই থাকলো – চাষা-ভুষোদের আবাদের ক্ষেত হতে পারলো না।[১০]

আবুল মনসুর জানতেন 'রেসপনসিবিলিটি উইদাউট রাইট' এবং 'রাইট উইদাউট পাওয়ার' অসম্ভব। অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য দায়িত্ব আর দায়িত্ব পালনের নিমিত্ত ক্ষমতা – এই দর্শনের ওপরেই যে আমাদের দেশের রাজনীতি দাঁড়িয়ে গেছে, সেই সত্য অনুধাবন করতে সমর্থ হয়েছিলেন তিনি। এদেশে স্থানীয় সরকার যে দুর্বল, মন্ত্রীরা যে ক্ষমতাহীন, আর 'প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন একটা ধোকাবাজি' তা অবলীলায় বলতেও পেরেছেন মনসুর। বাঙালি জাতীয়তাবাদ, বাঙালির ভাষা ও সংস্কৃতি-সম্বন্ধে তিনি সতর্ক সৈনিক। চিন্তায়, কাজে, বক্তৃতায় সরব ছিলেন বাংলা ভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠার দাবিতে। আর বাঙালির সাহিত্যের ভাষাও যে বাংলা হওয়াই উচিত, সে বিষয়ে তিনি ছিলেন সোচ্চার। ১৯৪০ সালে 'লাহোর প্রস্তাব' গ্রহণের পর কলকাতায় মুসলমানদের মধ্যে ভাষা-সচেতনতা সংগঠনের লক্ষ্যে সৃষ্টি হয় 'পূর্ব-পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটি'। এই সোসাইটির প্রথম সম্মেলনে, ১৯৪৪ সালের ৫ই মে কলকাতা ইসলামিয়া কলেজ মিলনায়তনে, সভাপতির ভাষণে আবুল মনসুর আহমদ যে তাৎপর্যপূর্ণ মতামত প্রকাশ করেন, তার খানিকটা পাঠকের জন্য তুলে ধরছি –

> বাঙলার মুসলমানদের যেমন একটা নিজস্ব সংস্কৃতি আছে, তেমনি তাদের একটা নিজস্ব সাহিত্যও আছে। সে সাহিত্যের নাম মুসলমানী বাঙলা সাহিত্য বা পুঁথি সাহিত্য। ... পূর্ব-পাকিস্তানের সাহিত্যিক রেনেসাঁ আসবে এই পুঁথি সাহিত্যের বুনিয়াদে। আমরা আবার পুঁথি সাহিত্যে ফিরে যাব – সে কথা বলছি না। আমার মতলব এই যে, বাঙালী মুসলমানের সাহিত্যের প্রাণ হবে মুসলমানের প্রাণ এবং সে সাহিত্যের ভাষাও হবে মুসলমানেরই মুখের ভাষা। ... আজকার তথাকথিত জাতীয় সাহিত্যে বাংলার মেজরিটি মুসলমানের জীবনই যে শুধু বাদ পড়েছে তা নয়, তার মুখের ভাষাও সে সাহিত্যে অপাংক্তেয় রয়েছে। মুসলমানের আল্লা-খোদা, রোযা-নামায, হজ্জ-যাকাত, ইবাদাৎ-বন্দেগি, অযু-গোসল, খানাপিনা সমস্তই বাংলা সাহিত্যের দিকপাল ও বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তাদের কাছে বিদেশী ভাষা। এ যুলুমবাজির মধ্যে কোনো জাতির সাহিত্য গড়ে উঠতে পারে না। সুতরাং পূর্ব-পাকিস্তানের সাহিত্য রচিত হবে পূর্ব-পাকিস্তানিদের মুখের ভাষায়।[১১]

রাজনৈতিক কারণে কলকাতা এবং ঢাকা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে – একথা ঠিক। তবে পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ব-পাকিস্তান তথা বাংলাদেশের বিভক্তি যে কেবল রাজনৈতিক নয়, এর পেছনে যে ভাষা ও সংস্কৃতিরও প্রভাব রয়েছে, তা বিশ্বাস করতেন আবুল মনসুর। সাহিত্য ও সংস্কৃতি-বিশারদ এই রাজনীতিবিদ মনে করেন –

> অবিভক্ত বাংলায় বাংলা সাহিত্যের সকল ক্ষেত্রে প্রাধান্য ছিল হিন্দুদের। তার মানে বাংলা সাহিত্য ছিল মূলত এবং প্রধানত হিন্দু কালচারের বাহক। সে সাহিত্য বাংলার মুসলিম কালচারের বাহক তো ছিলই না বরঞ্চ তার প্রতি বিরূপ ছিল। সুতরাং সে সাহিত্যে গোটা-কতক

---

[১০] রফিকুল ইসলাম, সম্পা., *আবুল মনসুর আহমদ রচনাবলী*, প্রথম খণ্ড, পৃ. ১৩৮-১৩৯।

[১১] মুহম্মদ মতিউর রহমান, *বাংলা সাহিত্যে মুসলিম ঐতিহ্য* (ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ২০০২), পৃ. ১০৪-১০৫।

> মুসলমানী শব্দ ঢুকাইয়া দিলেই তা মুসলিম কালচারের বাহক সাহিত্য হইয়া যাইত না। রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের ভাল-ভাল বইয়ের হিন্দু চরিত্রগুলির জায়গায় মুসলমান নাম বসাইয়া দিলেই ওগুলি মুসলিম চরিত্র হইয়া যাইবে না। তাতে মুসলিম সাহিত্যও হইবে না।... গোশতের বদলে 'মাংস', আন্ডার বদলে 'ডিম', জনাবের বদলে 'সুধী', আরযের বদলে 'নিবেদন', তসলিমবাদ-এর বদলে 'সবিনয়', দাওয়াতনামার বদলে 'নিমন্ত্রণপত্র', শাদি-মোবারকের বদলে 'শুভ বিবাহ' ব্যবহার করিলেই আমরা 'সভ্য' 'কৃষ্টিবান' ও 'সুধী' বিদগ্ধ হইলাম, নইলে হইলাম না, এমন ধারণা হীনম্মন্যতার পরিচায়ক। কৃষ্টিক চেতনা রেনেসাঁর জন্য এটা অশুভ ইঙ্গিত।[১২]

'ইউনিটি ইন ডাইভারসিটি' ধারণা লালনকারী সমাজ-সাধক আবুল মনসুর আহমদের চিন্তা ও চোখ প্রসারিত ছিল নানান দিকে ও বিচিত্র বাঁকে। গল্প-উপন্যাস ছাড়াও কবিতা এবং নাটক-নির্মাণের দিকে তাঁর বিশেষ ঝোঁক পাঠকের নজর কাড়ে। তিনি কবিতার কাঠামোয় পরিবেশন করেছেন *আসমানী পর্দা* (প্রথম প্রকাশ: ১৯৫৭)। পুঁথিসাহিত্যের ঢঙে লেখা এই রচনা ছিল সমকালীন রাজনৈতিক ও ধর্মীয় ভণ্ডামির মুখোশে প্রবল আঘাত। বাঙালি হিন্দু সমাজে ছোটদের জন্য সহজ-সরল ভাষায় রামায়ণ-মহাভারত রচিত হলেও মুসলমান সমাজের শিশু-কিশোরদের জন্য তেমন কোনো ধর্মীয় গ্রন্থ ছিল না, যা পড়ে ছোটদের ধর্মীয় অনুভূতি জাগ্রত হতে পারে। তখন তিনি লিখলেন কাসাসুল আম্বিয়া বা পয়গম্বদের কাহিনি – *মুসলমানী কথা* (প্রথম প্রকাশ: ১৯২৪), *নয়াপড়া* (প্রথম প্রকাশ: ১৯৩৪) এবং *ছোটদের কাসসুল আম্বিয়া* (প্রথম প্রকাশ: ১৯৫০)। নাটকের আদলে লেখা *গালিভারের সফর-নামা* (প্রথম প্রকাশ: ১৯৫৯) বাংলা সাহিত্যে এক বিশেষ সংযোজন। নির্মাণ-কাঠামো এবং উপস্থাপন-কৌশল, যাকে বর্তমান বিশ্বে সাহিত্যতত্ত্বের বিবেচনায় ফরমালিজম বলে বিবেচনা করা হয়– আবুল মনসুর আহমদের কৌশলী প্রয়োগে এই রচনাটি অনন্যতা লাভ করেছে। এই গ্রন্থের 'রাজনৈতিক বাল্যশিক্ষা' ও 'রাজনৈতিক ব্যাকরণ' বাঙালির চিন্তাজগতে নতুন-যোজনা হিশেবে পরিচিত হয়ে থাকবে। গ্রন্থটি উৎসর্গ করা হয়েছিল 'মিছরির ছুরিতে ব্রেইন অপারেশনের উস্তাদ জর্জ বার্নাড শ'-কে। গ্রন্থটির অন্য তিনটি বৈশিষ্ট্য হলো – গণতান্ত্রিক-স্বৈরতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার পার্থক্য-নির্দেশ, পাকিস্তানে ইসলামি শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রবর্তন-প্রয়াসের বিরূপ সমালোচনা এবং সমস্ত কাহিনির নাটকীয়তা ও সংলাপে বৃহত্তর ময়মনসিংহ-এলাকার আঞ্চলিক ভাষার প্রয়োগ-চাতুর্য।

> বাংলা সাহিত্যে আবুল মনসুর আহমদের যে খ্যাতি তা মূলত ব্যঙ্গ রচনার জন্য। তবে উপন্যাস, প্রবন্ধ-নিবন্ধ ও স্মৃতিচারণমূলক রচনায় তিনি যে কৃতিত্বের ছাপ রেখেছেন তাও অতুলনীয়। গতানুগতিক ধারা পরিহার করে তিনি প্রবন্ধ-নিবন্ধে রেখেছেন মৌলিক চিন্তার পরিচয়। বিশ শতকের সমাজ সংস্কার ও শোধনের বিষয়টি ঘুরে-ফিরে এসেছে তাঁর রচনায়। চারপাশের যাপিত জীবনের চালচিত্রে যে সঙ্গতি-অসঙ্গতি তা সাহিত্যে ফুটিয়ে তোলার সাথে সাথে তিনি মুখোশ উন্মোচন করেছেন সেই সব ছদ্মবেশী ভণ্ডদের যারা আমাদের সমাজে দিব্যি ভালো মানুষটি সেজে সাধারণ মানুষকে বোকা পেয়ে ধোকা দিচ্ছে।'[১৩]

বিশ শতকের প্রথমার্ধের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে বাঙালি মুসলিম জীবনের নিবিড় পর্যবেক্ষক ছিলেন আবুল মনসুর। রাজনীতির হালচাল, অর্থনীতির নাজুক দশা, খাদ্যাভাব ও দুর্ভিক্ষ, বিশ্বযুদ্ধ, ভাষা-আন্দোলন প্রভৃতির স্বরূপ রূপায়ণে এবং সঠিক দিক-নির্দেশনায় তিনি সমকালের সতর্ক শিল্পী। তাঁর কলমের সাধনা উত্তরকালেও সম্প্রসারিত। দেশ-বিভাগের আশাবাদ এবং পরবর্তীকালে সৃষ্ট হতাশা তাঁর সাহিত্যের উপাদান হয়ে উঠেছে অনিবার্যভাবে। গ্রাম্য দলাদলি, আইনের শাসন-প্রতিষ্ঠায় দুর্বলতা, ধর্ম-ব্যবসা ও কুসংস্কারকে তিনি সাহিত্যে স্থান দিয়েছেন পরম মমতায়। জোহান বোয়ার-এর

---

[১২] আবুল মনসুর আহমদ, *বাংলাদেশের কালচার* (ঢাকা: আহমদ পাবলিশিং হাউস, ১৯৭৬), পৃ. ২১৭।

[১৩] সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ, সম্পা., *একুশের প্রবন্ধ ২০০৬* (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০০৯), পৃ. ১৩৩।

দ্য পাওয়ার অব লাইফ গ্রন্থের বাংলা রূপান্তর *সত্যমিথ্যা* (প্রকাশকাল ১৯৫০) আবুল মনসুর আহমদের প্রথম উপন্যাস। এর বিষয় সমকালীন সমাজ ও রূপান্তরের চিন্তা। পরবর্তী উপন্যাস *জীবনক্ষুধা* (প্রকাশকাল ১৯৫৫) এবং আবেহায়াত (প্রকাশকাল ১৯৬৮)-তে স্থান পেয়েছে রাজনীতির ক্রম-বিকাশ আর প্রচলিত জীবনধারার বিবরণ ও প্রত্যাশিত পরিবর্তনের প্রবল আশাবাদ। মূলত সমকালীন রাজনৈতিক-সামাজিক সংকটকেই তিনি চিহ্নিত করতে চেষ্টা করেছেন চিন্তা-প্রকাশ-প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে। এই প্রসঙ্গে সাহিত্যিক ও দার্শনিক আহমদ ছফার একটি মন্তব্য উদ্ধৃত করছি –

> ইতালীয় দার্শনিক বেনেদিত্তো ক্রোচের মতে প্রতিটি জাতির এমন কতিপয় সামাজিক আবেগ আছে যার মধ্যে জাতিগত বৈশিষ্ট্যসমূহ নির্যাসের আকারে পুরোমাত্রায় বিরাজমান থাকে, রাজনৈতিক পরাধীনতার সময়ে সে আবেগ সাপের মতো কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘুমিয়ে থাকে এবং কোনো রাজনৈতিক এবং সামাজিক মুক্তির দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত হলে সে আবেগই ফণা মেলে হুঙ্কার দিয়ে ওঠে। সাহিত্যেই প্রথমে এই জাতিগত আকাঙ্ক্ষার রূপায়ণ ঘটতে থাকে। জাতিগত আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে যুক্ত হতে না পারলে কোনো মহৎ সাহিত্য যে সৃষ্টি হতে পারে না, একথা বলাই বাহুল্য।[১৪]

স্কুলের সিলেবাসে থাকার কারণে বাংলাদেশে আবুল মনসুর আহমদের 'রিলিফ ওয়ার্ক' গল্পটি বেশ পরিচিত। এই গল্পে সামাজিক দুর্নীতি আর অমানবিকতার বাস্তবচিত্র অঙ্কনে লেখকের সাফল্য ঈর্ষণীয়। বিজ্ঞানী আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের 'ধর্মের জন্য ব্যবসা', 'সেবার জন্য ব্যবসা', 'দেশপ্রেমের জন্য ব্যবসা', 'কৃষ্টি-সভ্যতা ও মানবতার জন্য ব্যবসা'-র আধ্যাত্মিক রূপায়ণের পরিকল্পনার পরিণতিকে বিষয় করে আবুল মনসুরের লেখা 'সায়েন্টিফিক বিজিনেস' বর্তমান বিশ্বে সামাজিক ব্যবসা বা সোশ্যাল বিজনেস-এর প্রাক-ধারণা বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। বাঙালির কেরানি চাকরিপ্রীতি দূর করে তেজারতি বা ব্যবসাবাণিজ্য বিস্তার যে সমাজ-সভ্যতার জন্য কল্যাণকর, তা সমাজ-রূপান্তরের কারিগর আবুল মনসুর উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তাঁর 'আদুভাই'তো বাংলাসাহিত্যে খুব জনপ্রিয় এবং সুপরিচিত গল্প। বিদ্যালয়ের ছেলেমেয়েরা আদুভাইয়ের নাম শোনেনি, এমন নজির বিরলপ্রায়। আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা, শিক্ষা-সংস্কার আর চিন্তাভুবনে প্রবলভাবে নাড়া-দেওয়া এই গল্পটির ভাবার্থ অনুধাবন করা সত্যিই দুঃসাধ্য। পিছিয়েপড়া এই সমাজে শিক্ষা যে আজও আমাদের চেতনাকে জাগ্রত করতে পারেনি, শিক্ষা যে সাংস্কৃতিক বিপ্লব সৃষ্টি করতে পারেনি, তা বোধকরি ঢোল পিটিয়ে বলার প্রয়োজন নেই। শিক্ষা এবং ভাষা-সংস্কৃতি প্রসঙ্গে আবুল মনসুর আহমদের চিন্তা নানানভাবে বাঙালি বিদ্বৎসমাজকে প্রভাবিত করে। ইতিবাচক-নেতিবাচক প্রতিক্রিয়াও ব্যক্ত করেছেন কেউ কেউ। তাঁর ভাষা-সংস্কার-চিন্তা বিষয়ে প্রখ্যাত কথাশিল্পী হাসান আজিজুল হক মন্তব্য করেছেন –

> আবুল মনসুর আহমদ এক সময় আমাদের লেখ্য বাংলা ভাষাটিকে দেশজ অনন্যতা দেবার যুক্তিতে কিছু পরিবর্তনের প্রস্তাব এনেছিলেন। সে-সব প্রস্তাবের সামান্যই ছিল ভাষাবিষয়ক; ধর্মীয় সাংস্কৃতিক ও আঞ্চলিক বিবেচনাই তাঁর মন দখল করে ছিল বেশি। ভাষার প্রমিত রূপটি অক্ষত রেখেই যে ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক, এমন কি আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য ভাষাদেহে সংস্থিত করা সম্ভব, এ কথা তাঁর মনেই হয়নি।[১৫]

আবুল মনসুর আহমদের স্যাটায়ার, ক্রিয়েটিভ রচনা ও নিবন্ধে সমকালীন অবিভক্ত বাংলা ও পূর্ব-পাকিস্তানের রাজনৈতিক, সামাজিক প্রতিবেশের বিশেষত, মুসলমান মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশের ক্রমধারার ছবি লিপিবদ্ধ হয়ে আছে। আর আত্মজৈবনিক বচনে রয়েছে অবিভক্ত ভারত, পূর্ব-পাকিস্তান ও বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সংঘাতের পরিচয়। সমাজ-রূপান্তরের ক্রমধারায় তিনি অনন্য এক কারিগর। তিনি 'তাঁর রাজনৈতিক, সাংবাদিক ও সাহিত্যজীবনে বাংলার

---

[১৪] আহমদ ছফা, *বাঙালি মুসলমানের মন* (ঢাকা: বুক পয়েন্ট, ১৯৯৬), পৃ. ১৯।

[১৫] হাসান আজিজুল হক, 'প্রমিত বাংলা ভাষা', "অপ্রকাশের ভার", *হাসান আজিজুল হক রনাচাসমগ্র*, ৪র্থ খণ্ড (ঢাকা: সাহিত্যিকী, ২০০৩), পৃ. ১৬৯।

নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর একজন সচেতন প্রতিনিধিরূপে সর্বদা সমাজের মূলস্রোত বা ধারার অন্তর্গত ছিলেন। তিনি বামপন্থী রাজনীতিক ও বুদ্ধিজীবীদের মতো সমাজের বাইরে অবস্থান করে সমাজকে ব্যঙ্গবিদ্রূপ বা নসিহত করার চেষ্টা করেননি।[১৬] কবি-কথাশিল্পী, সাহিত্য-সমালোচক ও সাহিত্য-সম্পাদক বুদ্ধদেব বসুর 'সাহিত্যে পাকিস্তান অসম্ভব' শীর্ষক একটি প্রকাশিত নিবন্ধের প্রতিক্রিয়া-ব্যক্ত-করার-প্রসঙ্গে ১৯৪২ সালের ১ নভেম্বর 'পাকিস্তান রেনেসাঁ সভা'য় আবুল মনসুর আহমদ 'সাহিত্যে সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য' শিরোনামে একটি রচনা পাঠ করেন। বক্তব্যের বিষয় এবং পরিবেশনের ঢঙে লেখাটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। নিবন্ধটির এক-অংশে তিনি বলেন –

> সাহিত্য মানব-জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন একটা হাওয়াই জিনিস নয় এবং মানব-জীবনকেও রাজনীতি হইতে বিচ্ছিন্ন করা অসম্ভব। সুতরাং সাহিত্যের সঙ্গে রাজনীতি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। বুদ্ধদেব বাবুর উপন্যাসে স্বীকৃত না হইলেও, তাঁর নিজের জীবনেরই প্রতি পরতে পরতে এটা তিনি দেখিতে পাইবেন যে, যৌন-ক্ষুধার চেয়ে মানুষের পেটের ক্ষুধা কম শক্তিশালী অনুভূতি নয়। অপরের বিয়ে করা বউয়ের প্রতি লোভ হওয়ার নামকে 'প্রেম' আখ্যা দিলে অপরের অনাবশ্যক ধনের প্রতি লোভ হওয়াটাকেও কিছুতেই 'অপ্রেম' আখ্যা দেওয়া যায় না। দুনিয়ার হাজার মেয়ে মানুষ পড়িয়া থাকিতে একজনের বউ চুরি করিয়া লইয়া যাওয়াকেই আমরা আর্টের রূপ দিতেছি। অথচ দরিদ্রদের ক্ষুধার অন্ন কাড়িয়া-নেওয়া ধনস্তূপের দিকে যদি অন্নহীনেরা বেআইনীভাবে একটু হাত বাড়ায় তবে আমরা তাকে ঘৃণা করিতেছি। এ-ব্যবস্থার প্রতিবাদকে বাঙলার লেখক সমাজ রাজনৈতিক আবর্জনা ও আর্ট-বিরোধী পার্থিব ব্যাপার বলিয়াই আসিতেছেন। স্বয়ং বুদ্ধদেব বাবু এই আর্টবাদীদের গণ্ডি হইতে 'স্বতন্ত্র' হইবার চেষ্টা করিতেছেন বলিয়াই বোধ হয়। তাই তিনি রাজনীতি হইতে মুক্ত নন। এটা ভালো কথা। এইখানেই বুদ্ধদেব বাবু আমাদের নমস্য।[১৭]

উপসংহার

বিশ শতকের প্রায় পুরো অংশের রাজনৈতিক-সামাজিক অস্থিতিশীল ঘটনাপ্রবাহের কালদ্রষ্টা আবুল মনসুর আহমদ। ১৯২০ সাল থেকে ১৯৭৯ সাল পর্যন্ত প্রায় ৬০ বছরের ঘটনা-নির্যাস নিংড়ে-নিংড়ে তিনি বিশ্লেষণ করেছেন সাহিত্যে, আত্মজীবনীতে। যাপিত জীবনের চালচিত্র উপস্থাপনে তাঁর রচনায় কোনোরকম কৃত্রিমতার প্রলেপ নেই। কখনো গল্পের খণ্ডছবিতে, কখনো উপন্যাসের বিরাট ক্যানভাসে, কখনো মননশীল রচনায় সমাজকে তুলে এনেছেন পাঠক-শ্রোতার সামনে। মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিকাশ ধারা সম্বন্ধে তাঁর পর্যবেক্ষণ বাংলা সাহিত্য এবং বাঙালি জীবনে ব্যতিক্রমি এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। বর্ণাঢ্য রাজনৈতিক জীবনের বিচিত্র বাঁক-পরিবর্তনেও তিনি সাহিত্যচর্চা থেকে দূরে সরে যাননি। বরং রাজনীতির রূপ-রূপান্তর থেকে সংগ্রহ করেছেন সাহিত্যের অনন্য সব রসদ। নিরন্তর সাধকের মতো কাজ করেছেন। আর উত্তরকালের প্রজন্মের জন্য রেখে গেছেন চিন্তার কিছু উপাদান এবং বিচরণের খানিক খোলা বারান্দা।

---

[১৬] রফিকুল ইসলাম, সম্পা., "ভূমিকা," *আবুল মনসুর আহমদ রচনাবলী, প্রথম খণ্ড* (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০০৫)।

[১৭] এবাদুর রহমান ও অন্যান্য, সম্পা., *পূর্ব বাংলার ভাষা* (ঢাকা: ২০০৪), পৃ. ১১।

ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ জার্নাল
সংখ্যা ২৩ (১৪২২ বঙ্গাব্দ)

ঢাকায় উর্দু নাট্যচর্চা : একটি পর্যালোচনা

মোঃ মোকাররম হোসেন মণ্ডল*

Abstract: Nawab Wajid Ali Shah of Lucknow was the pioneer of Urdu drama. Amanat Ali Shah's drama *Indar Sabha* is the first name in the history of Urdu drama. But it was in the form of poetry not prose. The very first and foremost drama of urdu *Bimar-e-Bulbul,* which was written in prose by Master Ahmed Hasan Wafar of Dhaka. The drama was staged in Imamganj in old Dhaka in 1867. But the *Nawabi Darbar,* written by Syed Mohammad Azad, father-in-law of Sher-e-Bangla Fazlul Haque, transcended and excelled *Bimar-e-Bulbul* on all counts. It was staged in Chota Katra, Dhaka in 1885. Later on urdu dramatic activities or play writing shifted to Bombay or other parts of India due to financial crisis. Nevertheless it is as true as egg is eggs that Dhaka played a leading role in the development and enhancement of urdu drama. This paper examines and highlights the historical aspects of the genesis and developments of urdu drama in Bengal specially in Bangladesh.

ভূমিকা

আধুনিক কথাসাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শাখা হচ্ছে নাটক। ইহার সাফল্য মূলত অভিনয় শিল্পের ওপর প্রতিষ্ঠিত। উর্দু সাহিত্যের ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য। আর উর্দু ভাষা সৃষ্টিতে মুসলমানদের অবদান বেশি থাকায় প্রাথমিক অবস্থায় তাঁরা ধর্মীয় বিধি নিষেধের কারণে অভিনয় শিল্পকে মন থেকে মেনে নিতে পারেনি। একারণে সাহিত্যের অন্যান্য শাখার তুলনায় সাহিত্যাঙ্গনে উর্দু নাটকের আবির্ভাব অনেক পরে। আবার অনেকে উর্দু ভাষাকে শুধুমাত্র মুসলমানদের ভাষা হিসেবে মনে করত। কিন্তু ইহা ঠিক নয়। কেননা, এ ভাষা সৃষ্টি ও উন্নতিতে উপমহাদেশের হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়েরর সমান সম্পৃক্ততা রয়েছে। শুধু ভাষা সৃষ্টি নয়, বরং উর্দু সাহিত্য পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় যে সাহিত্য সৃষ্টি ও উন্নতিতে উভয় সম্প্রদায়ের সম্পৃক্ততা এমনকি কোন কোন ক্ষেত্রে হিন্দু সম্প্রদায়ের বেশি অবদান রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে কোন ভাষা কোন জাতির জন্য নির্দিষ্ট হতে পারে না। উর্দু ভাষার ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম নয়। ইংরেজি সাহিত্যের প্রভাবে ভারতবর্ষে যখন পাশ্চাত্য ঢংয়ে দেশীয় বিভিন্ন ভাষায় নাটক মঞ্চস্থ আরম্ভ হয় এবং সেগুলো মঞ্চ সাফল্যও পায়, তখন উর্দু নাট্যকাররাও ধর্মীয় গোঁড়ামী থেকে

* সহকারী অধ্যাপক, ভাষা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

বেরিয়ে এসে নাটক রচনা ও মঞ্চস্থ করার ব্যাপারে উৎসাহিত হন। আর এই উর্দু নাটক রচনা মঞ্চস্থ করার কাজে সর্বপ্রথম ঢাকার নবাব মুহাম্মদ হোসেন আযাদসহ এখানকার সম্ভ্রান্ত হিন্দু ও মুসলিম সমাজের কতিপয় ধনাঢ্য ব্যক্তি বেশ আগ্রহের সাথে এগিয়ে আসেন এবং পৃষ্ঠপোষকতা দেন। বিষয়টি আলোচ্য প্রবন্ধে বেশ গুরুত্বের সাথে তুলে ধরার প্রয়াস চালানো হয়েছে। এর আগে থেকে যদিও লক্ষ্ণৌতে উর্দু নাটক মঞ্চস্থ শুরু হয়েছিল। কিন্তু তা শুধুমাত্র কাব্য নাটকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। অপরদিকে ঢাকায় উর্দু কাব্য নাটকের পাশাপাশি নিয়মতান্ত্রিকভাবে প্রথম গদ্য নাটক মঞ্চস্থ আরম্ভ হয়। ফলে উর্দু নাটকের উৎকর্ষ সাধন বিশেষ করে গদ্য নাটকের ভিত্তি ভূমি হিসেবে এই এলাকার গুরুত্ব অপরিসীম। এছাড়া উর্দু ভাষার উৎপত্তি উত্তর ভারতে হলেও এর মঞ্চ নাটকের সূচনালগ্নের ভিত্তি মজবুতকরণ ও উন্নতিতে পূর্ব বাংলার রাজধানী ঢাকার (যার মাতৃভাষা বাংলা) যে অসামান্য অবদান রয়েছে, তা উর্দু ভাষাভাষী ও শিক্ষার্থীদের অনেকের কাছেই অজানা রয়ে গেছে। এ বিষয়গুলো উর্দু স্কুলের শিক্ষার্থী ও সাহিত্যমোদীদের সামনে তুলে ধরতে প্রবন্ধটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে মনে হয়।

নাটক মঞ্চে অভিনয়ের জন্য রচিত সংলাপ নির্ভর সাহিত্যকর্ম।[১] গতিমান মানবজীবনের প্রতিচ্ছবি কুশীলবদের মঞ্চাভিনয়ের মাধ্যমে দর্শক সাধারণের চোখের সামনে মূর্ত হয়ে উঠলে তাকে নাটক বলে।[২] একমাত্র মঞ্চাভিনয়ের মাধ্যমেই নাটকের পরিপূর্ণ সাহিত্যরস আস্বাদন সম্ভব। এজন্য নাটককে বলা হয় যৌথ শিল্প মাধ্যম। কারণ, নাটক একই সঙ্গে দেখা এবং শোনা যায়। তাই নাটক সাহিত্যের চেয়ে শিল্প মাধ্যম হিসেবেই বেশি গুরুত্বাবাহি এবং স্বীকৃত।[৩] মূলত নাটক দৃশ্য ও শ্রব্য কাব্যের সমন্বয়ে রঙ্গমঞ্চের সাহায্যে গতিময় মানবজীবনের প্রতিচ্ছবি আমাদের সম্মুখে মূর্ত করে তোলে।[৪] নাটকের পরিচয় দিতে গিয়ে বিখ্যাত নাট্য বিশারদ সাধন কুমার ভট্টাচার্য বলেছেন, 'The name Drama is given to such poem as representing action' অর্থাৎ "নাটক হচ্ছে সেই কাব্য, যাতে লোকবৃত্তকে দৃশ্য রীতিতে উপস্থাপিত করা হয়।"[৫] এছাড়া *A Glossary of Literary Terms* নামক গ্রন্থে নাটকের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, 'Drama is the literary form designed for the theater, where actors take the roles of characters, perform the indicated action, and utter the written dialogue.'[৬] অর্থাৎ "নাটক মঞ্চে অভিনয়ের জন্য রচিত সাহিত্যবিশেষ যেখানে অভিনেতা চরিত্র, অভিনয় এবং লিখিত সংলাপ উচ্চারণ করে কাহিনি তুলে ধরেন।" কারো মতে, 'যে সাহিত্যকর্মে পদ্য কিংবা গদ্যের ভাষায় কতিপয় চরিত্র বা কোনো ঘটনাপ্রবাহ সংলাপাত্মক

---

১. কবীর চৌধুরী, *সাহিত্য-কোষ* (ঢাকা: শিল্পতরু প্রকাশনী, ২০০৫), পৃ. ৫১।

২. সেলীম আখতার, *উর্দু আদব কী মুখতছরতেরীন তারিখ* (লাহোর: সংগ-এ মাইল পাবলিকেশন্স, ১৯৮৭), পৃ. ২৫৭।

৩. মোতাহার হোসেন সুফি, *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস* (ঢাকা: কাকলী প্রকাশনী, ১৯৮৮), পৃ. ২৭৫; বদিউর রহমান, *সাহিত্য স্বরূপ* (ঢাকা: গতিধারা, ২০০৯), পৃ. ৯১।

৪. শ্রীশচন্দ্র দাশ, *সাহিত্য সন্দর্শন* (ঢাকা: একুশ প্রকাশন, ২০০১), পৃ. ৭০।

৫. সাধন কুমার ভট্টাচার্য, *নাট্যতত্ত্ব মীমাংসা* (কলকাতা: বিদ্যোদয় লাইব্রেরি, ১৯৬৩), পৃ. ১৪৭।

৬. M. H. Abrams, *A Glossary of Literary Terms* (India: Macmillan Ltd, 1983), P. 43.

ভঙ্গিতে মঞ্চের সাহায্যে উপস্থাপিত হয় তাকে নাটক বলে।'[৭] কেউ বলেছেন, 'নাটক সংলাপ আকারে লিখিত সাহিত্যকর্ম, অভিনেতার মাধ্যমে কোনো কিছু দৃশ্যমান করা এর উদ্দেশ্য।'[৮]
মোটকথা, শিল্পসম্মত প্রক্রিয়ায় অভিনেতা ও অভিনেত্রীরা যখন মঞ্চে উপস্থিত হয়ে সংলাপের মাধ্যমে কোনো কাহিনির বাস্তব প্রতিচ্ছবি জনসম্মুখে মূর্ত করে তোলেন, তখন তাকে নাটক বলা হয়। আর একটি সার্থক নাটকের জন্য কাহিনি, চরিত্র, ভাষা, অভিপ্রায়, মঞ্চ, সংগীত, অভিনয়, অভিনেতা, দর্শক, সংলাপ ইত্যাদি প্রয়োজন।

নাটকের উৎপত্তি

নাটকের উৎপত্তি কখন কি অবস্থায় হয়েছে, তা বলা খুবই কঠিন। তবে অধিকাংশ নাট্যসমালোচক এ ব্যাপারে একমত হয়েছেন যে, এ শিল্প এতটাই প্রাচীন, যতটা মানবজীবন। কেননা, নাটক শব্দের মূল রূপ হলো 'নাট'। যার অর্থ- নৃত্য, অভিনয়, রঙ্গ-লীলা ইত্যাদি।[৯] আর নাটক শব্দের ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো 'Drama', যা ল্যাটিন ভাষার 'Draou' শব্দ থেকে উৎপত্তি। এর শাব্দিক অর্থ হলো: করে দেখানো। অর্থাৎ কোনো বিষয়কে কাজের মাধ্যমে দর্শকের সামনে উপস্থাপন করা।[১০] সুতরাং উভয় ভাষার শাব্দিক অর্থ থেকে প্রমাণ হয় যে, আদিম যুগে মানুষেরা বিয়ে-শাদী, যুদ্ধ-বিগ্রহ, শিকার বা অন্য কোনো ঘটনার বর্ণনা আসর বসিয়ে নেচে-গেয়ে এমনকি অভিনয়ের মাধ্যমে পরিবেশন করত। মূলত তখন থেকেই নাটক বা ড্রামার (ڈراما) উৎপত্তি।[১১] এ প্রসঙ্গে উর্দু নাট্য সাহিত্যের বিশিষ্ট সমালোচক ইশরত রহমানি বলেছেন:

یہ کہنا صحیح ہے کہ ڈراما دنیا کی پیدائش کے وقت سے شروع ہوا۔ وحشی اقوام کا جنگلوں اور پہاڑوں میں بغیر ساز و سامان اور لباس و آرائش کے، آگ روشن کرکے اپنی بول چال میں آوازیں نکالنا، ناچنا گانا اور کھیلنا کودنا، ناٹک یا ڈراما ہی تھا اور یہ سب ان کی زندگی کے عین مطابق اور وقت، موقع، محل اور حالات کی صحیح عکاسی ہوا کرتی۔ تہذیب کے آغاز اور تدریجی نشوونما کے ساتھ ساتھ وحشت و بربریت کم ہوتی گئی۔ دیوتاؤں اور دیویوں کی عقیدت اور مذہبی جوش نے دلوں پر اثر کیا۔ دیو ملا اور ناٹک کتھا کا رنگ روپ نظر آیا اور عہد بہ عہد تہذیبی ترقی کے ساتھ مذہبی یا دھارمک ناٹک کی تشکیلی عمل میں صدیوں پہلے انسانی کردار اور زندگی کو پیش کرنا ایک شغل یا کھیل تھا۔ زندگی کے اہم معاملات کو نفسیاتی خصوصیات کے ساتھ بیان کرنا اور اس سے لطف اندوز ہونا ایک تفریح تھی اور زندگی کی اسی نفسیاتی نقل کا نام بعد میں ڈراما ہوا۔[১২]

[ইহা বলা যথার্থ যে, পৃথিবির জন্মলগ্ন থেকে নাটকের সৃষ্টি। কোনোরূপ সাজ-সজ্জা, পোশাক পরিচ্ছেদ, আসবাবপত্র ব্যতিত পাহাড় ও জঙ্গলে যাযাবর জাতিদের বসবাস, আগুন জ্বালিয়ে

---

৭. মাজদী ওয়াহবা, *মু'জামু মুসত্বালাহাতিল আদাব* (বৈরুত: মাকতাবাতুলবুনান, ১৯৭৪), পৃ. ১২১।

৮. মুহাম্মদ যগলুল আস-সালাম, *আল-মাসরাহিয়্যাহ ওয়াল মুজতামি'য়াহ ফি মিআতি আম* (মিসর: আল-ইসকান্দারিয়্যাহ, তা.বি.), পৃ. ০৪।

৯. অধ্যাপক মিলন দত্ত ও অধ্যাপক অমলেন্দু মুখোপাধ্যায়, *শব্দসঞ্চয়িতা* (কলকাতা: নিউ সেন্ট্রাল বুক এজেন্সী প্রা. লি., ১৯৯৫), পৃ. ৪৯৩।

১০. সেলীম আখতার, *উর্দু আদব কী মুখতছরতেরীন তারিখ*, পৃ. ২৫৭; ইশরাত রহমানি, *উর্দু ড্রামা তারিখ ওয়া তানক্বীদ* (আলীগড়: মাকতুবা-এ আলফাজ, ১৯৮৭), পৃ. ১০।

১১. ইসমাইল মোহাম্মদ, *নাট্যকলার ক্রমবিকাশ* (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৮৭), পৃ. ২; মুশতাক আহমদ, *বাংগাল মে উর্দু ড্রামা* (কলিকাতা: রীডার শুবা-এ উর্দু কলিকাতা ইউনিভার্সিটি, ১৯৯০), পৃ. ১৬।

১২. ইশরাত রহমানি, *উর্দু ড্রামা কা এরতেকা* (আলীগড়: এজুকেশনাল বুক হাউস, ১৯৮৬), পৃ. ১২-১৩।

> নিজেদের কথাবার্তায় চিৎকার করা, খেলাধূলা, নৃত্য করা, গান গাওয়া প্রভৃতি নাটকই ছিল। আর এসব কর্মকাণ্ড নিয়মানুসারে তাদের জীবনের সকল অবস্থা ও সমসাময়িক সময়ের সঠিক চিত্র ফুঁটে তুলত। অতঃপর সভ্যতার উৎপত্তি ও বিকাশের সাথে সাথে যাযাবর জীবনের দ্রুত বিনাশযাত্রা শুরু হয়। আর দেবতা ও দেব-দেবীর বিশ্বাস এবং ধর্মীয় আবেগ-অনুভূতি অন্তরের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে থাকে। এরপরই নাটকের ধারণা আসে। কালের বিবর্তনে সভ্যতার বিকাশের সাথে সাথে মানবজীবন ও চরিত্র নিয়ে নাটক রচনা করার শত বছর পূর্বে ধর্মীয় দৃষ্টিতে নাট্য রচনা করা এক বিশেষ ধরনের কাজ ছিল। জীবনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলীকে বাস্তব অভিজ্ঞতা ও বৈশিষ্ট্যের আলোকে বর্ণনা করা এবং সেখান থেকে মজা অনুভব করাই আনন্দ ছিল। আর জীবনের এ ধরনের বৈশিষ্ট্যসমৃদ্ধ গল্পই পরবর্তীতে নাটক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।]

তবে হিন্দু ধর্মের অনুসারীদের মতে, প্রাচীনযুগে মানুষের মাধ্যমে নয় বরং স্বর্গ থেকে দেবতার মাধ্যমে নাটকের উৎপত্তি হয়েছে। এ সম্পর্কে সংস্কৃত ভাষায় একটি বিখ্যাত উপাখ্যানও আছে।[১৩] আর সাহিত্যের দৃষ্টিতে নাটক মূলত অনুকরণ থেকে সৃষ্টি। যা প্রাকৃতিকভাবে মানুষের জন্মগত অভ্যাস।[১৪] অর্থাৎ সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরে তার সবকিছুই অজানা থাকে। অতঃপর আশে-পাশে অবস্থানকারী ব্যক্তিদের নিকট থেকে বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে আস্তে আস্তে অনুকরণ করতে শিখে। এই অনুকরণ থেকে প্রথমে কতকগুলো শব্দ এবং সে শব্দগুলোর অর্থ বুঝতে শেখে। পরবর্তীতে সেই আয়ত্তকৃত বিষয়গুলোকে অন্যের সামনে উপস্থাপন করার চেষ্টা করে। এভাবে যখন সে অন্যের অনুকরণ করে তখনই নাটক বা ড্রামার আবির্ভাব হয়। এজন্য জনৈক গ্রিক দার্শনিক মানুষকে সামাজিক প্রাণির সাথে সাথে অনুকরণীয় প্রাণি বলে আখ্যায়িত করে বলেছেন, 'মানুষের মধ্যে শৈশবকাল থেকে অনুকরণীয় ভাব লুকায়িত থাকে। আর প্রাকৃতিকভাবে মানুষ অনুকরণের মাধ্যমে আনন্দ উপভোগ করে। এজন্য নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, নাটক সর্বযুগে কোনো না কোনোভাবে বিদ্যমান ছিল। আর যতদিন মানুষের মধ্যে অনুকরণের মানসিকতা থাকবে ততদিন সমাজে নাটকও বিদ্যমান থাকবে।'[১৫] এখান থেকে প্রমাণ হয় যে, মানুষ নিজের আবেগ-অনুভূতি প্রকাশ ও অন্যের আবেগ-অনুভূতি সম্পর্কে জানার জন্য সর্বদা উদগ্রীব থাকে। যা উৎকৃষ্ট শিল্পের জন্য আসল বুনিয়াদ। আর এখান থেকেই সাহিত্যের পরম্পরা আরম্ভ

---

১৩. উপাখ্যান: "সৃষ্টির পর একদা ইন্দ্রসহ সকল দেবতা ব্রহ্মার নিকট চোখ ও কানের আনন্দবিধায়ক একখানি পঞ্চম বেদ সৃষ্টি করার জন্য আবেদন জানান। কেননা, পূর্ব থেকে যে চারখানি বেদ (ঋগ্বেদ, সামবেদ, যজুর্বেদ, অথর্ববেদ) প্রচলিত ছিল, তাতে শুধুমাত্র ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই জাতিত্রয়ের অধিকার ছিল। শূদ্র নামক জাতির কোনো অধিকার ছিল না। ইন্দ্র মনে করলেন নবসৃষ্ট এই পঞ্চমবেদে শূদ্রেরও অধিকার থাকবে। ইন্দ্রের আবেদন ব্যর্থ হল না। ব্রহ্মা ঋগ্বেদ হতে বাণী, সামবেদ হতে গীতি, যজুর্বেদ থেকে অভিনয় এবং অথর্ববেদ থেকে অনুভূতি ও রস গ্রহণ করে 'নাট্যবেদ' নামক একটি পঞ্চমবেদ সৃষ্টি করলেন। অতঃপর দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা ব্রহ্মার আদেশে রঙ্গশালায় প্রথম নাটক *সমুদ্র মনথন* মঞ্চস্থ করেন। যে নাটকের বিষয়বস্তু ছিল দেবগণের পরাভব। রাজা নহুষ ইন্দ্রপদ লাভ করলে তাঁর ইচ্ছায় স্বর্গের ঐ নাট্যবেদ পৃথিবীতে প্রচারিত হয়। ভরতের সন্তানগণই পৃথিবীতে প্রেরিত হলেন এবং তাঁদের মধ্য থেকে সমাজে এক বিশেষ শ্রেণির নাট্যশাস্ত্র বিশারদের আবির্ভাব ঘটে। তাঁদের উদ্দেশ্যই ছিল পর্যালোচনার মাধ্যমে নাট্যবেদের প্রচার করে সর্ব সাধারণকে শিক্ষাদান করা।" দ্র. বিমান চন্দ্র ভট্টাচার্য. *সংস্কৃত সাহিত্যের রূপরেখা* (কলকাতা: বিদ্যোদয় লাইব্রেরি, ১৯৮০), পৃ. ৯৮; মুশতাক আহমদ, *বাংগাল মে উর্দু ড্রামা*, পৃ. ১৬।

১৪. সৈয়দ বাদশাহ হোসাইন হায়দারাবাদি, *উর্দু মে ড্রামা নিগারি* (লাহোর: নযীর আহমদ তাজ বুক ডিপো, ১৯৬২), পৃ. ১৮।

১৫. ফরমান ফতেহপুরি, *উর্দু নছর কা ফন্নী এরতেকা* (দেহলী: এডুকেশনাল বুক হাউস, ১৯৯৪), পৃ. ১৭৪-১৭৫।

হয়। যেহেতু মানবজীবন শুরু হয় অনুকরণের মাধ্যমে, আর এ অনুকরণ হলো নাটকের আবশ্যম্ভাবী উপাদান। সেহেতু আমরা নিঃসন্দেহে বলতে পারি যে, সাহিত্যের প্রথম শাখা হলো নাটক।[১৬]

নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, সাহিত্যের অন্যান্য শাখার ন্যায় নাট্য সাহিত্যেরও প্রাথমিক নিদর্শন গ্রিক সাহিত্যে লক্ষ্য করা যায়। কেননা, প্রথম দিকে সেখানে গ্রিক দেবতা 'Dionysis'(ডায়োনিসিস)-এর শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্ব অবলম্বনে নাট্যরচনা করা হত এবং সে নাটকগুলো 'Chorus'(কোরাস)[১৭] নামক একটি অভিনয় সংঘের শিল্পীরা নেচে গেয়ে দেবতাকে খুশি করার উদ্দেশ্যে তা বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসবে প্রদর্শন করত।[১৮] মূলত এদের মাধ্যমেই গ্রিকে নাট্য সাহিত্যের প্রাথমিক উৎপত্তি ঘটে। তাদের এ কার্যক্রম নিয়মতান্ত্রিকভাবে মঞ্চের আবির্ভাব না হওয়া পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে চলতে থাকে। এখান থেকে নিঃসন্দেহে বুঝা যায় যে, নাট্যসাহিত্যের জন্ম ধর্মীয় আনন্দ উৎসব থেকে।[১৯] তবে পরবর্তীকালে গ্রিকের কিছু বাস্তবধর্মী লেখক ধর্মীয় উৎসবের পরিবর্তে রাজনৈতিক, সামাজিক, ভর্ৎসনা, কমেডি এবং ট্রাজেডিমূলক নাটক রচনা আরম্ভ করেন। সে সমস্ত লেখক হলেন Aeschylus [খ্রি. পূ. ৫২৫-৪২৬ অব্দ], Euripides [খ্রি. পূ. ৪৮০-৪০৬ অব্দ], Aristo Phanes [খ্রি. পূ. ৪৪৪-৩৮০ অব্দ] প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[২০] Aeschylus ছিলেন পৃথিবীর প্রথম নাট্যকার। তাঁর প্রথম নাটক হলো *The Supplicants* [খ্রি.পূ. ৪৯০ অব্দ]।[২১]

গ্রিকের পর রোমীয় (ল্যাটিন ভাষা) সাহিত্যে নাটকের প্রচলন শুরু হয়। কর্ডোভার অধিবাসী Seneca রোমান নাট্যমঞ্চের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য নাট্যকার। রোমান নাট্যমঞ্চের সময়কালকে নাট্যসাহিত্যের 'অন্ধকার যুগ' হিসেবে ধরা হয়। কেননা, এ সময় সংস্কৃত সাহিত্যের বিশ্বনন্দিত কবি ও নাট্যকার কালিদাস ভারতীয় নাট্যমঞ্চকে জীবন্ত করে রেখেছিলেন। তাঁর রচিত *অভিজ্ঞান-শকুন্তলম* নাটক বিশ্ববিখ্যাত। নাটকটি সর্বযুগে সর্ব ভাষায় সমভাবে সমাদৃত। এ ছাড়া *বিক্রমোর্বশী*, *মালবিকাগ্নিমিত্র*, *রঘুবংশ* প্রভৃতি তাঁর প্রসিদ্ধ নাটক। আবার শ্রীকণ্ঠ ভবভূতির *মালতীমাধব*, *বীরচরিত*,

---

১৬. সৈয়দ বাদশাহ হোসাইন হায়দারাবাদি, *উর্দু মে ড্রামা নিগারি*, পৃ. ১৯।

১৭. **কোরাস:** ইংরেজি 'Chorus' শব্দের বাংলা অর্থ যৌথ নর্তক বা গায়ক দল বা ঐক্যতান। প্রাচীন গ্রিসে ধর্মীয় উৎসব কেন্দ্রিক নাট্যাভিনয়ে অংশগ্রহণকারী নৃত্যগীত পরিবেশনকারী দলকে কোরাস বলা হতো। কোরাস গেয়ে নাটকের সূচনা করা হত এবং গল্প বলা হতো। তখন মূলত দেবতার উদ্দেশ্যে ভক্তবৃন্দের সমবেত সংগীতকেই কোরাস বলা হতো। কখনো কখনো ধর্মীয়, নৈতিক ও সামাজিক মতামত প্রকাশের মাধ্যম হিসেবেও কোরাসের প্রচলন ছিল। সাম্প্রতিককালে যে কোনো ধরনের সমবেত সংগীতকেই কোরাস বলার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। দ্র. বদিউর রহমান, *সাহিত্য স্বরূপ*, পৃ. ১৮৩।

১৮. আতীয়া নাশ্‌শাত, *উর্দু ড্রামা রেওয়ায়েত আওর তাজরিবাহ* (লক্ষ্ণৌ: নুসরাত পাবলিশার্স, ১৯৭৩), পৃ.২৯-৩০।

১৯. অজিত কুমার ঘোষ, *বাংলা নাটকের ইতিহাস* (কলিকাতা: জেনারেল প্রিন্টার্স এন্ড পাবলিশার্স প্রা. লি., ১৯৯৯), পৃ. ১-২।

২০. মির্যা আদীব, 'ড্রামে কা ফন' *তানক্বীদি মাক্বালাত*, গদ্যাংশ (লাহোর: লাহোর একাডেমি, ১৯৬৫), পৃ. ৪৯৭-৪৯৮; সালাম সান্দেলভি, *আদব কা তানক্বীদি মুতালেআ* (লক্ষ্ণৌ: নাসিম বুক ডিপো, ১৯৮৬), পৃ. ২৩৮-২৪০।

২১. ইসমাইল মোহাম্মদ, *নাট্যকলার ক্রমবিকাশ* (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৮৭), পৃ. ৫; অধ্যাপক মিলন দত্ত ও অধ্যাপক অমলেন্দু মুখোপাধ্যায়, *শব্দসঞ্চয়িতা*, পৃ. ৮৫০।

উত্তররামচরিত; রাজা শুদ্রকের লেখা *মৃচ্ছকঠিক* ও মহরাজা হরশদেবের *রত্নাবলী* প্রভৃতি সে সময়ের উল্লেখযোগ্য নাটক।[২২]

অতঃপর ষষ্টদশ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে ইউরোপে প্রথমে ধর্মীয় ধ্যান-ধারণায় নাটক রচনা শুরু হয়। এ সময়ের নাটকগুলো প্রাথমিক স্তরের হলেও এগুলোর মধ্যে নাটকীয় উপাদান বিদ্যমান ছিল। কিন্তু এখানে আধুনিক নাটকের সূচনা হয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে ইটালির রেনেসাঁস 'Renaissance' আন্দোলন [১৫০০-১৬৬০ খ্রি.]-এর পর। এ যুগের ট্রাজেডি ও কমেডি নাটকের ওপর রোমের নাট্যকারদের বিশেষ করে সেনেকার (Seneca) ট্রাজেডীমূলক নাটকের প্রভাব বেশ লক্ষণীয়।[২৩]

অতঃপর কালের বিবর্তনে এলিজাবেথীয় যুগে [১৫৫৮-১৬০৩ খ্রি.] ইংল্যান্ডে রোমীয় প্রভাব একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় এবং সম্পূর্ণ নতুন আঙ্গিকে রোমান্টিক নাটকের আবির্ভাব ঘটে। পরবর্তী সময়ে স্পেন, জার্মানিসহ বিভিন্ন দেশে ইংল্যান্ডের রোমান্টিক ভাবধারায় নাট্যচর্চার সূত্রপাত হয়। ইংরেজি সাহিতের Shakespeare [১৫৬৪-১৬১৬ খ্রি.], জার্মানির Lessining এবং স্পেনের Lope-de-vega, Calieron প্রমুখ তাঁদের অতুলনীয় নাট্যপ্রতিভার মাধ্যমে নাট্যসাহিত্যে বেশ সুনাম অর্জন করেন। এ সমস্ত লেখকদের প্রভাবে অষ্টাদশ শতাব্দীর নাট্যজগতে এক নতুন যুগের সূচনা হয়। এ সময় শুধুমাত্র নাটক রচনায় নয়, বরং নাটকের আনুসঙ্গিক বিষয় তথা প্রযোজনা, পরিচালনা, অভিনয়, মঞ্চসজ্জা প্রভৃতি বিষয় নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং নতুন নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার হয়।[২৪] মোটকথা, আধুনিক নাট্য সাহিত্য পাশ্চাত্য তথা সম্পূর্ণ ইংরেজি সাহিত্যের সৃষ্টি। ঊনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্য সাহিত্যের এই অধুনা শিল্পের অনুকরণে ভারতীয় উপমহাদেশের বিভিন্ন ভাষায় নাট্যচর্চা শুরু হয়। যার প্রভাব থেকে উর্দু নাট্যসাহিত্যও মুক্ত নয়, বরং আমাদের উর্দু নাট্যসাহিত্য এই আধুনিক ইংরেজি নাট্যসাহিত্য থেকেই সৃষ্টি।[২৫]

উর্দু নাটকের উৎপত্তি ও ঢাকায় উর্দু নাট্যচর্চা

উর্দু নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, উর্দু সাহিত্যের অন্যান্য শাখার প্রাথমিক উৎপত্তিতে আরবি-ফারসি ভাষা ও মুসলমানদের বিশেষ ভূমিকা থাকলেও নাটকের ক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম লক্ষ করা যায়। কেননা, নাটকের উৎকর্ষ মূলত অভিনয় সাফল্যের ওপর নির্ভরশীল। অভিনয় ছাড়া নাটক চিন্তা করা যায় না। অথচ ইসলাম ধর্মে অভিনয় বা নাটক নিষিদ্ধ। আর ধর্মীয় সূত্রে আরবি-ফারসি ভাষা ও ইসলাম ধর্মের সাথে মুসলমানদের একটা আত্মিক সম্পর্ক রয়েছে। এই সম্পর্ক স্বাভাবিকভাবেই উর্দু নাট্য সাহিত্যকে বেশ প্রভাবিত করেছে। ফলে মুসলমানদের সাথে আরবি-ফারসি ভাষার সম্পর্ক থাকার কারণে উর্দু নাটক তা থেকে স্বাভাবিকভাবে কোন সুরাহা পায়নি।[২৬]

---

২২. ইসমাইল মোহাম্মদ, *নাট্যকলার ক্রমবিকাশ*, পৃ. ১০-১৩; অধ্যাপক মিলন দত্ত ও অধ্যাপক অমলেন্দু মুখোপাধ্যায়, *শব্দসঞ্চয়িতা*, পৃ. ৮৫৩; ইশরাত রহমানি, *উর্দু ড্রামা তারিখ ওয়া তানক্বীদ*, পৃ. ৫৭-৫৮।

২৩. সালাম সান্দেলভি, *আদব কা তানক্বীদি মুতালেআ*, পৃ. ২৪১।

২৪. ইসমাইল মোহাম্মদ, *নাট্যকলার ক্রমবিকাশ*, পৃ. ৩০-৩২।

২৫. সালাম সান্দেলভি, *আদব কা তানক্বীদি মুতালেআ*, পৃ. ২৪২-২৪৩।

২৬. মুশতাক আহমদ, *বাংগাল মে উর্দু ড্রামা*, পৃ. ১৭-১৮; রামবাবু ছাহেব সাকসীনা, *তারিখ-এ আদব-এ উর্দু*, গদ্যাংশ (লক্ষ্ণৌ: মাতবা-এ মুনশি তেজকুমার প্রা.লি., ১৯৮৬), পৃ. ১৪০।

কিন্তু সপ্তদশ শতকে ইংরেজরা ভারতবর্ষের উপকূলীয় এলাকায় একচ্ছত্র শাসন প্রতিষ্ঠা করলে খ্রিস্টান ধর্ম প্রচার ও প্রসারের উদ্দেশ্যে তাঁরা বিভিন্ন খেলাধুলাসহ আনন্দবিধায়ক আচার অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে লাগে। এ কাজের অংশ হিসেবে তাঁরা হিন্দুস্তানি ভাষাসমূহে নাটক প্রদর্শনের ব্যবস্থা শুরু করে। ফলে ভারতবর্ষে ক্রমান্বয়ে বিভিন্ন ভাষায় নাট্যচর্চা আরম্ভ হয় এবং উন্নতির পথে ধাবিত হতে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় আনুমানিক ১৮৫০ সালের দিকে উর্দু ভাষায় নাটকের ব্যবহার আরম্ভ হয়।[২৭] তবে একথা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই যে, উর্দু নাটক আধুনিক যুগে সম্পূর্ণরূপে ইংরেজি সাহিত্যের প্রভাবে সৃষ্টি হলেও এর গোড়াপত্তনে সংস্কৃত ও হিন্দি নাটক, লোককাহিনি এবং ফারসি বীরত্বব্যঞ্জক ইসলামি কাহিনিই মূল ভূমিকা পালন করেছে। আর এসব নাটক মূলত অনুবাদের ভেতর দিয়েই উর্দু সাহিত্যে এসেছে।[২৮]

এ সমস্ত উর্দু নাটক প্রাথমিক অবস্থায় দেশি ঢংয়ে অভিনীত হতো। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে ইংরেজ কর্তৃক উপমহাদেশে থিয়েটার বা মঞ্চের ব্যবহার আরম্ভ হলে নাটকগুলো বেশ প্রভাবিত হয় এবং একটা সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে নতুন আঙ্গিকে যাত্রা শুরু করে। উর্দু নাটকের এই যাত্রালগ্নে লক্ষ্ণৌর রাজকীয় দরবারগুলোর প্রভাব এবং পৃষ্ঠপোষকতাও অপরিসীম। দরবারের তরফ থেকে নাটক মঞ্চায়নের জন্য প্রচুর সাহায্য-সহানুভূতি প্রদান করা হতো। রাজা বাদশাহরা শুধুমাত্র নাটক উপভোগই করতেন না, বরং এর উন্নয়নের প্রতিও অসীম মনোযোগী ছিলেন। এই মনোযোগের ফলেই পাশ্চাত্য ধরনের 'অপেরা'র উৎপত্তি।[২৯] একজন ফরাসি শিল্পী উর্দু নাটকে অপেরার ভিত্তি স্থাপন করেন।[৩০]

উল্লেখ্য যে, উর্দু নাটকের প্রথম নিদর্শন আমরা ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের [১৮০০ খ্রি.] যুগে দেখতে পাই। এ কলেজের প্রিন্সিপাল জন গীলক্রীষ্টের [১৭৫৯-১৮৪৭ খ্রি.] পরামর্শে মির্যা কাযেম আলী জোয়ান ১৮০১ খ্রিস্টাব্দে ভারতবর্ষের প্রখ্যাত সংস্কৃত কবি ও নাট্যকার কালিদাসের বিশ্ববিখ্যাত নাটক *অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্*-এর উর্দু অনুবাদ করেন এবং নাম রাখেন *শকুন্তলা* । তবে অনেকের মতে, নওয়াজ কবিশার নামক জনৈক লেখক প্রথমে 'ব্রজ'(হিন্দি) ভাষায় [১৭১৬ খ্রি.] *অভিজ্ঞান শকুন্তলম*-এর অনুবাদ করেছিলেন। আর এই ব্রজভাষার অনুবাদ থেকে কাযেম আলী জোয়ান সহজ-সরল উর্দু ভাষায় অনুবাদ করেন।[৩১] যদিও নাটকটি তাঁর মৌলিক সৃষ্টি নয়, তথাপি একথা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই যে, উর্দু নাট্যশাস্ত্রের প্রাথমিক যাত্রা ফোর্ট ইউলিয়াম কলেজেই শুরু হয়েছিল।[৩২] তবে সর্বপ্রথম নিয়মতান্ত্রিকভাবে উর্দু নাটক রচনা করেন লক্ষ্ণৌর নবাব ওয়াজেদ আলী শাহ [১৮২২-১৮৮৭ খ্রি.]।

---

২৭. আল্লামা সৈয়দ মুনীর আলী জাফরি, *জাদীদ উর্দু আদবীয়াত* (করাচী: বুকল্যাণ্ড পাবলিশার্স, ১৯৯২), পৃ. ৩৬।

২৮. সৈয়দ বাদশাহ হোসাইন হায়দারাবাদি, *উর্দু মে ড্রামা নিগারি*, পৃ. ৭৭; ইশরাত রহমানি, *উর্দু ড্রামা তারিখ ওয়া তানক্বীদ*, পৃ. ৬৫; রামবাবু ছাহেব সাকসীনা, *তারিখ-এ আদব-এ উর্দু*, গদ্যাংশ, পৃ. ১৪২।

২৯. **অপেরা:** সাধারণত সংগীত প্রধান নাটককে অপেরা বলা হয়। তবে অভিনয়ের একঘেয়েমি কাটানোর জন্য যে কোনো নাটকে গান সংযোজিত হয়ে থাকে। কিন্তু অপেরায় সমগ্র নাট্য কাহিনিই সংগীতের মাধ্যমে রূপায়িত হয়। এজন্য অপেরার কাহিনি ও চরিত্র পরিকল্পনা করতে হয় সংগীত উপযোগী করে। আধুনিককালে অপেরা খুবই কম রচিত হয়। দ্র. বদিউর রহমান, *সাহিত্য স্বরূপ*, পৃ. ১২২।

৩০. সৈয়দ বাদশাহ হোসাইন হায়দারাবাদি, *উর্দু মে ড্রামা নিগারি*, পৃ. ৭৮।

৩১. আতীয়া নাশ্‌শাত, *উর্দু ড্রামা রেওয়ায়েত আওর তাজরিবাহ*, পৃ. ৪৯; সৈয়দ বাদশাহ হোসাইন হায়দারাবাদি, *উর্দু মে ড্রামা নিগারি*, পৃ. ৭৭; মুশতাক আহমদ, *বাংগাল মে উর্দু ড্রামা*, পৃ. ১৭।

৩২. ইশরাত রহমানি, *উর্দু ড্রামা তারিখ ওয়া তানক্বীদ*, পৃ. ৮৫।

তিনি ১৮৪২-১৮৪৫ সালের মধ্যে রাধা কৃষ্ণের প্রেম-কাহিনি অবলম্বনে *রাধা কানাহইয়া* নামক নাটক রচনা করেন। যে নাটকটিকে সাধারণত *রহস* নামে আখ্যায়িত করা হত।[৩৩] এই নাটক *রহস* নামেই কায়সার বাগের রাজকীয় মঞ্চে প্রথম মঞ্চস্থ করা হলে খুবই জনপ্রিয়তা অর্জন করে।[৩৪] নাটকের প্রতি তাঁর এতবেশি ঝোঁক ছিল যে, তিনি শুধুমাত্র নিজেই নাটক রচনা করেননি বরং রাজমহলের অন্যান্য ব্যক্তিদেরকে নাটক রচনায় উৎসাহিত করতেন। তাঁর এই প্রবল নাট্যপ্রীতির কারণে সে সময় রাজকীয় ও সাধারণ নাট্যমঞ্চ তৈরীর এক মনোরম পরিবেশ সৃষ্টি হয়। তাঁর আন্তরিকতার কারণে উর্দু নাটক তৎকালীন সময়ে যথেষ্ট উন্নতি সাধন করে বলে তাঁকে উর্দু নাট্য সাহিত্যের প্রথম শিল্পী মনে করা হয়।[৩৫]

রহস নাটকটির গ্রহণযোগ্যতা ও জনপ্রিয়তা দেখে ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দে লক্ষ্ণৌতে আগা হাসান আমানত শাহ লক্ষ্ণৌভি [১৮১৫-১৮৫৯ খ্রি.] *ইন্দর সভা* নাটক রচনা করে মঞ্চস্থ করেন। দীর্ঘদিন এ নাটককে উর্দু সাহিত্যের প্রথম নাটক মনে করা হত। আধুনিক গবেষণায় তা ভুল প্রমাণিত হয়েছে। তবে এ কারণে নাটকটির গ্রহণযোগ্যতায় বিন্দু পরিমাণও ঘাটতি দেখা দেয়নি, বরং প্রচুর মঞ্চ সাফল্য পায়।[৩৬] কেননা, এটি সাধারণ নাট্যমঞ্চে পরিবেশিত প্রথম উৎকৃষ্ট কাব্যিক নাটক।[৩৭] নাটকটির জনপ্রিয়তা ও খ্যাতির কথা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লে পরবর্তীকালে অনেকে এ কাহিনিকে কেন্দ্র করে একই নামে একাধিক নাটক রচনা করেন। কিন্তু কেউই আমানত লক্ষ্ণৌভির মতো সাফল্য অর্জন করতে পারেননি।[৩৮] এসমস্ত নাটক রচয়িতাদের মধ্যে মুরারী লাল, আকবর এলাহাবাদী, জার্মানির Paul Lincke ও Friedrich Rosen-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[৩৯] আমানত লক্ষ্ণৌভির নাটকটি এমন জনপ্রিয়তা অর্জন করে যে, পরবর্তীকালে জার্মান, নাগরি, গুজরাটি, হিন্দিসহ ভারতবর্ষের বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হতে থাকে এবং তাঁরই জীবদ্দশায় বিভিন্ন শহরে প্রায় চল্লিশ বার প্রকাশিত হয়।[৪০] নাটকটির এই সফলতা উর্দু নাট্যসাহিত্যের এক নতুন দিক উন্মোচন করে। তিনি যদিও এ নাটক *রহস* নাটকে প্রভাবিত হয়ে রচনা করেছিলেন, কিন্তু *ইন্দর সভার* কোনো চরিত্র বা অংশ তা থেকে নেননি। বরং সবকিছুই তাঁর স্ব উদ্ভাবিত। এর যেমন রয়েছে সাহিত্যিক মান, তেমনি রয়েছে সাংস্কৃতিক মূল্য। এই উন্মেষ মূলত নাটককেই সমৃদ্ধ করেছে।[৪১]

---

৩৩. তদেব, পৃ. ৮৯।

৩৪. প্রফেসর মুহাম্মদ আসলাম কুরাইশি, *ড্রামা নিগারি কা ফন* (লাহোর: মজলিস-এ তারাক্কী-এ আদব, ১৯৬৩), পৃ. ৩৪; সালাম সান্দেলভি, *আদব কা তানক্বীদি মুতালেআ*, পৃ. ২৫৮।

৩৫. আতীয়া নাশ্‌শাত, *উর্দু ড্রামা রেওয়ায়েত আওর তাজরিবাহ*, পৃ. ৫৪-৫৮; আল্লামা সৈয়দ মুনীর আলী জাফরি, *জাদীদ উর্দু আদবীয়াত*, পৃ. ৩৬।

৩৬. সেলীম আখতার, *উর্দু আদব কী মুখতছরতেরীন তারিখ*, পৃ. ২৬১; প্রফেসর মুহাম্মদ আসলাম কুরাইশি, *ড্রামা নিগারি কা ফন*, পৃ. ৩৭।

৩৭. ইশরাত রহমানি, *উর্দু ড্রামা তারিখ ওয়া তানক্বীদ*, পৃ. ৯৮।

৩৮. মির্যা আদীব, 'ড্রামে কা ফন' *তানক্বীদি মাক্বালাত*, গদ্যাংশ, পৃ. ৫০০।

৩৯. সেলীম আখতার, *উর্দু আদব কী মুখতছরতেরীন তারিখ* , পৃ. ২৬৩।

৪০. সৈয়দ বাদশাহ হোসাইন হায়দারাবাদি, *উর্দু মে ড্রামা নিগারি*, পৃ. ৯৩-৯৪।

৪১. আতীয়া নাশ্‌শাত, *উর্দু ড্রামা রেওয়ায়েত আওর তাজরিবাহ*, পৃ. ৬০; আল্লামা সৈয়দ মুনীর আলী জাফরি, *জাদীদ উর্দু আদবীয়াত*, পৃ. ৩৬-৩৭; রামবাবু ছাহেব সাকসীনা, *তারিখ-এ আদব-এ উর্দু*, গদ্যাংশ, পৃ. ১৪৬-১৪৭।

রহস ও *ইন্দর সভা* নাটক দু'টির মঞ্চ সাফল্যে প্রভাবিত হয়ে কিছু সংখ্যক পারসি যুবক ইরানের বিভিন্ন প্রকার বীরত্বব্যঞ্জক যেমন, 'সোহরাব রুস্তম' জাতীয় কাহিনি অবলম্বনে নাটক রচনা এবং তা মঞ্চায়নের অনুপ্রেরণা লাভ করেন। ফলে এই জনপ্রিয়তাকে ভিত্তি করে ক্রমান্বয়ে উপমহাদেশের বিভিন্ন শহরে (যেমন: কলকাতা, ঢাকা, দিল্লি, লাহোর, জয়পুর, রামপুর, আগ্রা, আলীগড়, জাদবপুর, মীরাঠ, লক্ষ্ণৌ, হায়দারাবাদ, বোম্বে প্রভৃতি) পাশ্চাত্য থিয়েটারের ন্যায় অসংখ্য মঞ্চ বা 'থিয়োট্রিক্যাল কোম্পানি' প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তাতে এ জাতীয় কাহিনির নাট্যরূপ প্রদর্শিত হতে থাকে।[৪২] এই কাজে সর্বপ্রথম পূর্ব বাংলা (বর্তমান বাংলাদেশ) এগিয়ে আসার গৌরব অর্জন করে এবং এখানে সফলতার সাথে নাটক মঞ্চস্থ করতে থাকে। এ প্রসঙ্গে বিশিষ্ট নাট্য সমালোচক ইশরত রহমানী বলেছেন:

لطف کی بات یہ ہے کہ اردو ڈرامے کا سال آغاز بہ یک وقت ۱۸۵۳ء میں ہوا۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب اندر سبھا لکھنو اور اسکے مضافات میں کھیلا جارہا تھا اور اسکی دھوم اطراف وجوانب میں پھیلی ہوئی تھی اس زمانہ میں مشرقی بنگال کے دارالحکومت ڈھاکہ میں اردو ڈراما اسٹیج ہونا شروع ہوا اور پارسی تھیٹر کے اسٹیج پر اردو کا پہلا ڈراما بھی اسی سال کھیلا گیا۔[৪৩]

[মজার কথা হলো যে, উর্দু নাটকের সূচনা ১৮৫৩ সালে হয়েছে। ইতিহাস সাক্ষী আছে যে, যখন *ইন্দর সভা* লক্ষ্ণৌ ও তার আশেপাশে প্রকাশিত হয় এবং তার খ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে, তখন পূর্ব বাংলার রাজধানী ঢাকায় উর্দু নাটক মঞ্চস্থ করা শুরু হয় এবং একই সালে পারসি থিয়েটারের অনুকরণে উর্দু ভাষার প্রথম নাটক মঞ্চস্থ করা হয়।]

ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, যে সময় দিল্লি, লক্ষ্ণৌ, আজীমাবাদ এবং ভারতবর্ষের অন্যান্য শহরে উর্দু কবি-সাহিত্যিকরা প্রেমিকার চুল ও সৌন্দর্য নিয়ে গযল কবিতা রচনা নিয়ে ব্যস্ত, সে সময় পূর্ব বাংলার রাজধানী ঢাকায় শুধুমাত্র উর্দু নাটক রচনা হত না বরং সফলতার সাথে মঞ্চস্থও হত।[৪৪] উল্লেখ্য যে, পূর্ব বাংলায় (ঢাকায়) উর্দু নাট্যচর্চা আরম্ভ হওয়ার বহুপূর্ব [১৭৯৫/৯৬ খ্রি.] থেকে বেশ জাঁকজমকের সাথে বাংলা রঙ্গমঞ্চে বাংলা ভাষায় অনূদিত নাটক মঞ্চস্থ করা হতো। ঐ নাটকগুলো খুবই জনপ্রিয় ছিল। এ প্রসঙ্গে *Disguise, Love is the best Doctor* প্রভৃতি নাটকের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইংরেজি সাহিত্যের এ নাটকগুলো বাংলা ভাষায় অনুবাদ করে হেরাসিম লেবেডেফ নামক এক রুশদেশীয় উদ্যোগী নাট্যকার এদেশীয় সহযোগী গোলকনাথ দাসের সহায়তায় *Bengali Theatre* নামক নাট্যশালায় বাঙালি নটনটিনীদের দ্বারা মঞ্চস্থ করান।[৪৫] বিদেশিদের দেখাদেখি ধনাঢ্য বাঙালিরাও সেই সময়ে রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠা করতে থাকেন। এইসব রঙ্গমঞ্চে অনুবাদ নাটকই বেশি অভিনীত হতো। মূলত এসমস্ত বাংলা নাটকের জনপ্রিয়তা দেখে ঢাকার উর্দু ভাষাভাষীরাও নাটক লেখা এবং মঞ্চস্থ করার জন্য প্রাথমিকভাবে উৎসাহিত হন। অপরদিকে লক্ষ্ণৌর বিখ্যাত নাট্যকার আমানত লক্ষ্ণৌভির *ইন্দর সভা* ও নবাব ওয়াজেদ আলী শাহের *রহস* নাটকের মঞ্চ সাফল্যের কথা ঢাকায় ছড়িয়ে পড়লে একাজে তাঁরা আরও বেশি আশাবাদী হয়ে ওঠেন। সে সময় ঢাকার অধিকাংশ নাট্যকারই *ইন্দর সভা* নাটক দ্বারা বেশ প্রভাবিত হয়েছিলেন। কেননা, সে সময়ে ঢাকায় উর্দু ভাষার বেশ প্রভাব ছিল। এজন্য উর্দু ভাষাভাষী সম্প্রদায়ের লোকেরা বাংলা নাট্যমঞ্চের সাফল্য দেখে উর্দু নাটক মঞ্চস্থ করার

---

৪২. আল্লামা সৈয়দ মুনীর আলী জাফরি, *জাদীদ উর্দু আদবীয়াত*, পৃ. ৩৮; রামবাবু ছাহেব সাকসীনা, *তারিখ-এ আদব-এ উর্দু*, গদ্যাংশ, পৃ. ১৪৭।

৪৩. ইশরাত রহমানি, *উর্দু ড্রামা কা এরতেকা*, পৃ. ১২৫।

৪৪. মুশতাক আহমদ, *বাংগাল মে উর্দু ড্রামা*, পৃ. ২৫।

৪৫. মোতাহার হোসেন সুফী, *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসী*, পৃ. ২৭৫।

বাসনায় উদ্‌গ্রীব হয়ে ওঠেন। উপরন্তু ঢাকার তৎকালীন নবাব সৈয়দ মুহাম্মদ আযাদ ও মুর্শিদাবাদের কিছু সাহিত্যিক লক্ষ্ণৌ ভ্রমণ করলে *ইন্দর সভা*সহ অন্যান্য নাটক সভার জনপ্রিয়তা তাঁদের এ বাসনাকে আরও কয়েক গুণ বৃদ্ধি করে দেয়। আবার সে সময় ঢাকায় দীর্ঘদিন থেকে কানপুরের অধিবাসী শেখ ফয়েয বখশসহ লক্ষ্ণৌ ও কানপুরের বেশকিছু অভিনেতা ও নৃত্যশিল্পী বসবাস করত। যাঁরা পেশাজীবী হিসেবে ঢাকার বিভিন্ন হিন্দু ধনকুবেরদের বাসার নাচঘরে (রঙ্গশালা) অভিনয়, নৃত্য ও সংগীত পরিবেশন করত। প্রাথমিক অবস্থায় এসমস্ত অভিনেতা ও নৃত্যশিল্পীরাই কিছু বাংলা নাটক উর্দুতে অনুবাদ করে। অতঃপর নবাবের নির্দেশে শেখ ফয়েয বখশ ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে 'ফারহাত আফযা থিয়েট্রিক্যাল কোম্পানি' প্রতিষ্ঠা করেন এবং নাটক রচনার জন্য কানপুর থেকে মুনশি নবাব আলী নাফিস নামক জনৈক ব্যক্তিকে ডেকে আনেন। যিনি এ কোম্পানির জন্য নিয়মিত নাটক রচনা করতেন।[৪৬] তবে এ সময় যিনি ঢাকায় নাটক রচনা করে সর্বাধিক খ্যাতি অর্জন করেছিলেন, তিনি হলেন শেখ পীর বখশ কানপুরি। যিনি *ইন্দর সভা*'র অনুকরণে বেশ কয়েকটি নাটক রচনা করেন। যার মধ্যে *নাগর সভা* অন্যতম। এ নাটক খুবই জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। যদিও *নাগর সভা* নাটকটি *ইন্দর সভা*'র অনুকরণে লেখা, তথাপি উভয় নাটকের প্লট, চরিত্র প্রভৃতি পৃথক পৃথক ছিল। নাটকটি সে সময় শেখ ফায়েয বখশ-এর 'ফারহাত আফযা থিয়েট্রিক্যাল কোম্পানি'তে মঞ্চস্থ করা হয়। এই নাটক ছাড়াও অন্যান্য লেখকদের প্রায় বিশ-ত্রিশটি উর্দু নাটক কোম্পানিটি মঞ্চস্থ করে। যার মধ্যে কিছু নাটক এতবেশি গ্রহণযোগ্যতা ও খ্যাতি অর্জন করে যে, সেগুলো একাধিকবার জনসম্মুখে মঞ্চস্থ করা হয়। কেননা, এ কোম্পানির সাথে ভারতবর্ষের বিভিন্ন এলাকার অভিজ্ঞ নৃত্যশিল্পিরা জড়িত ছিল। *নাগর সভা* নাটকের মঞ্চ সাফল্য দেখে সে সময় ঢাকাতে আরো বেশ কটি 'থিয়েট্রিক্যাল কোম্পানি' প্রতিষ্ঠিত হয়।[৪৭] যে কোম্পানিগুলো *নাটক সাগর*, *হুসন আফরোয*সহ প্রভৃতি নাটক মঞ্চস্থ করে উর্দু নাটকের জনপ্রিয়তাকে কয়েকগুণ বৃদ্ধি করে তোলে। ফলে প্রত্যেক শ্রেণি বা দলের নৃত্যশিল্পিরা এসমস্ত থিয়েট্রিক্যাল কোম্পানির সাথে আগ্রহ সহকারে সম্পৃক্ত হয়ে পড়ে। যার কারণে নতুন নতুন চরিত্র সৃষ্টি ও নাটকের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির জন্য কোম্পানিগুলোর মধ্যে পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা লক্ষ্য করা যায়।[৪৮]

১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দের শুরু থেকে উর্দু নাটকের জনপ্রিয়তা ঢাকা শহরের বাইরেও ছড়িয়ে পড়ে এবং বিভিন্ন শহরে নতুন নতুন কোম্পানি প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। কিছু কিছু 'গাশতী' বা 'ভ্রাম্যমান' কোম্পানিও স্থাপিত হয়। যে কোম্পানিগুলো গ্রামে গ্রামে ভ্রমণ করে বিভিন্ন নাটক মঞ্চস্থ করত। এই ভ্রাম্যমাণ কোম্পানিগুলোর মাধ্যমে পূর্ব বাংলায় শুধুমাত্র উর্দু ভাষা উন্নতি করেনি বরং জনসাধারণের মনে উর্দু নাটক বিশেষ স্থান করে নিতে থাকে।[৪৯] উর্দু নাটকের এ উন্নতির যাত্রায় মুসলমানদের পাশাপাশি তৎকালীন প্রভাবশালী হিন্দু সমাজ বিশেষ করে পূর্ব থেকেই এ শিল্পের ওপর যাঁদের বেশ আগ্রহ ছিল, তাঁরা ব্যবসায়িক দৃষ্টিকোণ থেকে নিজেদেরকে শামিল করতে থাকেন। যেমন: ভগবতী বাবু, জাংকী বাবু, মতী বাবু, বিশেষ করে দুজন হিন্দু ধনকুবের পুতু বাবু ও রতু বাবু 'হুসন আফযা

---

৪৬. ইশরাত রহমানি, *উর্দু ড্রামা তারিখ ওয়া তানক্বীদ*, পৃ. ১০৮-১০৯।
৪৭. মুশতাক আহমদ, *বাংগাল মে উর্দু ড্রামা*, পৃ. ২৫-৩২।
৪৮. ইশরাত রহমানি, *উর্দু ড্রামা তারিখ ওয়া তানক্বীদ*, পৃ. ১০৯-১১০।
৪৯. মুশতাক আহমদ, *বাংগাল মে উর্দু ড্রামা*, পৃ. ৩০।

থিয়েট্রিক্যাল কোম্পানি' স্থাপন করে হাকীম হাসান মির্জা বরক লক্ষ্ণৌভি-এর *হুসন আফযা* এবং *গুলশান-এ জাঁফেযা* নামক নাটক দু'টি মঞ্চস্থ করে বেশ প্রশংসিত হন।[৫০]

মাস্টার আহমদ হাসান ওয়াফের ঢাকার একজন বিখ্যাত ও স্বনামধন্য নাট্যকার। *বিমার-এ বুলবুল* [১৮৫৬ খ্রি.] নাটক রচনা করার জন্য তাঁকে উর্দু সাহিত্যের প্রথম সারির নাট্যকারদের সাথে তুলনা করা হয়। নাটকটি ঢাকার নাট্যমঞ্চ, উর্দু নাট্য সাহিত্যের অবস্থান ও সাহিত্যিক মূল্যমান বৃদ্ধিতে মাইল ফলক হিসেবে কাজ করে। কেননা, ইতঃপূর্বে এখানে যত নাটক লিপিবদ্ধ হয়েছিল, তার সবই *ইন্দর সভা*'র অনুকরণে কাব্যাকারে ছিল। তিনিই প্রথম নাট্যকার, যিনি কাব্যের সাথে সাথে গদ্যকেও সংযুক্ত করেছেন। ফলশ্রুতিতে এই নাটকের মাধ্যমেই নিয়মতান্ত্রিকভাবে উর্দু মঞ্চ নাটকের ব্যাপক পরিবর্তন আসে। নাটকটি ১৮৬৭ সালে ঢাকার ইমামগঞ্জে মঞ্চস্থ করা হয়।[৫১] সাধারণ লোকের পাশাপাশি তৎকালীন ঢাকার নবাব সৈয়দ মোহাম্মদ আযাদ [১৮৪৬-১৯১৬ খ্রি.], নবাব স্যার আহসানউল্লাহ বাহাদুর [১৮৪৬-১৯০১ খ্রি.] এবং মির্যা ওলী জান কমর উর্দু নাটকের উন্নয়নে যথেষ্ট অবদান রেখেছেন। তাঁরা নাট্য সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতার পাশাপাশি বেশকিছু নাটক রচনা করে মঞ্চস্থ করেছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় বর্তমানে সৈয়দ মুহাম্মদ আযাদ-এর *নবাবী দরবার* [১৮৭৮ খ্রি.] ব্যতিরেকে অন্য কোনো নাটকের সন্ধান পাওয়া যায় না। ১৮৮৫ সালে নাটকটি মঞ্চস্থ করা হয়।[৫২]

১৮৫৭ সালের সিপাহি বিদ্রোহের কারণে লক্ষ্ণৌর নবাব ওয়াজেদ আলী শাহের ক্ষমতাচ্যুতি ঘটলে যথাযথ পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে সেখানে উর্দু থিয়েটার এবং স্টেজ ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যে সমস্ত উর্দু নাট্যকার ছিলেন, তাঁরাও বেকার হয়ে যান। কেননা, নবাবের অনুপস্থিতে রাজকীয় পৃষ্ঠাপোষকতা না থাকায় তাঁরা তাঁদের অবস্থান ও ইজ্জত হারিয়ে ফেলে। ফলে দ্রুত লক্ষ্ণৌ, কানপুর এবং বেনারস থেকে উর্দু নাট্যচর্চা প্রায় বিলুপ্ত হয়ে যায়। কিন্তু সে সময়েও প্রায় ১৯২০ সাল পর্যন্ত পূর্ব বাংলায় উর্দু নাট্যচর্চা আপন মহিমা ও গতিতে চলতে থাকে। ফলে নতুন করে এখানে প্রচুর কোম্পানি প্রতিষ্ঠিত হয়। তন্মধ্যে 'লায়ন থিয়েট্রিক্যাল কোম্পানি' এবং হিন্দু সম্প্রদায়ের নাচঘরের (রঙ্গশালা) মধ্যে লাল মোহন শাহের 'নাচ মন্দির' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[৫৩] মূলত ঢাকায় উর্দু নাটক ও মঞ্চের যে গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছিল, লক্ষ্ণৌর ভাগ্যে তা জুটেনি। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর শুরুর দিকে পাশ্চাত্য নাট্যমঞ্চের প্রভাবে সারা ভারতবর্ষে বিশেষ করে বোম্বে শহরে বেশকিছু বিখ্যাত থিয়েট্রিক্যাল কোম্পানি যেমন: 'বোম্বে থিয়েটার জাদীদ', অরিজিনাল থিয়েট্রিক্যাল কোম্পানি', 'ওল্ড পারসি থিয়েট্রিক্যাল কোম্পানি', 'শেক্সপিয়ার থিয়েট্রিক্যাল কোম্পানি', 'জমাদার থিয়েট্রিক্যাল কোম্পানি', 'ইম্পেরিয়াল থিয়েট্রিক্যাল কোম্পানি', 'ইন্ডিয়ান শেক্সপিয়ার থিয়েট্রিক্যাল কোম্পানি' প্রভৃতি স্থাপিত হলে এখানে উর্দু নাটকের প্রদীপ ক্রমান্বয়ে নিভে যেতে থাকে এবং বোম্বে উর্দু নাটকের কেন্দ্রভূমিতে পরিণত হয়। এ সময়ে অবশ্য বিশিষ্ট ঐতিহাসিক ও উর্দু সাহিত্যিক হাকিম হাবীবুর রহমান [১৮৮১-১৯৪৭ খ্রি.] কয়েকটি উর্দু নাটক রচনা করে এ শিল্পকে টিকে রাখার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি রক্ষা করতে পারেননি। ফলে আস্তে আস্তে আনুমানিক ১৯৩৫ সালের দিকে ঢাকায় উর্দু নাট্যচর্চা বন্ধ হয়ে

---

৫০. আল্লামা সৈয়দ মুনীর আলী জাফরি, *জাদীদ উর্দু আদবীয়াত*, পৃ. ৩৭; ইশরাত রহমানি, *উর্দু ড্রামা তারিখ ওয়া তানক্বীদ*, পৃ. ১১৩।

৫১. মুশতাক আহমদ, *বাংগাল মে উর্দু ড্রামা*, পৃ. ৩২; সেলীম আখতার, *উর্দু আদব কী মুখতছরতেরীন তারিখ*, পৃ. ২৬৪-২৬৫; ইশরাত রহমানি, *উর্দু ড্রামা তারিখ ওয়া তানক্বীদ*, পৃ. ১১৩।

৫২. মুশতাক আহমদ, *বাংগাল মে উর্দু ড্রামা*, পৃ. ৩২-৩৩।

৫৩. ইশরাত রহমানি, *উর্দু ড্রামা তারিখ ওয়া তানক্বীদ*, পৃ. ১১৫।

যায়। *গরীব হিন্দুস্থান* তাঁর উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক নাটক। এ নাটক তিনি মঞ্চস্থ করে বেশ সুনামও অর্জন করেছিলেন।[৫৪] পরবর্তীতে ঢাকা তথা বাংলাদেশে উর্দু ভাষায় আর তেমন একটা নাট্যচর্চা হয়নি। কেননা, বোম্বে শহরে পাশ্চাত্য নাট্যমঞ্চের অনুকরণে যে মানের থিয়েট্রিক্যাল কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল, অভিজাত শ্রেণির লোকেরা নাটক থেকে বিমুখ হওয়ায় অর্থের অভাবে সে মানের মঞ্চ তৈরি করা ঢাকার পক্ষে সম্ভব ছিল না। তবে ১৯৫০ সালের পরবর্তী সময়ে বেশকিছু উর্দু নাটকের সন্ধান পাওয়া যায়, কিন্তু সেগুলো গ্রন্থের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রয়েছে। কখনও মঞ্চায়িত করা সম্ভব হয়নি। সে নাটকগুলোর মধ্যে কাযী মুহীউদ্দীন বিক্রমপুরির *শকুনতলা*, *না ঘরকা না ঘাটকা*, চৌধুরী মুহাম্মদ ইসমাইলের *গুলযারে যরাফত ও সাআ'দত*, রাহাত আরা বেগমের *ডাকঘর* (ইহা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাটকের অনুবাদ) প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[৫৫] যাইহোক, বোম্বে শহরের মঞ্চ নাটকের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়লে পরবর্তীতে কলিকাতা, হায়দারাবাদ, দিল্লি, যাদবপুর, ফতেপুর, পাঞ্জাব, মীরাঠসহ সমগ্র ভারতবর্ষে থিয়েট্রিক্যাল কোম্পানি প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। এ সমস্ত কোম্পানির বদৌলতে উর্দু মঞ্চ নাটকের উন্নতির পথ অনেকটা প্রশস্ত হয়েছিল। তবে অষ্টাদশ শতকের শেষদিকে ভারতবর্ষে চলচ্চিত্র শিল্পের ব্যবহার আরম্ভ হলে মঞ্চ নাটকের গ্রহণযোগ্যতা ও জনপ্রিয়তা তুলনামূলকভাবে হ্রাস পেতে থাকে। তখন উর্দু নাটক তার প্লাটফর্ম পরিবর্তন করে নতুন আঙ্গিকে তথা সাহিত্যিক রূপ ধারণ করে সামনের দিকে পথ চলতে থাকে।[৫৬]

উপসংহার

উর্দু নাটক সম্পূর্ণ আধুনিক যুগে ইংরেজি সাহিত্যের প্রভাবে সৃষ্টি। অভিনয় শিল্পের ওপর ইসলাম ধর্মের বিধিনিষেধ থাকার কারণে প্রাথমিক পর্যায়ে উর্দু সাহিত্যের নাট্যজগৎ খুব একটা সমৃদ্ধ ছিল না। কিন্তু ভারতবর্ষে ইংরেজদের আগমন ও আধুনিক ইংরেজি সাহিত্যের প্রভাবে উর্দু নাটক ধর্মীয় সংকীর্ণতা থেকে বেরিয়ে আসে এবং আপন মহিমায় উন্নতির দিকে অগ্রসর হতে থাকে। আর একাজে সর্বপ্রথম ঢাকা তথা বাংলাদেশের হিন্দু-মুসলিম সম্প্রদায়ের কতিপয় ধনাঢ্য ব্যক্তি ও নবাবরা এগিয়ে আসেন এবং এ শিল্পের মঞ্চায়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। বিশেষ করে উর্দু গদ্য নাটকের ভিত্তি ভূমি হিসেবে ঢাকার ভূমিকা অপরিসীম। পরবর্তীতে পাশ্চাত্য রঙ্গমঞ্চের অনুকরণে বোম্বেসহ ভারতবর্ষের বিভিন্ন এলাকায় নতুন নতুন কিছু বিখ্যাত থিয়েট্রিক্যাল কোম্পানি প্রতিষ্ঠিত হলে অর্থনৈতিক সমস্যা এবং যথাযথ পৃষ্ঠপোষকতা না পাওয়ায় ঢাকায় উর্দু নাট্যচর্চা বন্ধ হয়ে যায়। তবে আমরা নিঃসন্দেহে এ কথা বলতে পারি যে, ঢাকায় উর্দু নাট্যচর্চা বন্ধ হলেও উর্দু মঞ্চর প্রাথমিক উন্নতিতে এ অঞ্চল যে অবদান রেখেছে, তা উর্দু সাহিত্য চিরদিন স্মরণ রাখবে।

---

৫৪. মুশতাক আহমদ, *বাংগাল মে উর্দু ড্রামা*, পৃ. ৩৪-৩৫।

৫৫. জাফর আহমদ ভুঁইয়া, *বাংলাদেশে উর্দু সাহিত্য* (ঢাকা: কামিয়াব প্রকাশন, ২০০৪), পৃ. ২০।

৫৬. সালাম সান্দেলভি, *আদব কা তানক্বীদি মুতালেআ*, পৃ. ২৬০-২৬১; রামবাবু ছাহেব সাকসীনা, *তারিখ-এ আদব-এ উর্দু*, গদ্যাংশ, পৃ. ১৫৩; সৈয়দ বাদশাহ হোসাইন হায়দারাবাদি, *উর্দু মে ড্রামা নিগারি*, পৃ. ১১৬-১২৬; ইশরাত রহমানি, *উর্দু ড্রামা তারিখ ওয়া তানক্বীদ*, পৃ. ১৭৮-২০৪।

ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ জার্নাল
সংখ্যা ২৩ (১৪২২ বঙ্গাব্দ)

লোকশিল্পী শাহ্ আবদুল করিম ও তাঁর সঙ্গীতচর্চা

আবুল হাসান চৌধুরী*

Abstract: Shah Abdul Karim was a prominent Baul singer in his time and also famous as living legend of Bangladesh. Karim was born on 15 February 1916 at Ujan Dhol village, Derai Thana, in Sunamganj District in Sylhet Division. He died in Sylhet on 12 September 2009. Growing up in poverty and facing hardship, he started expressing his thoughts and emotions musically from a very early age. Ektara, a traditional single string instrument has been his companion. As he was growing up, he received training on spiritual and Baul music from his livelihood. He awarded the 2001 Ekushey Padak for his outstanding musical achievements and from that time he attracted sights of the elites, intellectuals, writers, artists, Journalists and researchers. This article is homage to Shah Abdul Karim on his hundred year's birth anniversary, expressing contribution for mass people by his poetry.

ভূমিকা

শাহ আবদুল করিম (১৯১৬-২০০৯) বাংলাদেশের লোকসংস্কৃতির অঙ্গনে এমন একজন প্রবাদপ্রতিম লোককবি, কিংবদন্তিতুল্য গানপাগল বাউলশিল্পী কিংবা সঙ্গীতসাধক – যাঁকে নিয়ে গান ভালোবাসে এমন অতি সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে শিষ্ট সাহিত্য-সঙ্গীত জগতের বিশিষ্টজন, গবেষক, সংস্কৃতিকর্মী কারুরই আবেগ-উচ্ছ্বাস-আগ্রহের কমতি নেই। বিশেষ করে ২০০১ সালে একুশে পদক প্রাপ্তির পর এই আবেগ-উচ্ছ্বাসের মাত্রা এতোটাই বেড়েছে যে, সে আবেগের প্রাবল্যে নানা বিশেষণ এবং অভিধায় তাঁকে ভূষিতও করেছেন। খণ্ডিত ও অতিমূল্যায়নও করেছেন কেউ কেউ। কোনো কোনো সুযোগসন্ধানী তাঁর গানের জনপ্রিয়তাকে পুঁজি করে ব্যবসায়িক ফায়দা লুটতেও ছাড়েননি। তবে আশার কথা, ইতোমধ্যে দেশের বিশিষ্ট কয়েকজন খ্যাতনামা লেখক-গবেষক-লোকসংস্কৃতিবিদ তাঁর সৃষ্টিসম্ভারের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, যথাযথ মূল্যায়ন এবং সর্বোপরি তাঁর জীবনদর্শন বা জীবনার্থের স্বরূপ উন্মোচনে সীমিত পরিসরে হলেও কাজ করেছেন।[১] তাঁর গান একইসঙ্গে মানবীয় প্রেম ও অধ্যাত্ম

---

* অধ্যাপক, ফোকলোর বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

[১] ভীষ্মদেব চৌধুরী, "বাউল শাহ আবদুল করিমের জীবনার্থ," *প্রসঙ্গ শাহ আবদুল করিম*, সুমন কুমার দাশ সম্পাদিত (ঢাকা: কালিকলম প্রকাশনা, ২০১৩), পৃ. ২১।

প্রেমরস আস্বাদনের পুলক সৃষ্টিতে এবং দেশীয় ও সাম্রাজ্যবাদী শোষণ-নির্যাতন, অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী চেতনায় উদ্দীপ্ত করতে দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর অন্তরে এক অফুরন্ত অনুপ্রেরক শক্তিরূপে সক্রিয়। আবার অধ্যাত্ম কিংবা দেহতত্ত্বভিত্তিক সাধনার ক্রিয়া-করণ বিষয়ে কিছু মনঃশিক্ষামূলক গানও লিখেছেন তিনি। এমনকি জন্মনিয়ন্ত্রণ কেন করতে হবে, শাক-সবজি কেন ফলাতে হবে, ভালো লোককে কেন ভোট দিতে হবে, কিভাবে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করা যাবে এমন অনেক বিষয়েই সচেতনতা সৃষ্টিকারী গানও তিনি অনেক লিখেছেন। এসব গান শুধু লিখেই ক্ষান্ত হননি; গেয়েও বেড়িয়েছেন জনসমক্ষে। তাঁর জনসম্পৃক্তির এও একটা উল্লেখযোগ্য দিক। করিমের রচনাসমগ্র পাঠ করে আমাদের কাছে মনে হয়েছে তাঁর গান বাঙালির লোকসংস্কৃতির মৌল মানবীয় চারিত্রকে ধারণ করে। তাঁর শিল্পীজীবন সম্পর্কে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্তের মারফত এও বোঝা গেছে একজন দরাজকণ্ঠের লোকপ্রিয় গায়ক হিসেবে, হাওড়ের মতো বিশাল বড় মনের দরদি মানুষ হিসেবে তিনি ভাটি অঞ্চলে তো বটেই – দেশের অন্যত্র যেখানেই তাঁর বিচরণক্ষেত্র ছিলো, সেখানকার অধিকাংশ মানুষের প্রাণঢালা ভালোবাসা পেয়েছিলেন। ভালোবাসা পেয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর মতো অতি জনপ্রিয় জননেতাদেরও।[২] মোটকথা বাংলাদেশের সঙ্গীতপিপাসু মানুষের চিত্তজয়ী শাহ আবদুল করিম বাংলা লোকসঙ্গীতের এক অপরিহার্য প্রাণপুরুষ। এই অপরিহার্যতা নির্ণয়ে বর্তমান প্রবন্ধে আমরা তাঁর অবদান বা কৃতির বিশেষ কয়েকটি দিকের উপর আলোকপাত করতে চেষ্টা করেছি। তিনি প্রকৃতপক্ষে বাউলসাধক নাকি গণগীতিকার এমন একটা বিতর্কের মীমাংসা করার প্রয়াসও রয়েছে। সর্বোপরি বাংলা লোকসঙ্গীত সাধনায় শাহ আবদুল করিমের অবদান ও তাঁর সঙ্গীতপ্রতিভার মূল্যায়ন করাই বর্তমান প্রবন্ধের মূল লক্ষ্য। এ লক্ষ্য অর্জনে আমাদের প্রধান অবলম্বন হয়েছে তাঁর রচনাসমগ্র, বিভিন্ন সময়ে বেশ কয়েকজন সংস্কৃতিকর্মী ও সাংবাদিকের নেওয়া সাক্ষাৎকার। এ ছাড়া, বিশিষ্ট কয়েকজন লেখক-গবেষকের করিমকে নিয়ে লেখা ছোটো-বড় প্রবন্ধও তথ্যের গৌণ উৎস হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। উল্লেখ্য, শাহ আবদুল করিমের সঙ্গে বর্তমান প্রবন্ধকারের কখনোই সাক্ষাৎ আলাপের সুযোগ হয়নি। এ কারণে প্রাসঙ্গিক কোনো কোনো বিষয়ে করিমের একান্ত নিজস্ব বক্তব্য তুলে ধরবার জন্য প্রবন্ধকারকে পূর্বসূরি লেখক-গবেষকদের নেওয়া সাক্ষাতকারের উপর নির্ভর করতে হয়েছে।

দুই. জীবনকথা ও জীবনদর্শন

ভাটি অঞ্চল বলে পরিচিত সুনামগঞ্জ জেলার দিরাই উপজেলার ধল আশ্রম গ্রামে ১৯১৬ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি এক দরিদ্র কৃষক পরিবারে শাহ আবদুল করিম জন্মগ্রহণ করেন। পয়ার ছন্দে লেখা তাঁর 'আত্মস্মৃতি'-তে করিম জানিয়েছেন, 'তেরোশো বাইশ বাংলায় জন্ম আমার।/ মা বলেছেন ফাল্গুন মাসের প্রথম মঙ্গলবার ॥'[৩] তাঁর পিতার নাম ইব্রাহিম আলী আর মায়ের নাম নাইওরজান বিবি। এঁদের ছয় সন্তানের মধ্যে করিমই প্রথম এবং একমাত্র পুত্রসন্তান। তাঁর পিতামহের ছোটো ভাই নসিব উল্লা ফকির তাঁকে খুব ভালোবাসতেন। এই দাদার বাড়িতে-আসা ফকিরদের কাছে প্রথম শোনা 'ভাবিয়া দেখ মনে/ মাটির সারিন্দারে বাজায় কোন জনে' – বাউল গানটি তাঁকে দারুণভাবে আকৃষ্ট করে এবং

---

[২] শাহ আবদুল করিম, *শাহ আবদুল করিম রচনাসমগ্র* (সিলেট: খান বাহাদুর এহিয়া ওয়াকফ এস্টেট, ২০০৯)।

[৩] *শাহ আবদুল করিম রচনাসমগ্র*, পৃ. ৩০৮। অতঃপর করিমের গানের সকল উদ্ধৃতি তাঁর রচনাসমগ্র থেকেই দেওয়া হয়েছে এবং ব্র্যাকেটে পৃষ্ঠা নম্বরসহ শুধু 'রচনাসমগ্র' বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

পরবর্তীকালে বাউলিয়ানার দিকেই টেনে নিয়ে যায়। দারিদ্রের কারণে তাঁর পিতার পক্ষে ছেলেকে স্কুলে পাঠিয়ে লেখাপড়া শেখানো সম্ভব হয়নি। উল্টো জীবিকার তাড়নায় করিমকে অল্প বয়সেই অন্যের বাড়িতে গরু চরানোর কাজ নিতে হয়েছে। রাখালির কাজ করতেই করতেই শৈশবে দাদার কাছে শোনা গান গাইতেন তিনি। কিন্তু সে গানে পরিতৃপ্তি আসেনা বলে নিজে নিজে ছন্দ মিলিয়ে গান রচনা করেন। সে গান মাঠের রাখাল বন্ধু আর অন্য লোকজনকে শুনিয়ে তাদেরকে আনন্দে মাতিয়ে রাখেন। বর্ষা মৌসুমে রাখালির কাজ থাকেনা। তাই ধল বাজারে এক ভুসিমালের দোকানেও কাজ করেন করিম। যা পারিশ্রমিক পান তা পিতামাতার হাতে তুলে দেন। নিজে দুঃখী এবং দরিদ্র বলেই করিম তাঁর চারপাশের অভাবজর্জরিত বঞ্চিত মানুষের দুঃখ-দুর্দশার কথা মর্মে মর্মে অনুভব করেছেন। এদের প্রতি সমাজের সচ্ছল মানুষের অবহেলা ও উদাসীনতা তাঁকে পীড়িত করেছে সবসময়। মানুষ মানুষকে ভালোবাসবে তিনি এমনটিই প্রত্যাশা করেছেন।

প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষালাভের সৌভাগ্য করিমের হয়নি ঠিকই, তবে তিনি নিজেই নিজেকে শিক্ষিত করে তুলেছেন। হাতের কাছে পাওয়া নানা বইপত্র পড়ে অনেক জ্ঞান অর্জন করেছেন। তাঁর এ জ্ঞানের পরিধি আরো বাড়তে থাকে গ্রামের যাত্রাদলে যোগ দিয়ে। যাত্রাদলে গান গাওয়ার পাশাপাশি বিবেকের ভূমিকায়ও অভিনয় করেন। এ সময় তিনি ধর্মীয় পুঁথি-পুস্তক পড়ে যে জ্ঞান লাভ করতেন যাত্রাপালায় শ্রোতাসাধারণকে তার চমৎকার ব্যাখ্যা করে শোনাতেন। এতে শ্রোতারা মুগ্ধ হয়ে যেতো; মুগ্ধতা ছিলো করিমের গায়কীতেও। কৈশোর পেরিয়ে যৌবনে পদার্পণ করে তিনি সঙ্গীতের তাল-লয়-ছন্দ শেখার জন্য গ্রামের ওস্তাদ করম উদ্দিনের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। এই ওস্তাদের কাছেই করিম বাউল, ভাটিয়ালি, মুর্শিদিসহ অন্যান্য লোকগানেও পারদর্শী হয়ে ওঠেন এবং দ্রুতই একজন প্রতিভাবান শিল্পী হিসেবে নিজেকে পরিচিত করে তোলেন।[৪] ১৯৪৪ সালের দিকে করিমের বয়স যখন আটাশ বছর তখন একজন দরাজকণ্ঠের শিল্পী হিসেবে তাঁর সুনাম ছড়িয়ে পড়ে নিজ এলাকার গণ্ডি ছাড়িয়ে দূর দূরান্তরে।[৫] এ সময়েই গান গাওয়ার ব্যাপারে তাঁর শিল্পীজীবনে প্রথম সামাজিক বাধা আসে। ঈদের জামাতে নামাজ পড়তে গেলে গ্রামের কাঠমোল্লারা 'গান গাওয়া আল্লা-নবীর মানা' – এ ফতোয়া দিয়ে করিমকে গান ছেড়ে দেওয়ার জন্য তওবা করতে বলে। কিন্তু সুরের মাদকতায় যিনি একবার বিভোর হয়েছেন তাঁর পক্ষে কি আর গান ছেড়ে দেওয়া সম্ভব? তাই করিম মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে ভণ্ডামি করতে চাননি। সাহসিকতা ও সততার পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে বলেছিলেন:'ছাড়তে পারব না আমি নিজে যখন জানি।/ উপদেশ দিলে বলেন কি করে তা মানি॥/পরে করিব যাহা এখন বলি করবো না।/সভাতে এই মিথ্যা কথা বলতে পারব না॥' (রচনাসমগ্র, পৃ. ৫১৭)। অতঃপর তাঁকে কাফের আখ্যা দিয়ে গ্রাম ছাড়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। তাঁর বিরুদ্ধে গান গেয়ে পরিবেশ নষ্ট করাসহ বেশরা কর্মকাণ্ডের অভিযোগ এনে প্রচণ্ড মানসিক চাপের মধ্যে রাখা হয়। তখন তিনি পরিবারের সদস্যদের নিরাপত্তার কথা ভেবে গ্রাম ছেড়ে নিরুদ্দেশের পথে চলে যান।

গানপাগল শাহ আবদুল করিম গ্রাম ছাড়লেও গান ছাড়তে পারেননি। কেননা আশৈশব তাঁর মনোবাসনা হলো বাউলা হয়ে গান গাওয়ার। গানের টানেই অনেক গ্রাম-গঞ্জ ঘুরে তিনি চলে আসেন নেত্রকোনার বাইশচাপড়া গ্রামের স্বনামধন্য বাউলসাধক রশিদ উদ্দিনের বাড়িতে। সেখানে পাঁচ দিন অবস্থান করে বাউলতত্ত্ব ও সঙ্গীত বিষয়ে শিক্ষা নেন। রশিদ উদ্দিন তাঁর শিক্ষাগুরু। ইনিই ময়মনসিংহ

---

[৪] শামসুজ্জামান খান, "শাহ আবদুল করিম," *শাহ আবদুল করিম স্মারকগ্রন্থ*, সুমনকুমার দাশ সম্পাদিত (ঢাকা: অন্বেষণা প্রকাশন, ২০০৯), পৃ. ২৩।

[৫] সুমন কুমার দাশ, *শাহ আবদুল করিম জীবন ও গান* (ঢাকা: প্রথমা প্রকাশন, ২০১৫), পৃ. ১৫।

অঞ্চলে মালজোড়া বা প্রতিযোগিতামূলক বাউল গানের প্রচলন করেন এবং সাধারণ মানুষের কাছেও তা সমাদৃত হয়। করিমও তাঁর কাছে মালজোড়া বাউলগানের তালিম নিয়ে বিশেষ দক্ষতা অর্জন করেন। গুরুর আশীর্বাদ নিয়ে করিম চার মাসের জন্য ময়মনসিংহের বিভিন্ন অঞ্চল ঘুরে গান গেয়ে বেড়ান। এ সময়ে তাঁকে এক ফকির মুর্শিদভজনার পরামর্শ দেন এবং সে মোতাবেক তিনি সুনামগঞ্জ জেলার উকারগাঁও গ্রামের বিখ্যাত সাধক মৌলা বক্স মুনসীর কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেন। গানে বিভোর করিম ক্রমশ সংসারবিবাগী হয়ে ওঠেন। তাই বাবা-মা ছেলেকে বিয়ে দেওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েন। ১৯৪৫ সালে চণ্ডীপুর গ্রামের এক দূরসম্পর্কের মামাতো বোন কাঁচামালার সঙ্গে করিমের বিয়ে হয়। এ বিয়ে এক বছরও টেকেনি। ১৯৪৬ সালের মাঝামাঝি তিনি তাঁর প্রথমা স্ত্রীকে তালাক দেন।[৬] একজন আধ্যাত্মিক সাধকের কাছে বায়াত গ্রহণ করেও করিম শুধু সাধন-ভজন নিয়ে মশগুল থাকেননি; সমাজ-সংসারের নানা সমস্যা নিয়েও তিনি ভেবেছেন এবং তার প্রতিকারচিন্তাও করেছেন। সহজাতভাবেই তিনি অন্যায়-অত্যাচার, ও শোষণ-নির্যাতনের বিরুদ্ধে একজন প্রতিবাদী মানুষ। তাঁর যখন পূর্ণ যৌবনকাল তখন চলছে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসন। ইংরেজদের সীমাহীন শোষণ ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে করিম ছিলেন সোচ্চার। বিশেষত সে সময়ের হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা ও হানাহানির বিরুদ্ধে তিনি প্রতিবাদী হয়ে ওঠেন এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির গান রচনা করে তাঁর সমস্ত বিচরণক্ষেত্রে তা গাইতে থাকেন। প্রতিটি গানের আসরে তিনি শোষিত-বঞ্চিত মানুষের অধিকার ও শোষণমুক্তির কথা বলতেন, উচ্চারণ করতেন মানবমাহাত্ম্য আর মানবপ্রেমের শাশ্বত বাণী। করিম ঠিকই বুঝেছিলেন শাসকশ্রেণীর মন্ত্রণাতেই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বেধেছিলো। ১৯৪৭ সালে দ্বি-জাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে দেশবিভাগের পর পাকিস্তানি দুঃশাসনের বিরুদ্ধেও করিম প্রতিবাদ করেছেন গানে গানে।

১৯৪৮ সালে সুনামগঞ্জের রায় প্রেস থেকে শাহ আবদুল করিমের প্রথম গানের বই 'আফতাব সঙ্গীত' প্রকাশিত হয়। এতে মোট ৪০টি গান সংকলিত হয়। প্রথম বই প্রকাশের আনন্দ আসলে তিনি পেতে চান তাঁর আধ্যাত্মিক গুরু মৌলা বক্স মুনসীর হাতে বইটি তুলে দিয়ে। এ জন্য উকার গাঁওয়ে গুরুর কাছে ছুটে যান। বইটি হাতে নিয়ে মৌলা বক্স খুবই খুশি হন। এ সময় তিনি করিমকে পুনরায় বিয়ে করার জন্য পরামর্শ দেন। করিম মুর্শিদের নির্দেশ উপেক্ষা করতে পারেন না। তাঁর মুর্শিদেরই অন্যতম গুণগ্রাহী আসমুড়া গ্রামের আবদুর রহমানের কন্যা মমজান বিবি ওরফে বৈশাখীকে করিমের ভালো লাগে। এই ভালোলাগা থেকেই তিনি মমজান বিবিকে বিয়ে করেন। বিয়ের পর স্ত্রীর নাম দেন সরলা। সরলা সচ্চরিত্র এবং পবিত্রমনা। করিমের দৃষ্টিতে স্ত্রী তাঁর সরল বলেই সরলা এবং প্রকৃত জননী হওয়ার যোগ্য। এ সরলাকেই তিনি পরবর্তীকালে নিজের মুর্শিদস্বরূপ মনে করেছেন।

১৯৫১ সালের জুন মাসে মৌলা বক্স মুনসীর মৃত্যু হলে করিম যারপরনাই বিমর্ষ হয়ে পড়েন। পরে অবশ্য সিলেটের বিশ্বনাথ উপজেলার শ্রীপুর গ্রামের পীর ইব্রাহিম মস্তানের কাছে বায়াত গ্রহণ করেন। এ পীরের আশীর্বাদ নিয়ে করিম নয়া উদ্যমে আবার গান নিয়ে মেতে ওঠেন। ১৯৫২ সালের ২১-শে ফেব্রুয়ারি ভাষা আন্দোলনে উত্তাল হয়ে ওঠে গোটা দেশ। করিম ঐ সময় নেত্রকোনার বিভিন্ন অঞ্চলে গান গেয়ে বেড়াচ্ছিলেন। ঢাকায় পুলিশের গুলিতে কয়েকজন ছাত্র নিহত হলে একজন প্রতিবাদী মানুষ হিসাবে মঞ্চে উঠে প্রথমেই তিনি ঐ ঘটনার নিন্দা জানান। একজন মুর্শিদভক্ত বাউলসাধক হয়েও করিম ছিলেন সমাজ ও রাজনীতি সচেতন। ১৯৫৪ সালে তিনি আওয়ামী লীগে যোগ দেন এবং মুসলীম লীগবিরোধী অবস্থান নেন। এ সম্পর্কে তিনি নিজেই 'আত্মস্মৃতি'-তে বলেছেন:'কার কাছে কী বলিব মনে এল ভয়।/ তখন ছিল মুসলিম লীগের লুটপাটের সময়॥/ মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে ভূমিকা

---

[৬] সুমনকুমার দাশ, *শাহ আবদুল করিম জীবন ও গান*, পৃ. ১৭।

নিলাম।/ শোষকবিরোধী গানে সুর তখন দিলাম॥/ বিশ্বাস করে রাজনীতিতে মিশে পড়লাম।/ আওয়ামী লীগে তখন যোগদান করলাম॥'(রচনাসমগ্র, পৃ. ৫২৭) প্রাদেশিক আইনসভা নির্বাচনের প্রচারণা শুরু হলে যুক্তফ্রন্টের প্রার্থীদের সমর্থনে তৎকালীন পূর্বপাকিস্তানের বিভিন্ন এলাকায় করিম গণসঙ্গীত ও মালজোড়া বাউলগান পরিবেশন করেন। যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে জিতে সরকার গঠন করলে শেখ মুজিবুর রহমান দুর্নীতিদমন মন্ত্রী হন এবং সুনামগঞ্জ সফরে আসেন। সে সমাবেশে আবদুল করিম গণসঙ্গীত পরিবেশন করেন এবং শেখ মুজিবকে নিয়ে তাৎক্ষণিকভাবে একটি গান রচনা করে গেয়েছিলেন। গান শুনে মুগ্ধ আপ্লুত মুজিব করিমকে জড়িয়ে ধরেন এবং তাঁকে একশো টাকা দিয়ে সম্মানিত করেন। ১৯৫৫ সালে সিলেটের রেজিস্টারি মাঠে অনুষ্ঠিত জনসভায় হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গেও শাহ আবদুল করিমের পরিচয় ঘটে। জনসভার মঞ্চে করিম প্রায় গোটা দশেক গান পরিবেশন করেন। সোহরাওয়ার্দী নিবিষ্ট মনে করিমের গান শোনেন এবং নির্বাচনে জেতার পেছনে তার গানের অবদানের কথাও অকপটে স্বীকার করেন। আবার ১৯৫৭ সালে টাঙ্গাইলের কাগমারি সম্মেলনে গান গাওয়ার জন্য করিম সরকারিভাবে আমন্ত্রণ লাভ করেন। করিমের গণসঙ্গীতের ভূয়সী প্রশংসা করে শেখ মুজিবুর রহমান সম্মেলনে আগত অন্য নেতৃবৃন্দের সঙ্গে করিমকে পরিচয় করিয়ে দেন। একই মঞ্চে করিম সেদিন প্রখ্যাত কবিয়াল রমেশ শীলের সঙ্গেও গান করেন। রমেশও তাঁর গানের প্রশংসা করেন। মজলুম জননেতা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী সেদিন তাঁকে আশীর্বাদ করে বলেন: 'ব্যটা, গান ছাড়বে না, সাধনা চালিয়ে যাও। একদিন গণমানুষের শিল্পী হবে তুমি।'[৭]

বাউলসাধনার রীতি-পদ্ধতি মেনেই করিম দম্পতি জন্মনিরোধ করতেন। এ জন্য দীর্ঘকাল তাঁদের কোনো সন্তানাদি হয়নি। অবশ্য করিমের বাবা-মার একান্ত ইচ্ছা তাদের ঘরে নাতি-নাতনি আসুক। মুর্শিদের নির্দেশে বাবা-মাকে খুশি করার জন্য করিম সন্তান নিতে সম্মত হন। বিয়ের ষোলো বছর পর ১৯৬৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে সরলা এক পুত্রসন্তানের জন্ম দেন। এ ছেলের নাম নূরজালাল এবং করিমের একমাত্র উত্তরসূরি। নূরজালালও বাউলসাধনা ও সঙ্গীতচর্চা করেন।

মালজোড়া বাউল আর গণসঙ্গীতের একজন জনপ্রিয় শিল্পী হিসেবে শাহ আবদুল করিমের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে দেশের বাইরেও। এ কারণেই সম্ভবত ১৯৬৮ সালে ইংল্যান্ড সফরের আমন্ত্রণ পান সেখানকার প্রবাসীদের কাছ থেকে। সুনামগঞ্জের আরেক প্রখ্যাত বাউল দুর্বিন শাহকে সঙ্গে নিয়ে তিনি ইংল্যান্ডে যান এবং সেখানে টানা তিন মাস অবস্থান করেন। সেখানে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে গান গেয়ে প্রবাসী শ্রোতাদের পরিতৃপ্ত করেন।

দেশে ফেরার পর করিম গান নিয়েই থাকেন এবং সে গানের ভেতর থাকে গণ জাগরণের বাণী। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে সুনামগঞ্জের বিভিন্ন অঞ্চলে বঙ্গবন্ধুর সফরসঙ্গী হয়ে আওয়ামী লীগের প্রার্থীর সমর্থনে প্রচারণায় অংশ নেন । গান গেয়ে তিনি জনগণের কাছে ভোট চেয়েছেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় করিম তাঁর নিজ এলাকার মানুষকে সংগঠিত করে যুদ্ধে যাওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করেছেন। সিলেটের বিভিন্ন এলাকায় মুক্তিযুদ্ধের অনুপ্রেরণামূলক গণসঙ্গীতও পরিবেশন করেছেন। যুদ্ধশেষে ১৯৭২ সালে করিম সমাজসেবামূলক কাজেও হাত লাগান। উজানধল প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনের ব্যাপারে অন্যান্যদের সঙ্গে করিমেরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিলো।

---

[৭] সুমনকুমার দাশ, *শাহ আবদুল করিম জীবন ও গান*, পৃ. ২৩।

শাহ আবদুল করিমকে আমরা প্রধানত একজন বাউল ও গণশিল্পী হিসেইে জানি। তাঁর যে অন্য পরিচয় থাকতে পারে সেটি অনেকেরই অজানা। তিনি একজন নিপুণ কেচ্ছাকথকও ছিলেন। ১৯৮০-র দশকে বাংলাদেশ বেতারের অনুরোধে বেতারে অনেক কেচ্ছা পরিবেশন করেন।[৮]

১৯৮৪ সালে শাহ আবদুল করিমের বাবা ইব্রাহিম আলী মারা যান। পরের বছর তিনি প্রবাসীদের আমন্ত্রণে দ্বিতীয়বারের মতো বিলেতে যাবার সুযোগ পান। সেখানে আয়োজিত অনুষ্ঠানে গান গেয়ে সকলকে মুগ্ধ করেন। বিলেতের মানুষের সুশৃঙ্খল চাল-চলন, শান্তশিষ্ট স্বভাব, সদাচরণ, সেখানকার সুশাসন ইত্যাদি দেখে তিনি মোহিত হন এবং 'বিলেতের স্মৃতি' নামক গানে সেকথা সরলভাবে প্রকাশও করেন। অন্যদিকে বাংলাদেশের সীমাহীন ঘুষ-দুর্নীতি-অনিয়ম-উচ্ছৃঙ্খলতা করিমকে সবসময় পীড়া দিয়েছে। এসবের বিরুদ্ধে তাঁর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন নিজের গানের কথায়। গণমানুষের অধিকার হরণকারী স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধেও তিনি সোচ্চার ছিলেন। ১৯৮৬ সালে তৎকালীন স্বৈরাচারী এরশাদ সরকারের বিরুদ্ধে জনমত গঠনে জননেত্রী শেখ হাসিনা সিলেটের ভাটি অঞ্চল সফরে গেলে করিম তাঁর সফরসঙ্গী হয়ে বিভিন্ন জনসভায় গান গেয়ে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করেন। ১৯৯৫ সালে দিরাই বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ের মাঠে আওয়ামী লীগের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত শেখ হাসিনার জনসভায় করিমের আবারও গণসঙ্গীত পরিবেশনের সুযোগ হয়। গান শুনে মুগ্ধ হাসিনা তাঁকে উপযুক্ত সম্মান দেওয়ার অঙ্গীকার করেন। ২০০১ সালে একুশে পদক প্রদানের ভেতর দিয়ে শাহ আবদুল করিমকে সর্বোচ্চ সম্মান দেখানো হয় যা বাংলাদেশের কোনো বাউলশিল্পী এ পর্যন্ত লাভ করেননি।

শাহ আবদুল করিমের জীবদ্দশাতেই তাঁর মোট ছয়টি গানের বই যথাক্রমে *আফতাব সঙ্গীত* (১৯৪৮), *গণসঙ্গীত* (১৯৫৭), *কালনীর ঢেউ* (১৯৮১), *ধলমেলা* (১৯৯০), *ভাটির চিঠি* (১৯৯৮), *কালনীর কূলে* (২০০১) এবং ২০০৯ সালের ২২ মে প্রকাশিত হয় *শাহ আবদুল করিম রচনাসমগ্র*।

একজন সত্যসন্ধানী বাউলসাধক হিসেবে করিম আসল-নকল, সত্য-অসত্যের তফাৎ কী তা দেখিয়েছেন। শোষিত-বঞ্চিত ও নির্যাতিত গণমানুষের সার্বিক মুক্তির কথা তাঁর গানের বাণীতে প্রকাশিত হয়। তিনি সর্বদাই কৃষক-মজুর মেহনতি মানুষের দারিদ্রমুক্তি, স্বাধীনতা ও অধিকারের কথা ভাবতেন। সমাজে মৌলিক অধিকার ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত না হলে সাধারণ মানুষের সার্বিক কল্যাণ আসবে না, মুক্তি আসবে না, করিম তা বিশ্বাস করতেন। তাই সারাজীবন তিনি সত্য, ন্যায় আর স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম করে গেছেন। তিনি বাউলসাধক হিসেবে যেমন একজন মরমি ছিলেন তেমনি গণমানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠাকল্পে ছিলেন প্রতিবাদী এবং সংগ্রামী। ২০০৯ সালের ১২ সেপ্টেম্বর এই মহান বাউলসাধক ও গণশিল্পীর জীবনাবসান হয়।

তিন. বাউলসাধনা ও আবদুল করিমের বাউলিয়ানার স্বরূপ

গানের ভনিতায় শুধু 'বাউল আবদুল করিম' বলে নিজের পরিচয় দিলেও তাঁর ভক্তকুল ও বাউলপ্রেমী সংস্কৃতিমান অনেকের কাছেই তিনি 'বাউলসম্রাট' অভিধায় ভূষিত। কেউ তাঁকে বলেছেন,'ভাটির পুরুষ'।[৯] খ্যাতিমান বাউল গবেষক ও লেখকদের মধ্যে কেউ তাঁকে 'ভাটি অঞ্চলের গণগীতিকার'[১০] বলে অভিহিত করেছেন; কেউ বলেছেন, 'প্রাকৃত জনের কবি'[১১] আবার কেউ কেউ মনে করেন শাহ আবদুল করিম একইসঙ্গে 'লোককবি', 'মরমি কবি', 'চারণ কবি', সাধক কবি' আর 'বাউলকবি'-র এক

---

[৮] তদেব, পৃ. ২৬।

[৯] শাকুর মজিদ, "হুমায়ুন,ভাটির পুরুষ ও কিছু মুগ্ধতার গল্প," *প্রসঙ্গ শাহ আবদুল করিম*, পৃ. ৪০।

[১০] সুধীর চক্রবর্তী, *কত রঙের নকশি কাঁথা* (কলকাতা: পরম্পরা প্রকাশন, ২০১৩), পৃ. ৩৮।

[১১] যতীন সরকার, "প্রাকৃত জনের কবি," *শাহ আবদুল করিম স্মারকগ্রন্থ*, পৃ. ২৯।

সমন্বিত রূপ।[১২] এসব অভিধার মধ্যে করিমের প্রতি আবেগ, ভালোবাসা আর শ্রদ্ধার প্রকাশ যেমন আছে তেমনি কিছুটা অতিরঞ্জনও আছে। আবার তিনি কতখানি বাউল আর কতখানি গণগীতিকার এ নিয়ে সম্প্রতি চলছে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ আর বিতর্ক। অবশ্য 'কালনীর ঢেউ'-এর আত্মপরিচিতি মূলক একটি গানে নিজেকে তিনি 'বাউল ফকির' বলেই পরিচয় দিয়েছেন। (রচনাসমগ্র,পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০৮)। তাঁর জীবনাচরণ ও গীতিসম্ভারের বিষয়-বক্তব্য আর ভাববৈচিত্র্যের সঙ্গে যাদের অন্তরঙ্গ পরিচয় ঘটেছে তারা হয়তো মানবেন নিছক সংসারবিবাগী, আখড়া কিংবা আশ্রমনিবাসী হয়ে দেহখাঁচায় বন্দী অচিনপাখি শিকারি বা সন্ধানী বাউল তিনি নন। এক ব্যতিক্রমী বাউল বা বাউলা হিসেবে তিনি উপরি উল্লিখিত অভিধাগুলোর প্রায় সবকটি চারিত্র্যই কমবেশি ধারণ করেন।

করিম বাউলা হয়েছিলেন একেবারে তাঁর শৈশবে। পয়ার ছন্দে লেখা 'আত্মস্মৃতি' নামের খানিকটা লম্বাগীতে তিনি জানিয়েছেন, বিংশ শতাব্দীর শুরুতে সমাজব্যবস্থা দরিদ্রবান্ধব ছিলো না। এমন সমাজব্যবস্থা – যা দরিদ্রকে নিঃস্ব করে দেয়। করিমের জন্মের প্রাক্কালে দিরাই অঞ্চলে ফকিরি প্রথা চালু ছিলো। তাঁর পিতামহের এক ছেটো ভাই – যিনি তাঁকে খুবই স্নেহ করতেন। ফকিরি করা ছাড়া তাঁর জীবিকার আর কোনো ফিকির ছিলো না। এঁর সান্নিধ্যে থেকে শৈশবেই করিমের সংবেদনশীল মনের একতারায় গানের সুর ঝংকার তোলে। পিতামহের বাড়িতে আসা হিন্দু-মুসলমান ফকির সাধুদের মুখে শোনা 'ভাবিয়া দেখ মনে/ মাটির সারিন্দারে বাজায় কোন জনে' মরমি গানটি করিমকে একদম ভেতর থেকে আলোড়িত করে এবং এ আলোড়ন থেকেই করিম বলেন, 'একতারা হাতে নিয়ে একা গান গাই/ এক মনে চেষ্টা করি বাউল হতে চাই' (রচনাসমগ্র, পৃ. ১৪-১৬)। পরবর্তীকালে অন্য একটি গানে বলেছেন, 'মন মজালে ওরে বাউলা গান' (রচনাসমগ্র, পৃ. ২০৮)। গানে তিনি এমনভাবেই মজলেন যে, সারাজীবন নিজেই যেন সারিন্দা হয়ে বেজে গেলেন। এ গানের জন্যেই তিনি কট্টর শরীয়তপন্থী সমাজের কাছে অবাঞ্ছিত হয়ে ধল গ্রাম ছেড়ে চলে যান উজান ধলে। কারণ 'আর কিছু চায় না মনে গান ছাড়া/ গান গাই আমার মনকে বোঝাই/ মন থাকে পাগলপারা (রচনাসমগ্র, পৃ. ২০৭)। এ গানেই করিম আরো বলেছেন, 'গান আমার জপমালা/ গানে খোলে প্রেমের তালা/ প্রাণবন্ধু চিকন কালা/ অন্তরে কয় ইশারা।' মোটকথা গানই করিমের জীবন; তাঁর গানকে বাদ দিয়ে তাঁর তত্ত্বচিন্তা বা মনন-দর্শন কোনোটাই পুরোপুরি বোঝা যাবে না। গানের জগতে আসা এবং আসরে গান গাইতে গেলে কোনো সমস্যা হতো কিনা এরকম প্রশ্নের জবাবে একটি সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, 'গান তো মিশে গিয়েছিল অস্থিমজ্জায়, ক্যামনে থামি।...তবে একটা ব্যাপার ছিল তখোন। গানের দুশমন যত ছিল তার চেয়ে অনেক বেশি ছিল গানের ভক্তকুল। বাউল গানের আসর শুনলেই মানুষ আট/দশ মাইল পথ হেঁটে আসতো অনায়াসে। গানও শুনতো মানুষ খুব মনোযোগ দিয়ে। প্যান্ডেলের কোথাও কোন হট্টগোলের আভাস পাওয়া গেলে যখন মঞ্চে উঠে বলেছি 'গান শুনতে চান না ঝগড়া করবেন আপনারা? ওম্নি সব গোলমাল থেমে যেতো। এখন সেই ভক্তকুল নেই, সেই পরিবেশ নেই, সেই মানুষও নেই।'[১৩] এ সাক্ষাৎকথা থেকে অন্তত এটুকু বোঝা যায়, গান দিয়ে করিম শ্রোতাসাধারণের মন জয় করতে পেরেছিলেন এবং ভক্তকুলের কাছে তাঁর গ্রহণযোগ্যতা ছিলো প্রশ্নাতীত।

---

[১২] আবুল আহসান চৌধুরী, "পিঞ্জিরা ছাড়িয়া কখন পাখি যাবে উড়ে," *শাহ আবদুল করিম স্মারকগ্রন্থ*, পৃ. ৩৪।

[১৩] সুমন কুমার দাশ সম্পাদিত, *সাক্ষাৎকথায় শাহ আবদুল করিম* (ঢাকা: অন্বেষা প্রকাশন, ২০১০), পৃ. ১৮।

খ্যাতিমান বাউল গবেষক সুধীর চক্রবর্তী শাহ আবদুল করিমের বাউলিয়ানার বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করতে গিয়ে বলেছেন, 'আবদুল করিম এই অর্থে বাউল যে, তিনি লিখে আর গান গেয়ে দেশে দেশে (বিশেষত ভাটি অঞ্চলে) ঘুরেছেন। মুর্শিদের জয়গান করেছেন। সর্বহারা চিরদুঃখী মানুষ যাতে সহজভাবে বাঁচতে পারে তারই চেষ্টা করেছেন।'[১৪] 'তত্ত্বগান গেয়ে গেলেন যারা মরমি কবি/ আমি তুলে ধরি দেশের দুঃখ-দুর্দশার ছবি/ বিপন্ন মানুষের দাবি করিম চায় শান্তিবিধান' (রচনাসমগ্র, পৃ. ২০৮)। করিমের এই গানটির উদ্ধৃতি দিয়ে অনেকেই বলতে চান তিনি বাউলতত্ত্বকে তেমন গুরুত্ব দেননি। আসলে ধারণাটি ঠিক নয়। সাধারণভাবে সংসারবৈরাগ্য, মূল বা মহাজনের মাল হারানোর আপশোস,কামিনীকাঞ্চনের ধাঁধা, কামকুমিরের ভয়, ষড়রিপুর সঙ্গ ছাড়ার কথা করিমের অনেক গানেই আছে। বাউলতত্ত্বের এই সাধারণ জ্ঞানের বাইরে গভীর গুহ্যতত্ত্বও তিনি ভালোভাবেই জানতেন এবং বুঝতেন; একাধিক গানে তার নজিরও রয়েছে। এমনকি শাক্ত ও বৌদ্ধতান্ত্রিক ষটচক্রভেদের কথাও তিনি জানতেন। এ প্রসঙ্গে শুধু 'কালনীর ঢেউ'-এর দুটি গানের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে: 'আজব রঙের ফুল ফুটেছে/মানবগাছে/ চার ডালে তার বিশটি পাতা/ কী সুন্দর আছে।' এবং 'সাধন করো রে অভ্যাসে/ সময়ে কর্ম না করিলে হয় না কর্ম বেলাশেষে'(রচনাসমগ্র, পৃ. ৩৩৫,৩৪০)। এ দুটি গানের পূর্ণাঙ্গ পাঠ বিশ্লেষণ করলে আমরা যৌনযৌগিক যুগল সাধনা এবং যোগ, প্রাণায়াম ইত্যাদি সাধনার করণকৌশল সম্পর্কে করিমের যে দীক্ষা আছে তা বুঝতে পারবো। বাউলসাধকের জন্য সাধনসঙ্গিনী অপরিহার্য, তারা পঞ্চরসের কারবারি এবং গানবাদ্যকে ভালোবাসে। করিম এ সাধকদের জগতকে 'এমন এক রঙের দেশ আছে' উল্লেখ করে সে দেশে যাওয়ার বাসনা ব্যক্ত করেন এভাবে:

সেই দেশেতে যারা থাকে
দোষী কয় বিদেশী লোকে
স্ত্রীকে মা বলে ডাকে
জাতের বিচার সেই দেশে নাই ॥
খেলে তারা পঞ্চরসে
গানবাদ্যকে ভালোবাসে
আবদুল করিম ভাবছে বসে
কী করে সেই দেশেতে যাই ॥ (রচনাসমগ্র, পৃ. ৩৬১)

আবার কোনো কোনো গানে তিনি নারী বন্দনাও করেছেন এবং ফুল ও ভ্রমরের রূপকে প্রেমরসের কথা বলেছেন। যেমন – 'মেয়েরূপী ফুল ফুটেছে বিশ্ব-বাগানে।/এই ফুল বেহেস্তে ফুটিয়াছিল কুদরতি শানে।/...ফুটেছে ফুল নানা বেশে ফুলকে সবাই ভালোবাসে/ একটি ফুলের তিনটি রসে খেলে তিনজনে।/ পুরুষ ভ্রমরা জাতি দেখিয়া ফুলের জ্যোতি/ কেউ দিতেছে আত্মাহুতি মূল না জেনে।/ প্রেমরস চিনে না যারা আমার মতো কর্মপোড়া/ করিম কয় রসিক ছাড়া বোঝে না অন্যে ॥'(রচনাসমগ্র, পৃ. ৩৬২)। শাহ আবদুল করিমের কোনো গানেই পরকীয়া প্রেমতত্ত্বের কথা আমরা তেমন একটা শুনতে পাইনা; তাঁর কোনো সাধনসঙ্গিনী ছিলো কিনা তাও জানা যায় না তবে নিজের স্ত্রী সরলাকে তিনি মুর্শিদস্বরূপ মনে করতেন।[১৫] উল্লেখ্য তন্ত্র ও বাউল ব্যতিরেকে অন্য কোনো ধর্মে কোনো নারী ধর্মগুরু বা মুরশিদ হতে পারে না। আবার বাউলসাধনায় সাধারণ সংসারী মানুষের মতো প্রজনন বা বংশবিস্তার স্বীকৃত নয়। বাউল সাধনার রীতি মেনেই করিম জন্মশাসন করতেন; যে কারণে করিম

---

[১৪] সুধীর চক্রবর্তী, *কত রঙের নকশি কাঁথা*, পৃ. ৫১।

[১৫] টি এম আহমেদ কায়সার, "শাহ আবদুল করিমের সাক্ষাৎকার," *সাক্ষাৎকথায় শাহ আবদুল করিম*, পৃ. ১৭।

দম্পতির দীর্ঘকাল কোনো সন্তানাদি হয়নি এবং এতে স্ত্রী সরলার স্বীকৃতি ছিলো। পরে করিম তাঁর মুরশিদের নির্দেশে নিজ পিতামাতাকে খুশি করার জন্যে সন্তান নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন।[১৬] আরেকটি গানে মেয়েবন্দনা বা মাতৃবন্দনা করেছেন করিম এবং তাতে উপমা প্রয়োগের নতুনত্ব আমাদেরকে চমৎকৃত করে। যেমন – 'এয়ার কন্ডিশন মেশিন আছে/মায়ের কাছে/ মাইয়ায় কেউরে হাসায়/ কেউরে কাঁদায়/ কলের পুতুল কলে নাচে।...মাইয়াতে রয়েছে শান্তি/ ঠিক করে নেও ভাবকান্তি/ দূর হলো যার ভুল-ভ্রান্তি/ আঁধারে আলো জ্বলেছে' (রচনাসমগ্র: পৃ. ৭৩)। বাউল গানে কাম এবং প্রেম এমনভাবে জড়িয়ে থাকে যে তাকে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন করে ভাবা যায় না। সাধারণভাবে ভবপারে যেতে 'কামিনী-কাঞ্চনের' বাধা কিংবা 'কামকুমিরে' গ্রাস করার ভয় – এ ধরনের গান করিমও বেশকিছু লিখেছেন। যুগলসাধনা এবং এর সঙ্গে কামের সম্পর্ক বিষয়ে লালন, দুদ্দুশাহ প্রমুখ বাউলের মতো তেমন কোনো গান করিমের নেই। তবে বেশ কটি নিটোল প্রেমের গান আছে যেগুলো বৈষ্ণবীয় বা রাধাকৃষ্ণের প্রেমরসে পরিপূর্ণ। এ ক্ষেত্রে রাধাভাবে প্রেমতৃষ্ণার আকিঞ্চন এবং বিচ্ছেদ বা বিরহের হাহাকার ভরা গানই তিনি বেশি লিখেছেন। একজন বাউল হিসেবে করিম কখনোই প্রেমের মতো মধুর একটি মানবিক আবেগকে এড়িয়ে যেতে পারেননি। 'সখি কুঞ্জ সাজাও গো/ আজ আমার প্রাণনাথ আসিতে পারে/ মনে চায় প্রাণে চায় দিলে চায় যারে' এবং 'আমি ফুল বন্ধু ফুলের ভ্রমরা/ কেমনে ভুলিব আমি বাঁচি না তারে ছাড়া॥' (রচনাসমগ্র, পৃ. ৩৯০'৪০২) রাধাভাবের গান হিসেবে খুবই হৃদয়গ্রাহী। অন্যদিকে 'কেন পিরিতি বাড়াইলায় রে বন্ধু ছেড়ে যাইবায় যদি' একেবারে প্রাণের তন্ত্রী ধরে টান মারার মতো এ গানটি করিম লিখেছিলেন তাঁর প্রাণপ্রিয় স্ত্রী সরলার মৃত্যুর পরে। মানবিক প্রেমের অনির্বচনীয় আনন্দময় অনুভূতির প্রকাশে করিমের 'বসন্ত বাতাসে সই গো বসন্ত বাতাসে/ বন্ধুর বাড়ির ফুলের গন্ধ আমার বাড়ি আসে' গানটি অনন্যসাধারণ এবং এটি খুবই জনপ্রিয়। প্রেমাবেগ প্রকাশে শাহ আবদুল করিম সিলেট অঞ্চলে তাঁর পূর্বসূরি কবিদের মধ্যে সবচেয়ে প্রভাবিত হয়েছেন সম্ভবত রাধারমণের দ্বারা। বৃহত্তর সিলেটের মরমি কবিরা সবাই প্রেমের জয়গান করেছেন। অন্য স্বাতন্ত্র্য বা ভিন্নতা যতই থাকুক তাঁদেরই উত্তরসূরি করিমও শেষ পর্যন্ত একজন প্রেমিক কবিই।

মানুষই বাউল সাধনার কেন্দ্রবিন্দু। জাত-পাত-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে মানুষকে ভালোবাসাই মানবধর্ম। এই মানবধর্ম, মানবমাহাত্ম্যকীর্তন আর মানুষভজনা নিয়ে করিমের বেশকিছু গান আছে। 'ধর্মকে কীভাবে দেখেন?' – এরকম একটি প্রশ্নের জবাবে এক সাক্ষাৎকারে করিম একেবারে দ্ব্যর্থহীনভাবে মানবপূজা বা মানুষভজনার কথাই বলেছেন: 'আমি কখনোই আসমানী খোদাকে মান্য করি না। মানুষের মধ্যে যে খোদা বিরাজ করে আমি তার চরণেই পুজো দেই। মন্ত্রপড়া ধর্ম নয়, কর্মকেই ধর্ম মনে করি। লাখ লাখ টাকা খরচ করে হজ্জ পালনের চেয়ে এ টাকাগুলো দিয়ে দেশের দুঃখী দরিদ্র মানুষের সেবা করাটাকে অনেক বড় কাজ মনে করি।'[১৭] মানুষভজনা করতে গিয়েই তো একজন বাউলসাধক মানুষের দেহরহস্য উন্মোচন করতে চায়। করিমের গানে নৌকা আর গাড়ির রূপকে দেহের কথা এসেছে। 'গাড়ি চলে না চলে না' গানটিতে বেশ কটি ইংরেজি শব্দের প্রয়োগে কেউ কেউ নতুনত্ব দেখেছেন। ও রকম পাগলা কানাইও 'আজব জাহাজ'-এর রূপকে মানবদেহকে দেখেছিলেন। তাই এ গানটিতে অভিনবত্ব খুব আছে এটা বলা যাবে না। আমাদের বিবেচনায় 'কোন মেস্তরি নাও বানাইল কেমন দেখা যায়' গানটি করিমের দেহভাবনা এবং বিচিত্র মানবকুলের ভবনদী পারাপারের এক অনন্য মরমিভাবের প্রকাশ। এ ভাবনার পশ্চাৎভূমিতে আছে বিশাল-বিস্তৃত হাওড়ের

---

[১৬] তদেব, পৃ. ১৭।

[১৭] মোস্তাক আহমাদ দীন, "করিমের জীবনদর্শন ও গানের জগৎ," *প্রসঙ্গ শাহ আবদুল করিম*, পৃ. ৬৯।

বুকে রঙবেরঙের নৌকার 'ভাটি বাইয়া' যাওয়ার দৃশ্য আর নাওদৌড়ানি খেলার 'হারা-জিতা'র আনন্দ-বেদনা – যা করিমের নিজস্ব জীবনজিজ্ঞাসাকেই প্রকটিত করে।

বাউলের ঈশ্বর ভাবনাও প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম বিশ্বাসীদের মতো নয়। ধর্মশাস্ত্রে তাঁকে পাওয়া যায় না। করিম তাই তাঁর গানে বলেন: 'তন্ত্রমন্ত্র করে দেখি তার ভিতরে তুমি নাই/ শাস্ত্রগ্রন্থ পড়ি যত আরো দূরে সরে যাই/কোন সাগরে খেলতেছ লাই ভাবতেছি তাই অন্তরে॥'(রচনাসমগ্র, পৃ. ৩২৩)। সর্বময় পরিব্যাপ্ত ঈশ্বর বিশেষ কোনো উপাসনালয়ে থাকতে পারেননা, করিম সে কথাও তাঁর গানে বলেছেন: 'আল্লার বাড়ি মক্কাশরিফ/ বোঝে না মন পাগলে/ ব্যক্তি নয় সে শক্তি বটে/ আছে আকাশ পাতালে॥/ খোদে খোদা প্রতি ঘটে/ আল্লাহ আছে বিশ্বময়/ ক্বালবে মোমিন আর্শে আল্লা/ হাদিসে তার প্রমাণ রয়/ কী করে পাই তাঁর পরিচয়/ নিজে শুদ্ধ না হলে॥' (রচনাসমগ্র, পৃ. ৬৫)। করিমের এই সর্বেশ্বরবাদী চিন্তা একেবারে পরম্পরারহিত নয়; হাসন রাজা, জালাল খাঁ প্রমুখ মরমি সাধকদের গানেও প্রায়শ এমন অদ্বৈতবাদী চিন্তার প্রকাশ ঘটেছে – যা অনেকটাই ধর্মশাস্ত্রের মৌলবিশ্বাসের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। অনুমানে নয়, বর্তমানে বিশ্বাস বাউলদের এবং তারা প্রাচীন ভারতীয় বস্তুবাদী দার্শনিকদের মতো বেশ যুক্তিবাদীও। প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মচিন্তায় অলৌকিকে বিশ্বাস থাকবেই – যাতে সন্দেহ বা প্রশ্ন করাও পাপ এবং যুক্তিতর্কের আশ্রয় নেওয়াটা অনুচিত বলে মনে করা হয়। সেখানে শাহ আবদুল করিম ঈশ্বর ও অতিপ্রাকৃত সত্তার অস্তিত্ব সম্পর্কে বিজ্ঞানমনস্কতার পরিচয় দিয়ে বলেছেন: 'আমি ঈশ্বরকে এক বিশাল শক্তি হিসাবে গণ্য করি, ব্যক্তি হিসেবে নয়। ব্যক্তি কখনো একই সময়ে বিভিন্ন রূপে অবস্থান করতে পারে না, শক্তি তা পারে। ... আমি কোন অবাস্তব জিনিসে বিশ্বাস করি না। বেহেস্ত, দোজখ, দুই কান্ধে দুই ফেরেস্তা এগুলো আমার কাছে অবাস্তব মনে হয়। আল্লাহ নিজেই যেখানে কর্তা, তার তাহলে এতো কেরানী রাখার কী দরকার আমি বুঝে উঠতে পারিনি।'[১৮] করিমের এসব যুক্তিবাদী চিন্তাচেতনা তাঁকে এক ব্যতিক্রমী বাউল বলেই চিহ্নিত করে।

বাউলতত্ত্ব সম্পর্কে করিমের ধারণা ও বোধের পরিচয় আমরা তাঁর কথা থেকে হয়তো খানিকটা অনুধাবন করতে পেরেছি। বাউল গান সম্পর্কেও তাঁর নিজস্ব ব্যাখ্যা ও দৃষ্টিভঙ্গি আছে। গান তো শুধু একা গায়কের নয়; শ্রোতারও এবং তাঁদেরও সাধক-গুরু-গায়কদের চেয়ে তত্ত্বজ্ঞান বা রসবোধ একেবারে কম নয় – এ অভিজ্ঞতা আমরা কখনো কখনো বাউলগানের আসরে বসেই অর্জন করতে পারি। শাহ আবদুল করিমের যে অগণিত শ্রোতা ছিলো এবং এখনো আছেন, তাঁদের ভিতরে তিনি অনেক তত্ত্বজ্ঞানী শ্রোতার সন্ধান পেয়ে থাকবেন। তাই 'বাউলগানের স্থান কোথায়?' – এমন প্রশ্নের সহজ অথচ সাবলীল জবাব তিনি দেন এভাবে: 'আমি শুধু এটাই বলতে পারি, বাউল গান আমাদের দেশের মাটির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে মিশে রয়েছে। এসব গানের সুর কানে আসতেই এদেশের খেটেখাওয়া দিনমজুর ও গ্রামের সহজ-সরল মানুষগুলো প্রাণের টান অনুভব করেন।'[১৯] আর এই মানুষগুলোর সুখ-দুঃখের আজীবন সাথী হয়ে, দরদি ও সহমর্মী হয়েই তো তাঁর "'আত্মমানুষের' সীমারেখা পেরিয়ে তিনি পৌঁছে গিয়েছিলেন বহুর জনারণ্যে।"[২০] সেই 'বহুর' দুঃখ-দুর্দশা, দারিদ্র্য, বঞ্চনা আর শোষণ-নির্যাতন থেকে মুক্তির গান হলো করিমের গণগীতিসম্ভার।

---

[১৮] তদেব।

[১৯] সুমনকুমার দাশ, "হাওরের আফাল আমাকে বাউল বানিয়েছে," *সাক্ষাৎকথায় শাহ আবদুল করিম*, পৃ. ৪৪।

[২০] ভীষ্মদেব চৌধুরী, "বাউল শাহ আবদুল করিমের জীবনার্থ," *প্রসঙ্গ শাহ আবদুল করিম*, পৃ. ৩৩।

তিন. গণগীতিকার বা চারণকবি

শাহ আবদুল করিমের বাউলতত্ত্ব বা মরমি ধাঁচের গানের চাইতে গণসংগীতকেই বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন অনেকে। রাজনেতিক দর্শনের দৃষ্টিকোণ থেকে সাধারণভাবে আমরা সেই সংগীতকেই গণসংগীত বলে থাকি যে সংগীতে সংখ্যাগরিষ্ঠ শোষিত-বঞ্চিত, নির্যাতিত মানুষের প্রতিবাদের কথা থাকে, থাকে শোষণমুক্তির আহ্বান বা উদ্দীপনা। খ্যাতিমান লোকসংস্কৃতিবিদ শামসুজ্জামান খান গণসংগীতের 'গণ'-এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, ''গণ' বলতে এখানে অচেতন লোকসমাজ বা উদ্দেশ্যবিহীন 'জনতা'কে বোঝানো হয়নি। অধিকার সচেতন, প্রতিবাদী বা রাজনীতির ভাষায় 'শ্রেণীচেতনায়' উদ্বুদ্ধ বিপুল মানুষই 'গণ'।'[২১] এ প্রসঙ্গে গণসংগীতের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যায় আরো বলা হয়েছে, 'তবে...গণসঙ্গীতকে শুধু সীমিত সংখ্যক খর রাজনীতি সচেতন (Conscious political being) মানুষের গান বললে এ গানের মূল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যাবে। পল্লীবাংলা এবং শহর-বন্দর-গঞ্জের অধিকার সচেতন মানুষকে সংঘবদ্ধ ও জাগ্রত করে সমাজ পরিবর্তনের কাজে এ গান আবেদন সৃষ্টি করলেই এর পরিপূর্ণ সার্থকতা।'[২২] গণসঙ্গীতের এই সংজ্ঞা ও তার ব্যাখ্যা অনুযায়ী বলা যায়, জনগণের অধিকার আদায়ের দাবি ও অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদস্বরূপ শাহ আবদুল করিম রচিত অনেক গানই গণসঙ্গীতের পর্যায়েই পড়ে। সেগুলো সার্থকতায় পরিপূর্ণ হয়েছে কিনা সে সম্পর্কে কোনো স্বতঃসিদ্ধ সিদ্ধান্তে আসা যায় না। বিভিন্ন সময়ে রাজনৈতিক কর্মসূচির অংশ হিসেবে জনসভা বা জনসভা-উত্তর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে করিম যেসব গণসঙ্গীত গেয়েছেন তা সরাসরি রাজনীতি-সচেতন মানুষকে সংঘবদ্ধ ও উদ্বুদ্ধ করেছে সন্দেহ নেই। তবে নিয়তির মতো সুদীর্ঘকালের সামন্তবাদী, পুঁজিবাদী আর সাম্রাজ্যবাদী (করিম যাকে 'তিন ডাকাত' বলে অভিহিত করেছেন) শোষণ ও নিষ্পেষণে জর্জরিত ভাটিবাংলার হত দরিদ্র মানুষের নিস্তরঙ্গ জীবনকে করিমের গান কতখানি উজ্জীবিত কিংবা আলোড়িত করে সার্থকতা পেয়েছে সে প্রশ্ন অবান্তর নয়।

১৯৫৭ সালে প্রকাশিত 'গণসঙ্গীত'-এ আবদুল করিম মূলত পাকিস্তানি দুঃশাসন, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে বাঙালিদের বঞ্চনা, শোষণ-নির্যাতন আর অধিকারহীনতার কথা তুলে ধরেছেন। একইসঙ্গে ভুখা-নাঙা কৃষক-শ্রমিক-মজুরদের ক্ষুধার যন্ত্রণার কথা বলেছেন সরোষে, সোচ্চারে। ক্ষমতালিপ্সু স্বার্থান্ধ অত্যাচারী শাসক আর সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধেও করিম প্রতিবাদে মুখর হয়েছেন। ১৯৫৪-র নির্বচনী সভায় গান গাওয়ার আগেই তিনি আওয়ামী লীগে যোগ দিয়ে তৎকালীন মুসলিম লীগ-বিরোধী অবস্থান নিয়েছিলেন। করিম তাঁর গানে শোষিত মানুষের কথা তুলে ধরেন এবং জনগণকে উদ্বুদ্ধ করতে পারেন জেনেই দিরাই-জগন্নাথপুর আসনের প্রার্থী আবদুস সামাদ আজাদ তাঁকে গান গাইতে অনুরোধ করেন। 'আত্মস্মৃতি'-তে সেকথা করিম উল্লেখ করেছেন এভাবে:

আপনার এই গানগুলোর এখন দরকার।
উৎখাত করিতে এই মুসলিম লীগ সরকার ॥
আপনি আমার সব নির্বাচনী সভায়।
গান গাইবেন আপনাকে জনগণ চায় ॥
...
বক্তব্যের আসল কথা সহজ ভাষায় গাই।
সাধু কি চলিত ভাষা সেই বিচার নাই ॥
জনসভাতে গান যখন গেয়েছি।

---

[২১] শামসুজ্জামান খান ও কল্যাণী ঘোষ, *বাংলার গণসঙ্গীত* (ঢাকা: বিজয় প্রকাশ, ২০০৮) পৃ. ১২-১৩।
[২২] তদেব।

সভাতে উপযুক্ত সমর্থন পেয়েছি ॥
শোষিত শ্রেণীতে যখন জন্ম নিলাম।
জন্মগত প্রতিবাদী আমি ছিলাম ॥ (রচনাসমগ্র, পৃ. ৫৩০)

সে সময়কার দুর্ভিক্ষপীড়িত দরিদ্র মানুষের দুর্দশা, মুসলিম লীগের দুঃশাসনের কথা নানাভাবে করিমের গানে এসেছে। যেমন: 'এবারের দুর্ভিক্ষের আগুন লাগল কলিজায় রে/ প্রাণী যায় প্রাণী যায় রে॥/ এবারের দুর্দশার কথা কহন না যায়/ পেটের ক্ষুধায় কত লোকে লতা পাতা খায় রে ॥...সাত বৎসরের লীগ শাসনে এই দুর্দিন ঘটায়।/ বিশ্বাসঘাতক যুক্তফ্রন্টে দ্বিগুণ জ্বালায় রে ॥ (রচনাসমগ্র, পৃ. ৪৮৩) বাংলার মুসলমানদের পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্নভঙ্গ বা মোহমুক্তির কথা ব্যথাতুর চিত্তে গানের ভাষায় বলে যান তিনি: 'স্বাধীন, স্বাধীন কইয়া কত দুঃখ-ক্লেশ সহ্য করিয়া/ মোদের বুকের রক্ত দিয়া পাকিস্তান করলাম তৈয়ার/ ব্রিটিশ গেল রাজ্য ছাড়ি শান্তির আশা সবাই করি/ এখন কাক শৃগালের বাবুগিরি মোদের নাই রে অধিকার॥' (রচনাসমগ্র, পৃ. ৪৯০)। করিমের গানে পূর্ববাংলার মানুষের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসেনের দাবিও ছিলো: 'ও ভাই রে ভাই/ বাউল আবদুল করিম বলে/ পূর্ণ স্বাধীন চাই/ এক যদি সব হইতে পারি/ কারে বা ডরাই/ রে কৃষক মজুর ভাই॥' (রচনা সমগ্র, পৃ. ৪৮৬)। ভাষাশহীদদের প্রতিও করিম বিনম্র শ্রদ্ধা জানিয়েছেন: 'সালাম আমার শহীদ স্মরণে/দেশের দাবি নিয়া দেশপ্রেমে মজিয়া/ প্রাণ দিলেন যে সব বীর সন্তানে॥/ ভাষার দাবি লইয়া আপনহারা হইয়া/ স্মৃতি গেলেন রাখিয়া বাঙালির মনে/ সালাম বরকত জব্বার প্রিয় সন্তান বাংলার/ ভুলিবার নয় ভুলিব কেমনে॥'(রচনাসমগ্র, পৃ. ৪৫০)। শুধু ভাষাশহীদদের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন নয়, শাহ আবদুল করিম একাত্তরে বাংলাদেশের বীর মুক্তিযোদ্ধদের মনোবলবৃদ্ধি আর জাগরণের গানও গেয়েছেন: 'বলো স্বাধীন বাংলা মোদের/ মাতৃভূমির জয়/ প্রাণপণে প্রতিজ্ঞা কর ছেড়ে দাও মরণের ভয়॥...বাঙালি যুবকের দল/ চল মুক্তির সংগ্রামে চল/ তোরাই দেশের সহায়-সম্বল/ পাছে হটার সময় নয়।/ ধরো ধরো অস্ত্র ধরো/ বাংলা মোদের মুক্ত করো/ মনের দুর্বলতা ছাড়ো/আমাদের জয় সুনিশ্চয়॥'(রচনাসমগ্র, পৃ. ৪৫৯)। ভাষা আন্দোলন আর মুক্তিযোদ্ধাদের মূল্যায়ন করতে গিয়ে করিম একটি সাক্ষাৎকারে বলেছেন: 'মুক্তিযোদ্ধাদের আমি মূল্যায়ন করছি। আমার গান দিয়ে মূল্যায়ন করছি। মুখের বোল কাইড়া নিতগি যখন চায় এইটার জন্য প্রাণ দিছে তারা আমিও এইটারে সমর্থন করছি। আমি এটা চাই। আমরা বাঙালি হিসেবে আমার জাতীয় সংগীত ও ভাষা আমরা এইটার প্রাধান্য দিতাম চাই।... এ গান দিয়া তাদের চেতনা দিছি, সাহস যোগাইছি।'[২৩] করিমের এই সাক্ষাৎকার থেকে আমরা আরও জানতে পারি, তিনি বরিশালের চারণকবি মুকুন্দ দাসকে পছন্দ করতেন এবং স্বদেশি আন্দোলনের গান সম্পর্কেও জানতেন।

করিম আজন্ম দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করে ক্ষুধার যন্ত্রণা কী তা হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছেন। তাই তিনি বরাবরই দরিদ্র কৃষক-শ্রমিকদের পক্ষে কথা বলেছেন। তাদের দুঃখ-কষ্টের কারণ নির্ণয় করে তার বিরুদ্ধে গানে গানে প্রতিবাদ করেছেন। ধনী-গরীবের বৈষম্যের বিরুদ্ধে তিনি সোচ্চার ছিলেন। 'তিন ডাকাত' মিলে দেশের সম্পদ লুটে নেয় বলেই গরীবের পেটে ভাত, পরনে কাপড় আর রোগে ওষুধ জোটে না। এই একই কারণে গরীবের ছেলেমেয়েদের শিক্ষা অর্জনও হয় না: 'সাম্রাজ্যবাদ পুঁজিবাদ সামন্তবাদ মিলে/ দেশের সম্পদ লুটে নিল তিন ডাকাতের দলে॥/ উচিত কথা কইতে গেলে জেল জুলুমের ডর/ পেটে ভাত রোগে ঔষধ নাই, পরার নাই কাপড়॥/ স্কুলেতে ধনীর ছেলে ধনীর পড়া পড়ে/ গরিবের ছেলেমেয়ে অনাহারে মরে॥' (রচনাসমগ্র, পৃ. ৪৫৪)। ধর্মের দোহাই দিয়ে পুঁজিবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী শোষণ পাকা করার বিরুদ্ধেও করিম বিদ্রোহ করেছিলেন: 'ধর্ম গেল, সমাজতন্ত্র আসে যদি

---

[২৩] নিরঞ্জন দে যাদু, "করিমের মুখোমুখি," *সাক্ষাৎকথায় শাহ আবদুল করিম*, পৃ. ৬৩।

ভাই/ সমাজতন্ত্রের মধ্যে কোন ধর্মাধর্ম নাই/ আসবে দুর্নীতি॥/...ধর্ম রয় না, মাখন ছানা ধনী যদি খায়/ গরিব মরে অনাহারে ধর্মে ভালো পায়/ বড় মজার ব্যাপার॥/ মজার ব্যাপার, ধনতন্ত্রের নীতি থাকলে পরে/ ধর্ম বড় তাজা থাকে আমেরিকার জোরে/ এই তো মূলমন্ত্র॥' (রচনাসমগ্র, পৃ. ৪৫৬-৫৭)। স্বাধীন বাংলাদেশে শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন ছিলো করিমের কিন্তু তাঁর জীবদ্দশাতেই তিনি বুঝে গেছেন ঘরের ভিতে বাসাবাঁধা ইঁদুরের দলই দেশকে ছিবড়ে বানিয়ে ছেড়েছে। দেশের সম্পদ বিদেশে নিয়ে যাচ্ছে লুটেরার দল:

খবর রাখনি
উন্দুরে লাগাইছে শয়তানি ॥
...
বাড়িত কাটে বাড়ির বস্তু ক্ষেতে কাটে ধান
ঘরের ধন বাইরে নেয় ঘটাইছে নিদান ॥
ধান খায় চাউল খায় কাটে ঘরের বেড়া
কাটতে কাটতে গৃহস্থরে করে বাড়িছাড়া ॥
বাউল আবদুল করিম বলে উন্দুর আছে ঘরে
বিলাইয়ে ধরে না উন্দুর দুঃখ বলব কারে॥ (রচনাসমগ্র, পৃ. ৪৬৬)

করিমের পর্যবেক্ষণ হলো: 'কেবা শত্রু কেবা মিত্র /বুঝে উঠা দায়/ তাই তো দেশের অবনতি/ সাধুর নিশান চোরের নায়॥' আর চির পরাধীন গরিব গরিবই থাকে। এমনকি তাঁর কাছে মনে হয়েছে 'গরীব হয় খোদার দুশমন'। ভোটশিকারি ক্ষমতালোভী নেতারা চিরকাল গরিবি ঘোচানোর মিষ্টি কথা বলে আশ্বাসের মূলা দেখিয়ে যায়, কাজের কাজ কিছুই হয় না। ভাগাভাগি, বাটাবাটি আর লুটালুটির ভোটে করিম আস্থা রাখতে পারেননি। তাই মনের দুঃখে বলেছেন: 'ভোট দিবায় আজ কারে?/ ভোটশিকারি দল এসেছে নানা রঙ্গ ধরে/...দেশে আইল ভোটাভুটি পরে হবে বাটাবাটি/ তারপরে লুটালুটি যে যেভাবে পারে॥' (রচনাসমগ্র, পৃ. ৪৭১)। অন্য একটি গানে আরো বলেছেন: 'শোষকের শাসনব্যবস্থা যেখানে রয়েছে জারি/ ভোটে মুক্তি আসিবে না শুটকির নায় বিড়াল ব্যাপারি॥'(রচনা সমগ্র, পৃ. ৪৭৭)।

'গানের ভিতর প্রাণের কথা বলবার মনে চায়' – গরীব-কাঙালের পক্ষে করিম বলেওছেন তাঁর প্রাণের কথা গানে গানেই। তবে সে প্রাণের কথা তাঁর একার কথা নয়, তাঁর চিরদুঃখী ভাটি অঞ্চলের খেটে খাওয়া দরিদ্র মানুষের মনোকষ্টের কথা অকপটে বলেছেন। বিপন্ন এই মানুষগুলোর দুর্দশার জন্য মূলত শাসকগোষ্ঠীকেই দায়ী করেছেন তিনি। দেশের গান আর মেহনতি মানুষের গান করেন তিনি দেশের মানুষ আর দেশকে ভারোবাসেন বলেই: 'শাসক হইবে দায়ী নিজের বিচারে/ শান্তিতে এই দেশের মানুষ বেঁচে থাকতে চায়॥/...আমি বাংলা মায়ের সন্তান/ দেশকে ভালোবাসি বলে গাই স্বদেশী গান/ শোষণহীন সমাজব্যবস্থা আমার মনে চায়' (রচনাসমগ্র, পৃ. ৪৪২)। করিমের পক্ষে এমন একজন গণশিল্পী বা স্বদেশী গানের নিবেদিতপ্রাণ গীতিকার হয়ে-ওঠার পেছনে তাঁর আন্তরপ্রেরণাই সক্রিয় ছিলো বলেই মনে করেন কেউ কেউ:

> তিনি অনুভব করেন শুধু মরমী গান বা দেহতত্ত্বের গান নয়, তাঁর গানে আনতে হবে গণমানুষের দুঃখ-বেদনার কথা। তিনি বাউল শিল্পী। বাউলদের প্রতিষ্ঠানবিরোধিতা এবং ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে আঘাত করার যে ঐতিহ্য রয়েছে তিনিই হবেন তার এক শক্তিশালী ধারক। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই তিনি বাউল-মারফতি-মুরশিদী গানের সঙ্গে যুক্ত করলেন স্বদেশী

আন্দোলনের গানের ধারা। এভাবেই বাউলশিল্পী আবদুল করিম হয়ে উঠলেন গণসংগ্রামেরও এক নন্দিত শিল্পী।'[২৪]

শাহ আবদুল করিম মানবিক চেতনার বিকাশ এবং মানবাধিকার আদায়ের পক্ষে গণগীতি রচনা করে তাঁর দুর্লভ মানবজীবনের সর্বোত্তম ব্যবহার করেছিলেন। তিনি কোনো কট্টরপন্থী বাউল নন। শুধু দেহের মধ্যে 'মনের মানুষ' অন্বেষণ নিয়ে ব্যাপৃত ও মগ্ন থাকেননি, সমাজসংলগ্ন থেকে সমাজকে বদলানোর জন্যে জীবনব্যাপী সাধনা ও সংগ্রাম করেছেন। করিমের নিজের কাছেও তাঁর গণসঙ্গীতশিল্পী সত্তাই বড়ে মনে হয়েছে: 'আমি মূলত গণসংগীত শিল্পী। তারপর অন্যান্য পরিচয়। আমি আমার গানে বলেছি – 'শোষণের বিরুদ্ধে আমি শোষিতের গান গাই/ আপোসহীন সংগ্রাম করে বেঁচে থাকতে চাই।'এ গানটা শুধু আমার মুখের কথা নয়। বরং এটাকে আমি এতদিন ধরে জীবনপথের মূলমন্ত্র হিসেবে ভেবে এসেছি।'[২৫] নিজের জীবন ও গানকে মিলিয়ে করিমের এই যে সমাজভাবনা বা জনজীবনচেতনা তা তাঁর বাউলিয়ানা থেকে বিচ্ছিন্ন নয় মোটেই। কেননা 'বাউলদের জীবনই গান এবং গানেই জীবনের অভিব্যক্তি। তাই বাউলের ক্ষেত্রে সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ শুধু গান বা শুধু জীবন নিয়ে নয়, জীবন ও গানকে মিলিয়ে।'[২৬] শাহ আবদুল করিমের বেলায় বিশেষজ্ঞজনের এই বাউলব্যাখ্যা প্রযোজ্য বলেই মনে হয়।

চার. লোকজীবন ও সংস্কৃতির রূপকার

শাহ আবদুল করিমের গণগীতিতে গণমানুষের পক্ষে আন্দোলন-সংগ্রাম-প্রতিবাদের কথা এসেছে একদিকে নানা প্রাকৃতিক কারণে সৃষ্ট ভাটিবাংলার লোকজীবনের বিপর্যয়ে সহমর্মিতা অনুভব করে, অন্যদিকে মনুষ্যসৃষ্ট আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক কারণে শোষণ-নির্যাতনের প্রতিবাদস্বরূপ। তাঁর গণগীতিসমূহ বাদ দিলে প্রধানত 'ভাটির চিঠি', ও 'ধলমেলা' নামক পয়ার ছন্দে লেখা দীর্ঘ গানে হাওরপরিবেষ্টিত লোকজীবনের বাস্তব চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। বিশেষত তাঁর শৈশব-কৈশোরে দেখা ভাটি অঞ্চলের কৃষিনির্ভর জীবনের সুখ-শান্তি-স্বস্তির কথা যেমন বলেছেন তেমনি তাঁর গানে বার বার ঘুরেফিরে এসেছে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যের যন্ত্রণার কথা, আকাল, বন্যা আর খরাজনিত ফসলহানির কথা; কী করে অভাব নামক অজগরের ছোবল থেকে বেঁচে থাকবে মানুষ সেই দুশ্চিন্তার কথা। হাওড়ের দরিদ্র মানুষের জীবন-জীবিকার নানা সমস্যা, আশা ও স্বপ্নের কথা দিয়ে ভরা করিমের গান – যে গানকে 'জীবনসঙ্গীত' বললেও হয়তো অত্যুক্তি হয় না। এবং এই জীবনসঙ্গীত রচনার একটাই যেন উদ্দেশ্য – জনগণের মুক্তির পথ অন্বেষণ: 'আমি বলি আমার ভাবে আমি যাহা বুঝি।/ দুঃখে গড়া জীবন নিয়ে মুক্তির পথ খুঁজি॥ / মনে ভাবি শিক্ষাসম্পদ নাই যে আমার।/ করতে চাই না আকাশের নক্ষত্র বিচার॥/ প্রয়োজনে ভাটির চিঠি লিখতে যখন বসি।/ ভাবি আঁধারে কবে উদয় হবে শশী॥' (রচনাসমগ্র, পৃ. ১৭৭)। পল্লী অঞ্চলের এক সময়ের সুখের জনপদজীবনের বর্ণনায় 'শাক-সবজি দধি দুগ্ধ ঘৃত মাখন ছানা'-র কথা করিম বেশ কটি গানে উল্লেখ করেছেন। আর সে অল্পে তুষ্ট সরল জীবনে তেমন কোনো রাজসিক চাহিদা বা আয়োজন ছিলো না। করিম আরো জানাচ্ছেন শাক-সবজি, মাছ-ভাত আর রাধারমণের গানেই তৃপ্ত ছিলো ভাটির মানুষ। গানই যে ওই এলাকার মানুষকে আনন্দে ডুবিয়ে রাখতো

---

[২৪] শামসুজ্জামান খান, "শাহ আবদুল করিম," *শাহ আবদুল করিম স্মারকগ্রন্থ*, পৃ. ২৪।

[২৫] সুমনকুমার দাশ, "হাওরের আফাল আমাকে বাউল বানিয়েছে," *সাক্ষাৎকথায় শাহ আবদুল করিম*, পৃ. ৪৮।

[২৬] বিকাশ চক্রবর্তী, *বাউল জীবনের সমাজতত্ত্ব* (কলকাতা: প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ২০০৩), মুখবন্ধ দ্রষ্টব্য।

তার আরো সাক্ষ্য মেলে খরার দিনে 'বেঙ্গাবেঙ্গি' ও 'বাঘাই শিন্নি'র গানের কথায়। সে সঙ্গে গাজির গানের আসর বসতো বর্ষাকালে। ফাল্গুন মাসে ধল মেলার বিচিত্র আনন্দ-আয়োজনের কথাও বলেছেন কবি। তখন দ্রব্যমূল্য মানুষের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যেই ছিলো। অতিথি পাখির আগমনে হাওড়-বিল মুখরিত হয়ে উঠতো সেকথাও করিমের গানে উঠে এসেছে। আনন্দময় এ গ্রামীন জীবনের গাথায় করিমের পুলকিত প্রাণের অনুরণন শুনতে পাই বাল্যক্রীড়া আর মামার বাড়ি বেড়ানোর গল্পকথায়: 'ফুরু থাকতে যে খেইল খেলাইতাম/ পুয়া-পুড়ি বইয়া হাততালি দিয়া/ কেমন সুন্দর বিয়ার গান গাইতাম॥ /...মামুর বাড়ি যাইতাম দুধ-কলা খাইতাম/ রাইত অইলে নানির কোছো ঘুমাইতাম/ লুকালুকি খেলাইতাম আমি যখন লুকাইতাম/ টুকাইয়া না পাইলে টুল্লুক দিতাম॥' (রচনাসমগ্র, পৃ. ২১০)। আগের দিনের সবচেয়ে সুন্দর, সৌহার্দ্যপূর্ণ আনন্দময় গ্রামীন জীবনের স্মৃতিচারণ শোনা যায় করিমের বহুশ্রুত, অসাম্প্রদায়িক মানসিকতার সকল গান পাগল মানুষের মুখে মুখে-ফেরা গানটিতে: 'আগে কী সুন্দর দিন কাটাইতাম/ গ্রামের নওজোয়ান হিন্দু-মুসলমান/ মিলিয়া বাউলা গান আর ঘাটু গান গাইতাম॥' (রচনাসমগ্র,পৃ,২১০)। এ ছাড়া 'ভাটির চিঠি'তে সুখের বা আনন্দের কথা খুব কমই আছে। এরপর বানভাসি মানুষের বিপন্ন দৈনন্দিন জীবনের কথা, বনভূমি উজাড় হওয়ায় পরিবেশ বিপর্যয়ের কথা, ভূমিহীন ক্ষেতমুজুর আর ঋণে জর্জরিত দরিদ্র কৃষকের দুর্দশা, জলমহল ধনী লোকের মালিকানায় চলে যাওয়ায় মাঝিমাল্লা ও মৎজীবীদের অচলপ্রায় জীবন, ক্ষমতার মালিকের কাছে কৃষকের ফসল রক্ষার নিবেদন ইত্যাদি সমস্যার কথা একে একে তুলে ধরেছেন কবি। হাওড়ের শিক্ষাসমস্যা, রোগবালাই, অর্থলোভী ব্যবসায়ীদের মজুদদারি, শ্রেণীবৈষম্য, ভোটের রাজনীতির ফাঁকি, ন্যায়বিচার না পাওয়ার ভোগান্তি, মামলা-মোকদ্দমা, টাউট-বাটপারদের কারসাজি, গরীবের ঘোড়ারোগ কিংবা ঋণ করে ঘি খাওয়ার কথাও করিম খানিকটা ক্ষোভের সঙ্গে উল্লেখ করেন। এমনকি অরক্ষিত গো-সম্পদ কিংবা রান্নার কাজে লাকড়ির অভাবের কথাও বাদ যায় না। নিত্যদিনের অভাব আর অনাহারক্লিষ্ট কৃষক-দিনমজুরদের জীবনে কিছুটা স্বস্তি আসে ভালো ফসল হলে আর খরা-বন্যায় সে ফসল বিনষ্ট যদি হয় তাহলে প্রাণে বাঁচাই দায়: 'এবার ফসল ভালো দেখা যায়-বা চাচাজি/ এবার ফসল ভালো দেখা যায়/ ফাল্গুনে বর্ষিল মেঘ/জমি যাহা চায়-বা চাচাজি॥/ ফসলের নমুনা দেখলে/ পেটের ভুক পালায়/ ধনী-গরীব সকলের মনে/ ভরসা জাগায়-বা চাচাজি॥' (রচনাসমগ্র, পৃ. ১৪৯) আবার, 'দিরাই থানায় বসত করি হাওর এলাকায়/ অবস্থা চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা দায়॥/ হাড়ভাঙ্গা খাটুনির বলে জমিতে যে-ফসল ফলে/ হয়তো নেয় বন্যার জলে নইলে নেয় খরায়॥/ মাথার ঘাম পায়ে ফেলে বছরে এক ফসল মিলে/ সে ফসল নষ্ট হইলে প্রাণে বাঁচা দায়॥'(রচনাসমগ্র, পৃ. ১৪৯, ২১৩)।

শাহ আবদুল করিম এমন একজন লোককবি ছিলেন যিনি শুধু লোকজীবনের দুঃখের গানই শোনাননি, সংসারের আপাত তুচ্ছ অথচ অম্লমধুর বিষয়ও তাঁর গানে সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। এক সময় গ্রামের বিবাহিত মেয়েদের বাপের বাড়িতে নাইওর যাওয়া একটা অতি কাঙ্খিত আনন্দের ব্যাপার ছিলো। তবে শ্বশুরবাড়ির লোকেরা নির্দয় হলে কিংবা স্বামী না চাইলে যাওয়া সহজ হতো না। নারী-পুরুষ দ্বৈতকণ্ঠে গেয় এমন দাম্পত্য কলহের গানও করিম লিখেছেন। বাইরে থেকে কলহের মতো শোনালেও আসলে তা দাম্পত্য প্রেমেরই গান। যেমন:

পুরুষ: খালি বাড়ি থইয়া নাইওর যাইতে দিব না।
নারী: তুমি ইতা কিতা কও, আমি কিছু বঝি না
আষাঢ় মাসে নাইওর যাইতে কে করে মানা॥

... ...

পুরুষ: তুমি আমি দুইজন মাত্র ঘর ভরা জিনিসপত্র
মোরগরে কে গুড়া দিত, আমি ইতা পারি না
খালি বাড়ি থইয়া নাইওর যাইতে দিব না॥
নারী: আম খাইমু কাঁঠাল খইমু নয়া একখান কাপড় পাইমু
ভাই-বইনরে দেইখ্যা আইমু আমার কি মনে চায় না?
... ...
পুরুষ: নাইওর যদি যাইতে চাও কুনদিন আইবায় কইয়া যাও।
নারী: আনতে যদি তুমি না যাও আমি ইবার আইতাম না
আষাঢ় মাসে নাইওর যাইতে কে করে মানা॥ (রচনাসমগ্র, পৃ. ৪৩৩)

আরেকটি গানে কিছিুটা কৌতুক বা রঙ্গরসের ছলে, সমর্থ হওয়ার আগেই বিয়ে করা এবং অধিক সংখ্যায় ছেলেমেয়েতে ভরা অভাবী সংসারের বিড়ম্বনার কথা তুলে ধরেছেন কবি: 'ভালা মানুষ পাগল হইলাম/ বউ ঘরে আইন্যা॥/...বাড়ি ভরা পুয়া-পুড়ি/ খাইতে শুইতে হুড়াহুড়ি/ আগে করতাম বেটাগিরি/ এখন চলি মাইন্যা/ বিয়া করলাম গো না জাইন্যা॥...আবদুল করিম ভাবে এখন/ আগের কথা করে স্মরণ/ আমরা যখন ছিলাম দুইজন/ এন্ডা খাইতাম ভুইন্যা/ বিয়া করলাম গো না জাইন্যা॥' (রচনাসমগ্র, পৃ. ৪৩৫)

এভাবেই করিম তাঁর নিজের ভাষায়, নিজের ভাবে জনগণের সুখ-দুঃখের গান শোনান। এ গান সম্পর্কে স্বতঃস্ফূর্ততা আর আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে অবলীলায় তিনিই বলতে পারেন: 'এই গান সরলপ্রাণ সবাই ভালোবাসে।/ সমাজের ভেতরের ছবি বাহির হয়ে আসে॥/ লোকসঙ্গীত জনগণের সুখদুঃখের গান।/ পূর্বে ছিলো আজো আছে বর্তমান॥'(রচনাসমগ্র. পৃ. ৫৩৪)। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'বাউলের গান' নামক প্রবন্ধে বলেছেন, 'যে ব্যক্তি নিজের ভাষা আবিষ্কার করিতে পারিয়াছে, যে ব্যক্তি নিজের ভাষায় নিজের কথা কহিতে শিখিয়াছে, তাহার আনন্দের সীমা নাই।'[২৭] বোধ করি শাহ আবদুল করিমও তাঁর নিজের ভাষায় নিজের দেশের মানুষের কথা বলতে পেরে সীমাহীন আনন্দ লাভ করে গেছেন।

পাঁচ. উপসংহার

শাহ আবদুল করিম কতখানি বাউল আর কতখানি সমজসচেতন গণসঙ্গীতকার অথবা তিনি আদৌ বাউলমার্গের সাধককবি ছিলেন কি-না, এ নিয়ে দেশের সংস্কৃতিবান বিদ্বজ্জন থেকে শুরু করে বাউলতত্ত্ব বোঝেন বা বাউলগান ভালোবাসেন এমন সাধারণ মানুষের মধ্যেও বিস্তর মতপার্থক্য ও বিতর্ক বিদ্যমান। তিনি তাঁর গানের ভণিতার সর্বত্রই শুধু 'বাউল আবদুল করিম' বলে নিজের পরিচয় দিয়েছেন। এতে অহংবোধ বা আত্মগরিমা বলে কিছু নেই। দেশের আরো অনেক বাউলের মতো তিনিও একজন বাউল। তাঁর গানের গুণেই তিনি জনপ্রিয়তার তুঙ্গে উঠেছেন – এটি তাঁর অর্জন। বাউল গান বিশেষত মালজোড়া বাউলগান ও তার শ্রোতা সম্পর্কে 'আত্মস্মৃতি'তে করিম লিখেছেন:'বাউলগণ রঙ্গরসে গায় বাউল গান/ শুনতে আসে ধনী-গরিব হিন্দু-মুসলমান॥/ কথা প্রধান বাউল গান বুঝতে সবাই পারে/ প্রাণ খুলে গায় যে জন ভালোবাসে তারে॥'(রচনাসমগ্র, পৃ. ৫২০)। তিনি সারাজীবন প্রাণ খুলে সহজ কথায় বাউলা গান আর গণসঙ্গীত গেয়ে গেছেন বলেই শ্রোতাসাধারণের মন জয় করতে সক্ষম হয়েছেন। অন্যদিকে ব্যক্তিমানুষ হিসেবে আমরা করিমের যেটুকু পরিচয় পেয়েছি তাতে তাঁর মহত্ত্বের পরিচয় তাঁর মানবপ্রেম বা মানুষ ভজনায়; আত্মস্বার্থের চেয়ে সমষ্টিস্বার্থকে বড় করে দেখায়। করিম 'চাচা আপন জান বাঁচা' কিংবা 'আপনি বাঁচলে বাপের

[২৭] আবদুশ শাকুর, *রবীন্দ্রজীবন* (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০১২), পৃ. ৪২১।

নাম' নীতিতে বিশ্বাসী নন। কারণ সবার মনে মনে যদি ওই নীতি থাকে তাহলে জাতির উন্নতি হবে কী করে? তিনি সবাইকে নিয়ে বাঁচতে চান, ভালো থাকতে চান। গানের ভাষায় তাঁর এ মনোভাবের প্রকাশ ঘটেছে এভাবে: 'ভাঙ্গাগড়া দেখলাম কত লীলার অন্ত নাই।/ চাচা আপন জান বাঁচা – এই দেশে তো তাই/ আমরা নয় – আমি শুধু সবার মনে মনে/ জাতির উন্নতি তবে হইবে কেমনে॥' (রচনাসমগ্র, পৃ. ১৯৫)। করিমের গানরচনা ও গাওয়ার ইতিহাস প্রসঙ্গে 'কালনীর ঢেউ'-এর ভূমিকায় সিলেটের আরেক কৃতি সন্তান কবি দিলওয়ার যথার্থই বলেছেন: 'এটা কোনো গর্বোদ্ধত রাজদণ্ডের ইতিহাস নয়, এ হচ্ছে মানবতার জন্য একটি রাজসিক চিত্তের অনুপম উপাখ্যান'(রচনাসমগ্র, পৃ. ৫৩৮-৫৩৯)। বিশিষ্ট গবেষক-লেখক যতীন সরকার গ্রামীন কৃষিজীবী ও অন্যান্য বৃত্তিজীবীদের মধ্য থেকে উঠে-আসা কবিদেরকে বাংলা কবিতার মূলধারার কবি বলেছেন এবং শতকরা নব্বইজন মানুষ ওই কবিদের গান-কবিতার উপভোক্তা বলে উল্লেখ করেছেন।[২৮] এ বিবেচনায় শাহ আবদুল করিম একজন লোককবিই এবং 'আবহমান লোকায়ত পরম্পরাই' তাঁকে সৃষ্টি করেছে।[২৯] এ পরম্পরার কথা করিম নিজেও মানেন এবং তাঁর একাধিক গানেও তা বলেছেন।

আমরা তাঁর রচিত কিছু গানের পাঠ অধ্যয়ন করে যেটুকু অনুধাবন করতে পেয়েছি তাতে মনে হয় 'বাউল','বাউলা' কিংবা 'গণগীতিকার' যে নামেই তাঁকে ডাকি না কেন তিনি পরম্পরাবাহিত লোকঐতিহ্য আর আধুনিক প্রগ্রতিশীল সমাজ-রাজনীতি চিন্তার মেলবন্ধন ঘটিয়ে বাংলদেশের বিশাল এক দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আশা-অকাঙ্ক্ষা, সুদীর্ঘকালের বঞ্চনাজনিত ক্ষোভ, অধিকার আদায়ের আন্দোলন-সংগ্রাম আর মুক্তির বাণী প্রচার করে গেছেন তাঁর গানে। সেইসঙ্গে বাঙালির মহান মানবীয় লোকায়ত দর্শনও প্রতিফলিত হয়েছে তাঁর গানের কথায়। ভাটি বাংলার প্রবহমান লোকজীবনের স্পন্দন শোনা যায় তাঁর বাউল-ভাটিয়ালি-সারিগান আর গণসঙ্গীতে। বাউল গানের শ্রোতাদের অনেকেই বুঝে অথবা না বুঝেই হোক, সে গানের তত্ত্বের চমকে এবং হেঁয়ালির ধন্ধে আবিষ্ট হয়। আবার তাঁর উদাসকরা সুরের যাদুতেও মুগ্ধ হয় অনেকে। করিমের গানে লালন-দুদ্দু কি জালাল খাঁর গানের মতো তেমন তত্ত্বের ধোঁয়াশা বা দুর্বোধ্যতা নেই, আছে সহজ কথার খানিকটা ঢিলেঢালা বিন্যাস আর আত্মনিবেদনের হৃদয়স্পর্শী আকুতি যা সর্বস্তরের শ্রোতাকে সহজেই আকৃষ্ট করে। চিরন্তন আবেদনে ভরা এমন কিছু প্রেমের গান আছে করিমের যেগুলো অমর হয়ে থাকবে। যত দিন যাচ্ছে ক্রমশ তা নতুন প্রজন্মের সঙ্গীতপিপাসুদের কাছে আদরণীয় হয়ে উঠছে এটাই আশার কথা। করিম অনাগত ভবিষ্যতে এদের সঙ্গী হয়েই বেঁচে থাকবেন। এখন শুধু দরকার করিম জীবদ্দশায় যা দেখে যেতে পারেননি তা জাতীয়ভাবে করে দেখোনো। তিনি তাঁর গানের ভেতর দিয়ে বলা কথাগুলো প্রতিষ্ঠিত দেখে যেতে চেয়েছিলেন: 'গানের ভেতর আমি যে কথাগুলো বলার চেষ্টা করেছি তা প্রতিষ্ঠিত হওয়া এখন জরুরি। নিঃস্ব পরিবারে জন্ম নিয়ে আমি এখন নিঃস্বই থেকে গেছি, নিঃস্ব হবার যন্ত্রণাটা আমি হাড়ে হাড়ে টের পাই। আমি আমার এলাকায় নিজের যৎসামান্য সামর্থ্য নিয়ে 'বাঁচতে চাই' নামে একটা সংগঠন করেছি। আমাদের চাওয়াটা খুব সামান্য, দুবেলা দুমুঠো খেয়ে শুধু বেঁচে থাকা। এ অধিকারটুকুও কেড়ে নিয়েছে শোষকের দল।'[৩০] করিমের এ বক্তব্য থেকেই স্পষ্ট হয়ে যায় তিনি একেবারে মনে-প্রাণে চাইতেন সমাজে দরিদ্র, বঞ্চিত মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হোক। মানুষের

---

[২৮] যতীন সরকার (সম্পাদিত), *জালালগীতিকা সমগ্র* (ঢাকা: নন্দিত, ২০০৫), ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

[২৯] *শাহ আবদুল করিম রচনাসমগ্র*, তপোধীর ভট্টাচার্য লিখিত ভূমিকা, পৃ. ২০।

[৩০] টি এম আহমেদ কায়সার, "শাহ আবদুল করিমের সাক্ষাৎকার," *সাক্ষাৎকথায় শাহ আবদুল করিম*, পৃ. ২১-২২।

অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে গেলেই অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে হয়। করিম তা করেছেন একেবারে সহজাতভাবে এবং অন্তরের তাগিদ থেকে। এদিক থেকে তিনি অবশ্যই একজন প্রতিবাদী মানুষ।

শাহ আবদুল করিমের গানে বাউলসাধনার ক্রিয়া-করণ ও আধ্যাত্মিক ভাবসম্পদ যেটুকু আছে তার চেয়ে বেশি আছে শ্রেণীবিভক্ত সমাজসৃষ্ট দারিদ্র্যের কষাঘাতে মানুষের জর্জরিত জীবনসংগ্রামের কথা। সে সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত আছে বৃহত্তর সিলেট অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসের অনেক উপাদান। এ ছাড়াও তাঁর সঙ্গীতমালায় বিধৃত আছে বাঙালির লোকসংসকৃতির নানা উপাদান বিশেষত বহু জাতি-বর্ণ-ধর্ম সমন্বিত ইহবাদী মানবিক জীবনচেতনা এবং মরমি দর্শন। করিমের গানের বিষয়-বক্তব্য, তত্ত্বভাবনা, তাঁর শিল্পীজীবন ও জীবনদর্শন নিয়ে আরো ব্যাপক ও গভীর বিশ্লেষণাত্মক কাজ হওয়া দরকার। তবেই একজন মানবতাবাদী মহৎ লোককবির যথার্থ মূল্যায়ন করা হবে বলে মনে করি।

ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ জার্নাল
সংখ্যা ২৩ (১৪২২ বঙ্গাব্দ)

বাংলাদেশের অবলুপ্তপ্রায় কারুশিল্প: আইভরি

মোহাম্মদ আলী*

Abstract: From the ancient books namely *Kamasutra, Malatimadhava, Raghubansa, Brihatsanhita,* etc. we are informed of the use and antiquity of Ivory industry in this subcontinment. According to the archeological evidences found in Taxila and Sanchi the period from 200 to 150 BC is considered to be the dawn of the ivory industry. Moreover, its widespread use during the Harappa Civilisation gives evidence of the popularity of this industry. The history of this traditional artistry is not well-known even until now. This paper is based upon the present and early sate of this industry. In spite of the extinction of these traditional artistries, its remaining relics mark a positive aspect. These remaining relics will not only survive the havoc of time but enter into a new era.

ভূমিকা

প্রাচীন কাল থেকে উপমহাদেশে বিভিন্ন শিল্প-মাধ্যমের মধ্যে হাতির দাঁত বিশেষ স্থান দখল করে আছে। হরপ্পা সভ্যতার সময় থেকেই হরপ্পা, মহেঞ্জোদারো, কালিবাঙ্গন, লোথাল ইত্যাদি প্রত্নস্থান উৎখননে হাতির দাঁতের বিভিন্ন দ্রব্যাদি যেমন – চুলের কাঁটা, চিরুনি, সুচ ইত্যাদি আবিষ্কৃত হয়। তক্ষশীলায় খ্রিস্টপূর্ব দুই শতকের হাতির দাঁতের শিল্পকর্মের নমুনা পাওয়া যায়। আফগানিস্তানের কুষাণ রাজাদের গ্রীষ্মকালীন রাজধানী বেগ্রামে প্রচুর হাতির দাঁতের শিল্প-নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে।

বাংলাদেশের ভৌগোলিক সীমারেখার মধ্যে এখনও কোনো প্রত্নতাত্ত্বিক খননে হাতির দাঁতের শিল্পকলা চর্চার প্রমাণ পাওয়া না গেলেও বিভিন্ন শিলালিপি ও সাহিত্যকর্মে এই শিল্পের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। উপমহাদেশে হাতির দাঁতের কাজ সম্বন্ধে প্রাচীনতম উল্লেখ দেখা যায় খ্রিস্টপূর্ব ৬০০ অব্দে রচিত রামায়ণের ৮৪ অধ্যায়ের অযোধ্যাকাণ্ডে। রামচন্দ্রের অনুসন্ধানে ভরতের অনুগামীদের মধ্যে হাতির দাঁতের শিল্পীরাও যোগ দিয়েছিল বলে তাতে উল্লেখ রয়েছে। এছাড়া কামসূত্র, মালতীমাধব, রঘুবংশ, বৃহৎসংহিতা প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থের উল্লেখ থেকে এ উপমহাদেশের হাতির দাঁতের শিল্পের

* সহযোগী অধ্যাপক, চারুকলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

প্রাচীনতা সম্পর্কে অনুমান করা যায়। তক্ষশীলা ও সাঁচীর প্রত্নখননে প্রাপ্ত নমুনা অনুযায়ী খ্রিস্টপূর্ব ২০০ থেকে ১৫০ অব্দের আইভরি শিল্পের সূচনাকাল ধরা যায়।

আইভরি

ধাতু আবিষ্কারের পূর্বে প্রাণীর হাড় মানুষের সামাজিক জীবনে এক বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে। প্রাত্যহিক কাজে ব্যবহৃত হাতিয়ার, অস্ত্র-শস্ত্র ছাড়াও এটাকে ঘর সাজানোর কাজে লাগিয়েছে। অরণ্যবাসী মানুষের কাছে হাড়ই ছিল তখন সহজলভ্য। সভ্যতার ঊষালগ্নে মানুষ আকর্ষিত হয়েছিল হাতির দাঁতের দিকে। হরপ্পায় এর ব্যাপক ব্যবহারই প্রমাণ করে যে ভারতবর্ষের হাতির দাঁতের শিল্পকর্ম বহু আগে থেকেই জনপ্রিয় ছিল। নগরবাসী ধনিক শ্রেণীর ভিতর এর ব্যবহার ছিল সীমাবদ্ধ। বাইবেলে উল্লেখ আছে রাজা ডেভিড হাতির দাঁতের সিংহাসনে বসে গান গাইতেন এবং সোলায়মানের একটি হাতির দাঁতের সিংহাসন ছিল। রোমান সাম্রাজ্যে একবার এর ব্যবহার শুধু রাজ পরিবারের ভিতর সীমাবদ্ধ করা হয়েছিল।[১]

যে অর্থে দাঁতকে আমরা ব্যবহার করি আলোচ্য হাতির দাঁত সে কাজে ব্যবহৃত হয় না। হাতির শুঁড়ের দুই পাশে অবস্থিত দাঁত নীচের চোয়ালের কর্তন দাতের পরিবর্তিত রূপ যা তার আত্মরক্ষার কাজে লাগে। সাধারণত পুরুষ হাতিরই এগুলো থাকে। স্ত্রী হাতির থাকলে তা মাত্র কয়েক ইঞ্চি পর্যন্ত বাড়তে পারে। ভারতীয় হাতির এ দাঁত লম্বায় ১০.৫ ফুট পর্যন্ত হতে পারে। ব্যাংককের রাজকীয় জাদুঘরে রক্ষিত ১ জোড়া দাঁতের দৈর্ঘ্য ৯ ফুট ১০.৫ ইঞ্চি (৩ মিটার)। রাজা ৬ষ্ঠ জর্জ সংগৃহীত ১ জোড়া দাঁতের দের্ঘ্য ৮ ফুট ৯ ইঞ্চি ও ৮ ফুট ৬.৫ ইঞ্চি এবং ওজন যথাক্রমে ১৬০ পাউন্ড ও ১৬১ পাউন্ড'।[২]

পশ্চিমবঙ্গের পাণ্ডু-রাজার ঢিবি, চন্দ্রকেতুগড় ও মঙ্গলকোটে প্রত্নতাত্ত্বিক খননের ফলে বেশ কিছু হাতির দাঁতের নিদর্শন পাওয়া গেছে। পাণ্ডু-রাজার ঢিবি উৎখননে প্রাপ্ত প্রায়-ঐতিহাসিক যুগের হাতির দাঁতের চিরুনি তাৎপর্যপূর্ণ। মঙ্গলকোটে খ্রিস্টপূর্ব ছয়-তিন শতকের স্তরে দাবার গুটি ও সুরমা দণ্ড পাওয়া গেছে।[৩] কুষাণ, গুপ্ত ও গুপ্ত-পরবর্তী যুগে খোদাই-কাজ-সমৃদ্ধ হাতির দাঁতের শিল্প-নিদর্শন বাংলায় হাতির দাঁতের শিল্পকর্মের সুদীর্ঘ ঐতিহ্যেরই স্মারক। চন্দ্রকেতুগড় দুর্গ-প্রাকারের বাইরে হাদীপুর গ্রামে খ্রিস্টীয় পর্বের সূচনা-কালের হাতির দাঁতের আরার আবিষ্কার এই শিল্পচর্চার গভীরতা ও বিস্তৃতিরই প্রমাণবহ।

প্রত্নস্থানের বাইরে প্রাচীন সাহিত্যে হাতির দাঁতের শিল্পকলার উল্লেখ রয়েছে। রামায়ণে হাতির দাঁতের খোদাইকারকদের সমবায় সংঘের উল্লেখ আছে। মহাভারতে ছাতায় ব্যবহৃত স্পোক, তরবারির বাঁট, সিংহাসন, সিড্যান চেয়ার ইত্যাদি হাতির দাঁতের তৈরি রাজকীয় নিদর্শনের উল্লেখ রয়েছে।[৪] বৌদ্ধ এবং জৈন সাহিত্যেও এ শিল্পের প্রমাণ পাওয়া যায়। শীলবন-নাগ জাতকে 'দণ্ডকার বীথি' শব্দটির উল্লেখ রয়েছে, যার অর্থ দন্তশিল্পীদের সড়ক। হাতির দাঁতের তৈরি আসন ও প্রাসাদের (দন্তগৃহ) উল্লেখ রয়েছে জৈন সাহিত্য 'অঙ্গবিজ্জে'।

---

[১] V.P. Dwivedi, *Indian Ivories* (New Delhi: Agam Prakashan, 1976), p. 7.

[২] S.H. Prater, *The Book of Indian Animals* (Bombay: Natural History Society, 1965), p. 224.

[৩] Amita Ray and Samir Kr. Mukherjee, "Excavation at Mangalkot," *Pratna Samiksha,* vol. 1 (1992), pp. 111-21.

[৪] Aubyn St. Fiona (ed.), *Ivory: A History of Collectors Guide* (London, 1987), p. 200.

বাংলাদেশে এ শিল্পের অস্তিত্ব সম্পর্কে প্রাচীনতম দলিল হচ্ছে সিলেট ও বিক্রমপুরের দুইটি তাম্রফলক। সিলেটের ভাটেরা গ্রামে প্রাপ্ত গোবিন্দ কেশবের তাম্রশাসনে রাজা বিগা নামক জনৈক দন্তকারের উল্লেখ রয়েছে। ইদিলপুর (বিক্রমপুর) তাম্রশাসনে হাতির দাঁতের শিল্পকর্ম-সংক্রান্ত তথ্য-প্রমাণ পাওয়া যায়। এগারো শতকের ভটেরা তাম্রশাসনে উল্লেখ রয়েছে যে নারায়ণ দেবের পুত্র শ্রীহট্টের শাসক গোবিন্দ কেশবদেব একটি শিব-মন্দির নির্মাণের জন্য ভূমিদান করেন এবং মন্দিরের কারুকার্যের জন্য অন্যান্য শিল্পীর সঙ্গে 'রাজবিজ' নামক দন্তশিল্পীকেও নিয়োগ দান করেন।[৫] কেশবসেনের সময়ে হাতির দাঁতের হাতল সমৃদ্ধ পালকির উল্লেখ রয়েছে।[৬] উড়িষ্যার বিখ্যাত জগন্নাথ মন্দিরের লিপিতে রাজা পুরুষোত্তমদেবের (১৪৬৭-১৪৯৭) কাছ থেকে প্রাপ্ত হাতির দাঁতের তৈরি আটটি সিংহাসন উপহারের উল্লেখ রয়েছে।[৭] কেবল লিপি-সাক্ষ্যেই নয়, মধ্যযুগের সাহিত্যেও হাতির দাঁতের শিল্পকর্মের প্রমাণ পাওয়া যায়। এ দুইটি তাম্রলিপি থেকে ত্রয়োদশ শতকের বাংলাদেশে আইভরি শিল্পচর্চা সম্পর্কে জানা যায়। তাছাড়া বাংলাদেশে বিভিন্ন স্থানে প্রত্নখননে প্রাপ্ত এবং ব্যক্তিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক সংগ্রহে রক্ষিত হাতির দাঁতের ক্ষুদ্রাকৃতির বিগ্রহ ও ছোটোখাটো শিল্পকর্ম থেকে পাল ও সেন আমলে (৯৮৮ খ্রি. ও ১২৬৬ খ্রি.) এ শিল্পের অস্তিত্বের কথা অনুমান করা যায়। তখন থেকে পনেরো শতক পর্যন্ত এ শিল্পের বিকাশের কাল, এর পরে আবার আঠারো শতক পর্যন্ত পতনের যুগে ইংরেজ আমলে কিছুদিনের জন্য এ শিল্পের সৌকর্য দেখা যায়।

আঠারো-উনিশ শতকের বিভিন্ন লেখনীতে রাজা ও জমিদারের পৃষ্ঠপোষকতায় ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেট, রংপুর, কুড়িগ্রাম প্রভৃতি অঞ্চলে হাতির দাঁতের শিল্প চর্চার প্রমাণ পাওয়া যায়। ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে দিল্লিতে নিখিল ভারত শিল্প প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। এ প্রদর্শনীতে ঢাকা, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম ও রংপুরের দন্ত-শিল্পীদের শিল্পকর্ম স্থান পায়।[৮]

এই শিল্পীদের মধ্যে কুড়িগ্রামের পাঙ্গায় যে ছয় ঘর শিল্পী বসবাস করত, তাদের আদি নিবাস ছিল বিহার। পাঙ্গার মহারাজ তাদের এখানে এনে কিছু লাখেরাজ সম্পত্তি দান করে এ শিল্পের সূচনা করেন। এরা ছিল মুসলমান এবং স্থানীয়ভাবে তারা কুদিকার নামে পরিচিতি লাভ করে। রংপুরের কুদিকাররা আসামের জমিদারদের ফরমায়েশে কাজ করত এবং পারিশ্রমিক হিসেবে হাতির দাঁতের পেত। রংপুরের শিল্পীরা মুসলিম, কিন্তু মুর্শিদাবাদের শিল্পীরা বৈষ্ণব, এদের উপাধি ভাস্কর।

হাতির দাঁতের শিল্পকর্মগুলোকে সৌখিন ও ব্যবহার্য এ দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। সৌখিন সামগ্রীর মধ্যে রয়েছে মাদুর, হাতপাখা (চিত্র ১), কলমদান ও বিভিন্ন ধরনের সৌখিন দ্রব্য ইত্যাদি। অন্যদিকে নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্যাদির মধ্যে রয়েছে – দাবার গুটি (চিত্র ২), চুড়ি, চিরুনি, চুড়ি, তরবারির বাট, সিংহাসন, চেয়ার-টেবিল, চামচ, পিঠ চুলকানি ইত্যাদি। বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে এ সমস্ত শিল্প সামগ্রী সংরক্ষিত আছে।

এ সকল শিল্পবস্তুর উপকরণ হাতির দাঁতের বাংলার শিল্পীরা সংগ্রহ করত প্রধানত আসাম ও মায়ানমার থেকে। এছাড়া ঢাকার 'খোদা অস্তিম' এবং মনিপুরিদের কাছ থেকে শিল্পীরা হাতির দাঁত সংগ্রহ করতো। সংগৃহীত হাতির দাঁতের কাজকে তিন ভাগে ভাগ করা যায় – ১. হাতির দাঁতের খোদাই কাজ; ২. হাতির দাঁতের খচিত আসবাব পত্রাদি নির্মাণ; এবং ৩. হাতির দাঁতের পাটি, পাখা, চুড়ি, কৌটা প্রভৃতির দ্রব্য সামগ্রী।

---

[৫] *Epigraphia Indica,* vol. xix, part IV. 1928, pp. 277-286.

[৬] N.G. Majumdar. *Inscription of Bengal,* vol. III. p. 122.

[৭] Ibid, p. 206.

[৮] তোফায়েল আহমদ, *আমাদের প্রাচীন শিল্প* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯২), পৃ. ১২৫।

বাংলাদেশে এ তিন ধরনের কাজের প্রচলন ছিল বলে অবগত হওয়া যায়। শিল্পে ব্যবহৃত হাতির দাঁত আবার তিন ভাগে বিভক্ত যেমন – ১. দাঁতের অগ্রভাগ 'নকশি দন্ত'; ২. দাঁতের মধ্যভাগ 'খন্তিদন্ত'; এবং ৩. দাঁতের গোড়ার অংশ 'গজহর দন্ত' নামে পরিচিত।[৯]

হাতির দাঁতের শিল্পকর্ম তৈরীতে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি ও এর ব্যবহার পদ্ধতি

কাঠের শিল্পকর্ম তৈরিতে ব্যবহৃত প্রায় সব যন্ত্রপাতিই এ শিল্পে ব্যবহৃত হতো। এ শিল্প তৈরীতে শিল্পীরা ছোটোবড়ো প্রায় ৭০-৮০টি হাতিয়ার ব্যবহার করতো। এর মধ্যে বাটালির ব্যবহার প্রাচীন হরপ্পা থেকে শুরু করে আজকের বাংলাদেশেও চলছে।[১০] লেদ-এর ব্যবহারও মহেঞ্জোদারোতে হতো।[১১]

হাতির দাঁত সংগ্রহ করার পর আকাঙ্ক্ষিত জিনিস-পত্রাদি তৈরি করতে বেশ কিছু আদিম যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হতো। এসব যন্ত্রপাতি অত্যন্ত সেকেলের। বর্তমান কালেও অনেক যন্ত্রপাতির সাথে এর মিল খুঁজে পাওয়া যায়। এ শিল্পকর্ম তৈরিতে ব্যবহৃত যন্ত্র-পাতিগুলো নিম্নরূপ –

করাত: করাত অত্যন্ত ছোটো মাপের এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খাঁজ কাটা। এটা আস্তে লম্বা লম্বা করে দাঁত কাটার কাজে ব্যবহৃত হতো। **ছুরি:** আজকের যুগের ছুরির মত আকৃতি হলেও খুবই ধারালো এবং শক্ত বাটের তৈরি ছিল। এটা ইস্পাতের তৈরি এবং ধার দেওয়ার জন্য পাথরের সান ব্যবহার করা হতো। **বাটালি:** এটি ইস্পাতের তৈরি। এটি আকারে গোল, চ্যাপটা, কোণাকৃতি, লম্বা ও চিকন ধরনের ছিল। এর বাট সাধারণত শাল কিংবা শক্ত কাঠের তৈরি। **ডাইস:** এটা দিয়ে হাতির দাঁত শক্ত করে ধরে কাটতে বা মসৃণ করার কাজে ব্যবহার করা হতো। **লোহার কলম:** এই কলম দেখতে সাধারণ কলমের মতো নয় কিন্তু নীচের অংশটুকু অনেকটা কলমের মতো। এই কলমের বিশেষ ধরনের তেমন কোন আকৃতি ছিল না। তবে এটির নীচের অংশ কাঁচকাটা হীরা সংবলিত কলমের মতো ধারাল ছিল। এটা দিয়ে দাঁতের উপর নকশা কাটা হতো। **উখা:** এটা দিয়ে আকাঙ্ক্ষিত জিনিসপত্রাদি তৈরির সমুদয় মসৃণ করার কাজে ব্যবহার করা হতো। এছাড়া, কম্পাস, পেন্সিল, গজ বা মাপনী, বাইস (চেপে ধরার যন্ত্র), স্ক্যাপার (ঘর্ষণের যন্ত্র), ছোটো কাঠের মুগুর, হাতুড়ি, তুরপুন ও লেদ ব্যবহার করা হতো।

হাতির দাঁতের শিল্পকর্ম নির্মাণ পদ্ধতি

এ শিল্পকর্মে প্রাচীন কালে যে পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে আজও তার খুব একটা পরিবর্তন হয়নি। হাতির দাঁতের তিনটি ভাগ যেমন – ফাঁকা অংশ যা হাতির মুখের ভিতর থাকে, মধ্যভাগ ও অগ্রভাগ। ফাঁকা অংশের মজ্জা বের করতে কেউ কেউ সোডা ও ক্যালসিয়াম দিয়ে সিদ্ধ করে, আবার কেউবা কয়েকদিন মাটির নীচে পুতে রাখে। সিদ্ধ করার পর হাড়ের সূক্ষ্ম ছিদ্রগুলো গলিত মোম দিয়ে বন্ধ করা হয় যাতে এটা শক্ত হয় ও বায়ুর আর্দ্রতামুক্ত হতে পারে। হাতির দাঁত দুই ধরনের যেমন, শক্ত ও নরম। শক্ত দাঁত উজ্জ্বল ও স্বচ্ছ কিন্তু কাটতে একটু কঠিন। অন্যদিকে নরম দাঁত কাজ করতে সহজ এবং সহজে ফাটল ধরে না।

প্রথমে শিল্পী মাপমতো হাতির দাঁত কেটে নিয়ে তাঁর কল্পিত শিল্পকর্মটি কাগজে এঁকে নেন। মনঃপূত হলে শিল্পী হাতির দাঁতের গায়ে পেন্সিল দিয়ে নকশাটি এঁকে নেন। এরপর হাতুড়ি বাটালির সাহায্যে খোদাই কাজ শুরু করেন। লোহার কলম দিয়ে করা হয় শেষের কাজটুকু। ছিদ্রযুক্ত কাজ সমাধা করা হয় ড্রিল মেশিনের সাহায্যে। নকশা অনুযায়ী কাজ শেষ হলে কিছুক্ষণ পানিতে ভিজিয়ে

---

[৯] *Official Report, Calcutta International* Exibition. 1983-84, p. 90.

[১০] M.S. Vats, *Excavation of Harappa,* vol I. p. 461.

[১১] E. J. H. Mackay, *Further Excavation of Mohenjodaro,* vol. I (New Delhi, 1938), p. 542.

রাখা হয়। সিরিশ কাগজ ও হাতির দাঁতের গুড়া দিয়ে সমতল করে মসৃণ করার কাজটি করা হয়ে থাকে। মসৃণ করার কাজে মাছের আঁশ, চীনামাটি ও চক পাউডার ব্যবহৃত হয়। দক্ষিণ ভারতের কেরালা রাজ্যে 'রুটিফল' নামক গাছের পাতার মাঝখান দিয়ে ঘষা হয় যা এই শিল্পকর্মকে আরও উজ্জ্বল করে তোলে।

হাতির দাঁতের নিজস্ব একটি আকর্ষণীয় রং থাকা সত্ত্বেও শিল্পী এর উপর বিভিন্ন সময়ে তাঁর নিজস্ব রং চাপিয়েছেন। হরপ্পার শিল্পীরা এতে কালো ও লাল রং মিশিয়েছেন। মিশরীয়রা হাতির দাঁত ডুবিয়ে রাখতেন লাল, হলুদ খয়েরি, সবুজ বা কালো রঙে। মধ্যযুগে এ শিল্পকর্মে রঙের ব্যবহারের ব্যাপকতা লক্ষ করা যায়। হায়দ্রাবাদে হাতির দাঁতের শিল্পকর্মে লাল রং ব্যবহার করা হতো বুলবুল নামক গাছের রস থেকে।

হাতির দাঁতের শিল্পকর্মের ব্যবহার

প্রত্নতাত্ত্বিক খনন এবং ইতিহাসের আলোকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে জানা যায় খ্রিস্টপূর্ব ৩৫০০০ হতে ১০,০০০ সময়কারের মধ্যে রাশিয়ায় মেমথের দাঁত দ্বারা তৈরি হাতের চুড়ি ও গলার হারের ব্যবহার হতো। এছাড়াও খ্রিস্টপূর্ব ১৫০০ হতে ১০০০ সময়কালের মধ্যে আলাস্কা, গ্রীস, চীন, মিসর, ইরাক প্রভৃতি অঞ্চলেও হাতির দাঁতের তৈরি গহনার বাক্স, ছোট-খাট ধরনের নৌকা, আসবাবপত্র, তৈজসপত্র ও গৃহসজ্জার নিদর্শন তৈরি ও ব্যবহার হতো। এর মধ্যে গ্রীসে হাতির দাঁতের শিল্পকর্ম বেশি পরিমাণে ব্যবহার হয় বলে মাঝে মধ্যে ইউরোপ থেকেও তা আমদানি করতো। প্রথম এবং দ্বিতীয় শতাব্দীতে হাতির দাঁতের এই শিল্পকর্ম ইতালীতেই সীমাবদ্ধ ছিল এবং পরে তৃতীয় এবং চতুর্থ শতাব্দীতে ক্রমে ক্রমে ইতালী হতে এর ব্যবহার ভারতবর্ষে চলে আসে। ভারতবর্ষে গুপ্ত শাসনামলে এই দুই শতাব্দী ধরে হাতির দাঁতের শিল্পকর্ম তৈরি এবং এর ব্যবহার উল্লেখযোগ্য বলে মনে করা হয়।

হরপ্পা ও মোহেনজোদারোতে খ্রিস্টপূর্ব ২৩০০ হতে ১৭৫০ পর্যন্ত হাতির দাঁতের শিল্পকর্ম বেশ জনপ্রিয় ছিল। ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে এখানে খনন করা হলে হাতির দাঁতের তৈরি জীবজন্তু, বোতাম, চিরুনি, খোঁপার কাটা ইত্যাদির সন্ধান পাওয়া যায়। বিহারের চম্পানগরে খ্রিস্টপূর্ব ৬ষ্ঠ শতকের হাতির দাঁতের তৈরি নারীমূর্তি প্রসঙ্গত স্মরণীয়। মহাভারতে উল্লেখ রয়েছে যে, লঙ্কায় সীতাকে উদ্ধারের সময়ে রাবণের বিছানায় এবং প্রাসাদে হাতির দাঁতের শিল্পকর্ম পাওয়া যায়। খ্রিস্টপূর্ব ৫২২ হতে ৪৮৬ পর্যন্ত ইরানের প্রথম রাজা দারাউস সুসা প্রাসাদ সাজাতে হাতির দাঁতের শিল্পকর্ম ব্যবহার করেছিলেন। একাদশ শতাব্দীতে সিলেটের ভাটেরা গ্রামের মন্দিরে হাতির দাঁতের শিল্পকর্ম ব্যবহার করা হয়েছিল মর্মে একটি তাম্রশাসন হতে জানা যায়। বল্লাল সেনের সময়ের তাম্রলিপি থেকে জানা যায় যে, সে আমলে হাতির দাঁতের শিল্পকর্মের ব্যবহার ছিল। বার্মায় দেব-দেবীর অলংকার হিসেবে হাতির দাঁতের সম্পন্ন অংশবিশেষ দ্বারা তৈরি গহনা ব্যবহার করতো। মোঘল শাসন আমলেও রাজপ্রাসাদে গৃহ-সজ্জার নিদর্শন হিসেবে হাতির দাঁতের শিল্পকর্ম আভিজাত্যের সাথে ব্যবহার করা হতো।

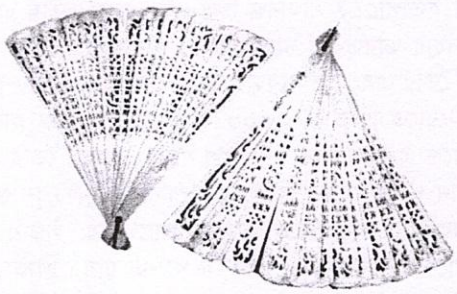
বাজারজাতকরণ প্রক্রিয়া

খ্রিস্টপূর্ব ৩৫০০০ হতে প্রথম শতাব্দীর শুরুর পূর্ব পর্যন্ত রাশিয়া, ফ্রান্স, গ্রীস, মিশর, ইরাক, ইতালি, চীন, থাইল্যান্ড প্রভৃতি দেশে হাতির দাঁতের শিল্পকর্মের ব্যবহার এবং বাজার ছিল। প্রথম শতাব্দী থেকে মধ্যযুগ পর্যন্ত ভারত, ইতালি, ফ্রান্স, ব্রিটেন, জার্মানি, স্পেন, চীন, সিরিয়া, অস্ট্রেলিয়া, ফিলিপাইন, শ্রীলঙ্কা এবং তিব্বতে হাতির দাঁতের তৈরি জিনিসপত্রের বাজার ছিল। মধ্যযুগের প্রথম দিকে রাজস্থান, উত্তর প্রদেশ এবং উড়িষ্যায় এ শিল্পকর্মের প্রধান প্রধান বাণিজ্যিক কেন্দ্র গড়ে ওঠে। এছাড়া পরবর্তীতে

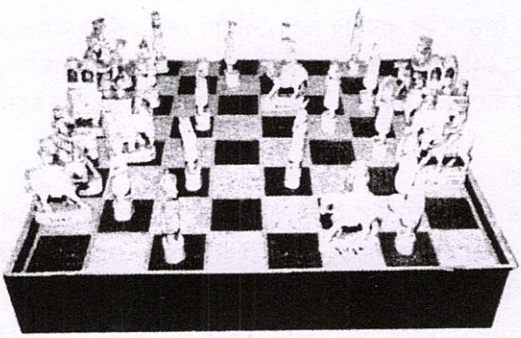
ভারতের কেরালা, মহীশুর, আসাম, জয়পুর, পাকিস্তানের লুধিয়ানা, পালি প্রভৃতি অঞ্চলে হাতির দাঁতের শিল্পকর্মের প্রধান প্রধান বাণিজ্যিক কেন্দ্র ছিল। রংপুর, চট্টগ্রাম, বিরামপুর, সিলেট, তাঁতিদের কর্মস্থল এবং আবাস ছিল। হাতির দাঁতের শিল্পকর্মে নেপালও বেশ উন্নত ছিল। সেখানে মূর্তি, চিরুনি, ছোরা, পিঠ চুলকানি, ছাঁচ ইত্যাদি তৈরি হতো। এইসব শিল্পীরা বিভিন্ন সময়ে হাতির দাঁতের শিল্পকর্ম তৈরি করে ইউরোপের বাজারে পাঠাতো ব্যবসায়ীদের দ্বারা। এ কারণে ইউরোপীয়রা নিজ উদ্যোগে নানা স্থান হতে হাতির দাঁত সংগ্রহ করে এদেশে নিয়ে আসতো শিল্পকর্ম তৈরির জন্য। অতঃপর শিল্পকর্ম তৈরি হওয়ার পর নিজেদের দেশে আবার নিয়ে যেতো ব্যবহারের তথা ব্যবসার উদ্দেশ্যে।

উপসংহার

আর্থসামাজিক কারণে বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী এই শিল্পসমূহ আজ অবলুপ্তির পথে। আর্থসামাজিক সমস্যা মানুষের রুচির পরিবর্তন ঘটিয়েছে। এছাড়া উপযুক্ত পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে শিল্পকলার মৌলিক উপাদানের পরিবর্তে বিকল্প উপকরণের ব্যবহার দেখা যায়, যার ব্যবহার ক্রমশ বাড়ছে। নিখুঁত শিল্পসামগ্রী তৈরিতে মৌলিক উপাদানের মূল্য ছাড়াও সময় বেশি লাগায় শিল্পীর অধিক মজুরি সাধারণ মানুষকে এ সকল শিল্পসামগ্রীর প্রতি নিরুৎসাহিত করে। এছাড়া বর্তমানে হাতে তৈরি খোদাই জাতীয় কাজে যান্ত্রিক টুলস-এর ব্যবহার হওয়ায় হাতের কাজের সুযোগ ক্রমেই সীমিত হয়ে আসছে। কারুশিল্পীরা তাদের উত্তরসূরিদের নিজ পেশা ধরে রাখতে ক্রমেই নিরুৎসাহিত বোধ করছে।



চিত্র ১: হাত পাখা (উনিশ শতক), প্রাপ্তিস্থান: বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, ঢাকা।



চিত্র ২: দাবার গুটি (উনিশ শতক), প্রাপ্তিস্থান: বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, ঢাকা।

ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ জার্নাল
সংখ্যা ২৩ (১৪২২ বঙ্গাব্দ)

বাংলাদেশে টেলিভিশন সাংবাদিকতার ইতিহাস

মোঃ আবুল কালাম আজাদ*, মুহাম্মদ সাখাওয়াত হুসাইন**

Abstract: Television Journalism started and developed across the USA and Europe following the invention of television. Amid establishment of a state-owned television station in 1964 Television Journalism began in Bangladesh. From 1997 private television channel aired the programmes. Now till September, 2014, twenty three private satellite channels are officialy telecasting news and programs in Bangladesh. Following the inception of private channels Television Journalism has been enriched with extensive qualitative change. Although still TV Journalism in Bangladesh has not fully reached the level of expectation, undoubtedly it has advanced much in fifty years. An attempt has been made in this article to highlight the historical development of Television Journalism in Bangladesh on the way of its journey of half century.

ভূমিকা

বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে টেলিভিশন আবিষ্কার আধুনিক বিজ্ঞানের একটি বিস্ময়কর অবদান। তাৎক্ষণিকভাবে পৃথিবী জুড়ে সংবাদ শোনা ও দেখার ব্যাপক সুযোগ করে দিয়ে শক্তিশালী গণমাধ্যম হিসেবে টেলিভিশন আত্মপ্রকাশ করে। দৃশ্য, শ্রুতি ও গতির অনবদ্য শৈল্পিক সমন্বয়ে টেলিভিশন তথ্য প্রাপ্তি ও বিনোদনের এমন অপার সুযোগ সৃষ্টি করে দেয় যে, এটি এখন আর শুধু একটি যন্ত্র নয়, বরং পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের অপরিহার্য নিত্যসঙ্গী। তাই বর্তমান সময়ে টেলিভিশন গণযোগাযোগের সবচেয়ে জনপ্রিয়, শক্তিশালী, প্রভাবশালী ও গুরুত্বপূর্ণ গণমাধ্যম। টেলিভিশনের এই বিস্ময়কর ঐন্দ্রজালিক ক্ষমতার কারণেই মার্কিন মিডিয়া বিশেষজ্ঞ মার্শাল ম্যাকলুহান (Marshall McLuhan) বিখ্যাত সেই উক্তিটি করেছিলেন, "Medium is the message।"[১] অর্থাৎ মার্শাল ম্যাকলুহান আজ থেকে প্রায় পাঁচ দশক আগেই উপলব্ধি করতে পারেন যে, টেলিভিশন কী বিশাল প্রভাব রাখবে আমাদের মনোজগতে। তিনি মনে করতেন টেলিভিশনের মতো শক্তিশালী গণমাধ্যম দিয়ে একই ধারণা

---

* সহকারী অধ্যাপক, যোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

** সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

১ Marshall McLuhan, *Understanding Media: The Extensions of Man* (London: Routledge & Kegan Paul, 1976), p. 7.

বা অনুভূতি সৃষ্টির মাধ্যমে শুধু একটি দেশ নয় বরং মহাদেশ জয় করা সম্ভব এবং গোটা পৃথিবীকে একটা বৈশ্বিক গ্রামে (Global Village) পরিণত করা যায়। তাই গণমাধ্যম হিসেবে টেলিভিশনের এ অতুলনীয় বৈশিষ্ট্যের কারণেই আজকের দিনে পৃথিবীজুড়ে টেলিভিশন সাংবাদিকতা বিস্তৃত ও বিকশিত হয়।

টেলিভিশন সাংবাদিকতার সূচনা

টেলিভিশন আবিষ্কারের সূত্র ধরেই প্রথমে ইউরোপ, আমেরিকা এবং পরবর্তীকালে এশিয়া মহাদেশে টিভি স্টেশন স্থাপনের মধ্য দিয়ে টিভি সংবাদ ও অনুষ্ঠান সম্প্রচার চালু হয়। ১৯৬৪ সালে টিভি স্টেশন স্থাপনের মধ্য দিয়ে সরকারি উদ্যোগে বাংলাদেশ (তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান) টিভি সংবাদ ও অনুষ্ঠান সম্প্রচার শুরু করে। প্রায় অর্ধ শতকজুড়ে (১৯৬৪-২০১৪) বাংলাদেশে নতুন প্রযুক্তির উৎকর্ষে নতুন নতুন টিভি-চ্যানেল সম্প্রচারের মধ্য দিয়ে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে টিভি সাংবাদিকতা এগিয়ে যাচ্ছে।

আধুনিক যুগের অপরিহার্য এই যন্ত্রটির উদ্ভাবন ও প্রযুক্তিগত উন্নয়নে কাউকেই এককভাবে কৃতিত্ব দেওয়া যায় না, বরং বিভিন্ন বিজ্ঞানীদের পরস্পর নির্ভরশীল বিভিন্ন সময়ের ধারাবাহিক আবিষ্কারের ফলেই টেলিভিশন প্রযুক্তি উদ্ভাবিত ও বিকশিত হয়। টেলিভিশন আবিষ্কারের ঐতিহাসিক প্রচেষ্টা শুরু হয় ১৮৮৪ সালে। জার্মান বিজ্ঞানী পল জি. নিপকো (Paul G. Nipkow) যান্ত্রিক পদ্ধতিতে চিত্র বিভক্তকরণ বা scanning-এর সফল ব্যবস্থা করেন।[২] নিপকোর স্ক্যানিং ব্যবস্থায় যে বস্তুকে স্ক্যান করতে হবে তা একটি ঘুরন্ত চাকতির সামনে রাখা হতো। তারপর বস্তুর উপর আলো ফেলা হতো একপাশ থেকে আর চাকতির অপরদিকে থাকতো ফটো-সেল। ঘুরন্ত চাকতির ফুটো পেরিয়ে দফায় দফায় বস্তুর টুকরো টুকরো অংশের আলো-আঁধারের তীব্রতা অনুসারে ফটোসেল উজ্জীবিত বা স্তিমিত হয়ে বিভিন্ন মাত্রার বৈদ্যুতিক প্রবাহ সৃষ্টি করতো। সংকেতবাহী এই প্রবাহ পৌঁছতো গ্রাহকযন্ত্রে। সেখানেও জ্বলতো একটি বৈদ্যুতিক আলো, আর প্রেরকযন্ত্রের সমন্বয়ে ঘুরতো অনুরূপ একটি দ্বিতীয় স্ক্যানিং চাকতি। বিদ্যুত প্রবাহের কমবেশি অনুসারে গ্রাহক যন্ত্রের আলো বাড়াতো বা কমাতো ও দ্বিতীয় স্ক্যানিং ডিস্কের সামনে উপবিষ্ট দর্শকের চোখের মূল বস্তু এবং প্রতিচ্ছবি ফুটিয়ে তুলতো। পল নিপকোর এ ধরনের যান্ত্রিক চিত্র বিভক্তিকরণ পদ্ধতির (Scanning Disc) সূত্র ধরেই ১৯২৬ সালে স্কটল্যান্ডের অধিবাসী জন লগি বেয়ার্ড (J. L. Baird) টেলিভিশন আবিষ্কার করেন এবং ইংল্যান্ডে প্রথমবারের মতো জনসমক্ষে টেলিভিশন প্রদর্শন করেন।[৩] তবে তার আগে ১৯২৫ সালে মার্কিন বিজ্ঞানী সি. এফ. জেনকিন্স (C. F. Jenkins) দীর্ঘদিনের গবেষণার পর তাঁর নিজ গবেষণাগার থেকে ছায়াচিত্র সম্প্রচার করতে সক্ষম হয়েছিলেন।[৪] জন লগি বেয়ার্ডের কৃতিত্বের কারণে আবিষ্কারক হিসেবে জেনকিন্সের নাম ঢাকা পড়ে যায়। তাছাড়া জেনারেল ইলেকট্রিক কোম্পানির বিজ্ঞানী ই. এফ. ডব্লিউ. আলেকজান্ডারসন (E. F. W. Alexanderson) ১৯২৮ সালে প্রায়ই তাঁর পরীক্ষাগারে টেলিভিশন সম্প্রচার পরীক্ষা অব্যাহত রাখেন। তবে ১৮৯৭ সালে জার্মান বিজ্ঞানী ফার্দিনান্ড কে. ব্রাউন (F. K. Braun) আবিষ্কার করেন ক্যাথোড রে টিউব বা সিআরটি। আর রুশ বিজ্ঞানী বোরিস রোজিং (Boris Rosing) এবং তাঁর ছাত্র ভ্লাদিমির কে. জাওয়ারিকিন (V. K. Zworykin) ১৯২৩ সালে স্ক্যানিং

---

[২] মোহাম্মদ সহিদউল্যাহ, *বেতার ও টেলিভিশন সাংবাদিকতা* (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ২০০১), পৃ. ১৫।

[৩] সুধাংশু শেখর রায়, *রেডিও-টিভি সাংবাদিকতা* (ঢাকা: এম এম সি, ২০০৪), পৃ. ৯।

[৪] তদেব, পৃ. ৯।

পদ্ধতির ক্ষেত্রে ইলেকট্রনের ব্যবহারযোগে টেলিভিশন ক্যামেরা টিউব আবিষ্কার করেন যে টিউবের স্ক্রিনকে এমন একটি পর্দার মতো ব্যবহার করা যায়, যার উপর টেলিভিশনের প্রতিবিম্ব এঁকে দেয় বা মূল দৃশ্যকে কপি করে অবিশ্বাস্য গতিতে টিউবের এক প্রান্ত থেকে ধাবমান ইলেকট্রন কণাদের নিক্ষেপ করে।[৫]

টেলিভিশন আবিষ্কারের পর থেকে বিংশ শতাব্দীর তিরিশের দশকের প্রায় পুরো সময় জুড়েই চলে টেলিভিশন প্রযুক্তিকে পূর্ণাবয়ব দানের নিরলস গবেষণা। সমন্বিত গবেষণার লক্ষ্যে ১৯৩১ সালে বিজ্ঞানী স্যার আইজেক সোয়েনবার্গের (Sir Isaac Shoenberg) নেতৃত্বে ব্রিটেনে একটি গবেষণা গ্রুপ গঠিত হয়। এর আগে ১৯৩০ সালে পি. টি. ফ্রানজওয়ার্থ (P. T. Fransworth) নামে আরেক বিজ্ঞানী ইলেকট্রনিক টেলিভিশন পদ্ধতির একটি পূর্ণাঙ্গ রূপ প্রদান করেন। সোয়েনবার্গের নেতৃত্বাধীন গবেষক দলের নিরলস প্রচেষ্টায় ১৯৩৫ সালের মধ্যেই ক্যামেরা, ধারণ টিউব, নিয়ন্ত্রণ ও প্রসারণ সার্কিটসহ জটিল টেলিভিশন ইলেকট্রিক পদ্ধতি প্রবর্তিত হয়। এসব দীর্ঘ পথ পরিক্রমার মধ্য দিয়ে ১৯৩৮ সালে ফ্রান্সের জর্জ ভ্যালেন্সি সুসংহত রঙিন টেলিভিশনের (compatible colour television) যাত্রা উন্মোচন করেন। ১৯৫৩ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সর্বপ্রথম রঙিন টেলিভিশনের যাত্রা শুরু হয়। এরপরে ১৯৬৭ সালে ব্রিটেন ও পশ্চিম জার্মানি একটি নতুন পদ্ধতি অবলম্বন করে প্রথমবারের মতো রঙিন টেলিভিশন সম্প্রচার শুরু করে। ১৯৮০ সালের ডিসেম্বর মাসে বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো রঙিন টেলিভিশন চালু হয়। অপরদিকে ১৯৮২ সালের আগস্ট মাস থেকে প্রতিবেশি ভারতে রঙিন টেলিভিশন চালু হয়।[৬]

টেলিভিশন প্রযুক্তির উদ্ভাবন ও বিকাশের সূত্র ধরেই দুনিয়া জুড়ে টেলিভিশন সম্প্রচার ও সাংবাদিকতার ক্রমবর্ধমান ধারা বিকশিত হয়। বিংশ শতাব্দীর তিরিশের দশকের প্রায় পুরো সময় জুড়েই বিভিন্ন দেশে টেলিভিশন সম্প্রচার নানান পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে যাত্রা শুরু করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৯২৮ সাল থেকেই অনুষ্ঠান সম্প্রচার করার জন্য কিছু সম্প্রচার স্টেশন পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করে। ১৯৩০ সালে রেডিও কর্পোরেশন অব আমেরিকা (RCA)-এর উদ্যোগে নিউইয়র্কের একটি থিয়েটারে বিশাল স্ক্রিনের টেলিভিশন প্রদর্শিত হয়।[৭] অন্যদিকে ব্রিটেনে বেতার সংস্থা হিসেবে জন্ম নেওয়া ব্রিটিশ ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশন (বিবিসি) ১৯৩৬ সালের ২ নভেম্বর থেকে নিয়মিতভাবে অনুষ্ঠান সম্প্রচার শুরু করে।[৮] লন্ডনের আলেকজান্দ্রা প্রাসাদ থেকে এই অনুষ্ঠান সম্প্রচারিত হয়।[৯] ১৯৩৭ সালের ১২ই মে সম্রাট ষষ্ঠ জর্জের অভিষেকের সময়ে শোভাযাত্রার দৃশ্য বিবিসি টেলিভিশনে দেখানো হয়। বিবিসির পক্ষে এটাই ছিল প্রথম গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ কভারেজ। ১৯৩৭ সালের জুন মাসে অনুষ্ঠিত উইম্বলডন এবং ১৯৩৮ সালের এপ্রিলে অনুষ্ঠিত এফ. এ. কাপের ফাইনাল বিবিসি সরাসরি সম্প্রচার করে।[১০] পরীক্ষামূলক সম্প্রচার আগেই শুরু হলেও নিয়মিতভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে টেলিভিশন প্রোগ্রাম শুরু হয় ১৯৩৯ সালের ৩০ এপ্রিল থেকে।[১১] আরসিএ ১৯৩৯ সালে নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত বিশ্বমেলার

---

[৫] মোহাম্মদ সহিদউল্যাহ, পৃ. ১৫।

[৬] সুধাংশু শেখর রায়, পৃ. ৯-১০।

[৭] B.N. Ahuja, *Audio Visual Journalism* (Delhi: Surjeet, 1992), p.127.

[৮] সুধাংশু শেখর রায়, পৃ. ১৪।

[৯] নঈম তারিক, *টেলিভিশন সাংবাদিকতা* (ঢাকা : জনান্তিক, ২০০৫), পৃ. ১৭।

[১০] তদেব, পৃ. ১৭।

[১১] সুধাংশু শেখর রায়, পৃ. ১৪।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠান সরাসরি সম্প্রচারের মাধ্যমে তাদের টেলিভিশন স্টেশনের আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু করে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট এ অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন এবং তাঁর উদ্বোধনী ভাষণই ছিল টেলিভিশন পর্দায় সম্প্রচারিত প্রথম কোনো মার্কিন প্রেসিডেন্টের ভাষণ।[১২] ১৯৩৬ সালে ইউরোপীয় দেশগুলোর মধ্যে ব্রিটেন ছাড়াও ফ্রান্সে টেলিভিশন সম্প্রচার শুরু হয়। অন্যান্য ইউরোপীয় দেশগুলো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরপর ১৯৫০ সালের মধ্যে নিয়মিত টেলিভিশন সম্প্রচার শুরু করে। ১৯৩৮ সালের অক্টোবরে মস্কোর লেলিনগ্রাদ টেলিভিশন কেন্দ্র থেকে সোভিয়েতরা সম্প্রচার শুরু করে।[১৩] দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে গেলে ব্রিটেনে টেলিভিশন সম্প্রচার বন্ধ হয়ে যায়। যুদ্ধ শেষে ১৯৪৬ সালের জুন মাসে ব্রিটেনে আবার টেলিভিশন সম্প্রচার শুরু হয়। ১৯৫৩ সালে রাণী এলিজাবেথের অভিষেকের সময় ব্রিটিশ টেলিভিশন অনেক জনপ্রিয় হয়ে উঠে। রাণীর অভিষেক অনুষ্ঠানের সরাসরি সম্প্রচার দেখার জন্য সে সময় লক্ষ লক্ষ টেলিভিশন সেট বিক্রি হয়েছিল। ব্রিটেনের দুই কোটি লোক টেলিভিশনে এ সম্প্রচার অনুষ্ঠান দেখেন। অন্যদিকে ১৯৫৩ সালে সম্প্রচার শুরু হওয়া জাপানেও তৎকালীন যুবরাজের অভিষেকের সময়েও টেলিভিশন সেটের বিক্রয় বৃদ্ধি পায়। ১৯৫৮ সালে যেখানে জাপানে ১০ লাখ টেলিভিশন ছিল সেখানে ১৯৫৯ সালে অভিষেক অনুষ্ঠানের সময়ে সেটের সংখ্যা দাঁড়ায় ৪০ লাখে।[১৪]

আসলে টেলিভিশন সাংবাদিকতা বিশ্বজুড়ে চালু হয় বেতার সাংবাদিকতার উত্তরসূরি হিসেবে। তাই গোড়ার দিকের টেলিভিশন সংবাদে যথেষ্ট প্রযুক্তিগত দুর্বলতা ছিল। ১৯৩৬ সালে বিবিসি টেলিভিশন সম্প্রচার শুরু করলেও মূলত খবর সম্প্রচার শুরু করে ১৯৩৮ সালের ২১শে মার্চ। তবে এ খবরটি ছিল রেকর্ড করা বেতার বুলেটিন, অর্থাৎ শুধুই শব্দ।[১৫] টেলিভিশন সাংবাদিকতার আরেক পূর্বসূরি হলো নিউজরিল বা খবরের চলচ্চিত্র। বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে সিনেমা হলগুলোতে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক নানা ঘটনার সচিত্র খবর দেখানো শুরু হয়। এর ফলে গড়ে ওঠে বেশ কিছু নিউজরিল কোম্পানি। বিখ্যাত নিউজরিল কোম্পানি মুভিটোনের নিউজরিল প্রথম দিক থেকেই বিবিসি সম্প্রচার করতে থাকে। তবে ১৯৪৮ সাল থেকে বিবিসি নিজেই নিউজরিল তৈরি করতে শুরু করে। এ ধরনের নিউজরিলের পাশপাশি যুক্তরাষ্ট্রে স্থির চিত্রকে স্টুডিওতে ইজেল (easel)-এ বসিয়ে তা দেখানো হতো। পঞ্চাশের দশকে ১৬ মিলিমিটার ফিল্ম উদ্ভাবনের ফলে টেলিভিশন খবরের ক্ষেত্রে নতুন মাত্রা সংযোজন হয়।[১৬]

সংবাদ পাঠকদের প্রথমবারের মতো পর্দায় হাজির করানোর মাধ্যমে ১৯৫৪ সালের ৪ঠা সেপ্টেম্বর বিবিসি টেলিভিশন সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে নতুন যুগের সূচনা করে। ১৯৬০ সালের মধ্যে সচিত্র সংবাদ পরিবেশনার মাধ্যমে টেলিভিশন সাংবাদিকতা পরিপূর্ণতা লাভ করে। ১৯৬৩ সালে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জন এফ. কেনেডি হত্যাকাণ্ডের কয়েক সেকেন্ডের মাথায় টেলিভিশন নেটওয়ার্কগুলো তা সরাসরি সম্প্রচার করে।[১৭] পরের চারদিন সংবাদ বুলেটিনে হত্যাকাণ্ডের ঘটনা নিয়ে অসংখ্যবার সরাসরি খবর

---

[১২] B. N. Ahuja, p.127.

[১৩] মোহাম্মদ সহিদউল্যাহ, পৃ. ১৬।

[১৪] সুধাংশু শেখর রায়, পৃ. ১৫।

[১৫] বিপ্লব শাহরিয়ার, *ব্রডকাস্ট জার্নালিজম* (ঢাকা : ঐতিহ্য, ২০০৯), পৃ. ২৫।

[১৬] নঈম তারিক, পৃ. ১৯।

[১৭] বিপ্লব শাহরিয়ার, পৃ. ২৫।

সম্প্রচার করা হয়। সরাসরি সম্প্রচারের এ ক্ষমতা টেলিভিশন সংবাদকে সংবাদপত্রের চেয়ে শক্তিশালী ও নির্ভরযোগ্য মাধ্যম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে তোলে।

বাংলাদেশে টেলিভিশন সাংবাদিকতা

এশিয়া মহাদেশের মধ্যে জাপানেই প্রথম ১৯৫৩ সালে টেলিভিশন সম্প্রচার শুরু হয়। আর বাংলাদেশে (তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান) টেলিভিশন স্থাপনের উপর প্রথম গবেষণা হয় ১৯৬৩ সালে। ১৯৬৪ সালের এপ্রিল মাসে পাইলট প্রজেক্ট হিসেবে টেলিভিশন সম্প্রচারের সাদা কালোয় টেলিভিশন সম্প্রচার শুরু হয়।[১৮] ঢাকার ডিআইটি হাউজের একটি ভাড়া করা ভবনে তিনশত ওয়াটের ট্রান্সমিটার ও একটি মাত্র স্টুডিও পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। জাপানের 'নিপ্পন ইলেকট্রনিক কোম্পানি' এই পরীক্ষামূলক সম্প্রচারের উদ্যোক্তা এবং তারাই প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সরবরাহ করে। পরবর্তীতে উক্ত কোম্পানির সার্বিক সহযোগিতায় ১৯৬৪ সালের ২৫শে ডিসেম্বর একটি অগ্রণী প্রকল্প হিসেবে এতদঞ্চলে পরীক্ষামূলকভাবে টেলিভিশন সম্প্রচারের নতুন অধ্যায় শুরু হয়। শুরুতে টেলিভিশনের সম্প্রচার এলাকা ছিল মাত্র ১৬ কিলোমিটার ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট। এদেশে টেলিভিশন ব্যক্তি মালিকানাধীন কোম্পানি হিসেবে যাত্রা করে এবং এ সময়ে এর নাম ছিল 'টেলিভিশন প্রোমোটার্স কোম্পানি লিমিটেড'।[১৯] ১৯৬৪ সালের ২৫শে ডিসেম্বরে অর্থাৎ 'বিটিভি'র প্রথম দিনের অনুষ্ঠানে ক্লাসিক্যাল কণ্ঠশিল্পী ফেরদৌসী রহমান গান গেয়েছিলেন। প্রথম দিকে বিটিভিতে দিনে তিন ঘণ্টা করে অনুষ্ঠান হতো এবং তা হতো বিকেলে। তবে সোমবার অনুষ্ঠান বন্ধ থাকতো। আর এ সময়ের ৬০ ভাগ অনুষ্ঠানই ছিল বিদেশি এবং ৪০ ভাগ ছিল নিজেদের তৈরি।[২০] ১৯৬৭ সালে তৎকালীন টেলিভিশন কোম্পানি থেকে কর্পোরেশনে পরিণত হয়। ১৯৬৮ সালে রামপুরায় নিজস্ব টেলিভিশন কমপ্লেক্স থেকে ৬ কিলোওয়াট ক্ষমতার ট্রান্সমিটার থেকে সম্প্রচার শুরু করা সম্ভব হয়।[২১]

এদেশে টেলিভিশন সম্প্রচারের প্রথম দিন থেকেই 'খবর' একটি আলাদা অনুষ্ঠান হিসেবে প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়। তবে তখনকার নিয়ম ছিল যে, কেবল বেতারে প্রচারিত সংবাদই টেলিভিশনে প্রচার করা যাবে। প্রথম দিনের অনুষ্ঠানের শুরুতেই গভর্নর মোনায়েম খানের ক্যাডিলাক গাড়িতে করে ডিআইটি ভবনে প্রবেশের দৃশ্য দেখানো হয়, সেখানে নেপথ্যে ঘোষক মারডেকাই কোহনের কণ্ঠে যোগ হয় 'শুভ সন্ধ্যা, পাইলট টেলিভিশন ঢাকা কেন্দ্রের শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে দর্শকদের স্বাগত জানাচ্ছি।[২২] বিটিভিতে ১৯৬৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে প্রথমবারের মতো নিউজ ফিল্ম সম্প্রচার করা হয়।[২৩] ১৯৬৮ এবং ১৯৭০ সালে বাংলাদেশ টেলিভিশনের বার্তা বিভাগ সুষ্ঠুভাবে গড়ে ওঠে। বার্তা বিভাগের দক্ষতার কারণেই ১৯৭০ সালের ১২ই নভেম্বরের প্রলয়ংকরী ঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের ছবিসহ যে সংবাদ বাংলাদেশ টেলিভিশন প্রচার টেলিভিশন অত্যন্ত সাহসী ভূমিকা পালন করে। ২৬শে মার্চ টেলিভিশন পাকিস্তানি শাসকচক্রের দখলে চলে যায়। ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর পাকিস্তানি বাহিনীর আত্মসমর্পণের পর কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধার করে এতে সারা বিশ্ব অবাক হয়ে যায়। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী ঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের তাণ্ডব দেখে রীতিমতো স্তম্ভিত হয়ে পড়ে। এছাড়া সত্তরের নির্বাচনে বিটিভির কভারেজও

---

[১৮] সুধাংশু শেখর রায়, পৃ. ১৫।
[১৯] তদেব, পৃ. ১৫।
[২০] তদেব, পৃ. ১৬।
[২১] নঈম তারিক, পৃ. ২১।
[২২] বিপ্লব শাহরিয়ার, পৃ. ৩১-৩২।
[২৩] তদেব, পৃ. ৩২।

ছিল অত্যন্ত প্রশংসনীয়। একাত্তরের অগ্নিঝরা উত্তাল দিনগুলোতে বিশেষ করে ১লা মার্চ থেকে ২৬শে মার্চ পর্যন্ত পাকিস্তানি শাসক চক্রের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে এদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন ও জাতীয়তাবাদী চেতনার প্রচারে তত্ত্বাবধানে ১৭ই ডিসেম্বর, 'পাকিস্তান টেলিভিশন কর্পোরেশন লিমিটেড'-এর পরিবর্তে 'বাংলাদেশ টেলিভিশন' লেখাটি ভেসে ওঠে টেলিভিশনের রূপালি পর্দায়। মুজিবনগর সরকারের নির্দেশে এর পর তিন দিন পর্যন্ত টেলিভিশন সম্প্রচার বন্ধ থাকে। ২১শে ডিসেম্বর থেকে নতুন আঙ্গিকে 'বাংলাদেশ টেলিভিশন কর্পোরেশন, ঢাকা কেন্দ্র' নামে নতুন করে প্রচার শুরু হয়। টেলিভিশনের নতুন singnature tune রচিত হয় 'ধনধান্যপুষ্পেভরা' এ গানটির স্বরলিপির উপর ভিত্তি করে।[২৪]

স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে একমাত্র টেলিভিশন চ্যানেল হিসেবে 'বাংলাদেশ টেলিভিশন' স্টুডিওর আধুনিকায়ন, উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন ট্রান্সমিটার স্থাপন, দেশের বিভিন্ন জেলায় উপকেন্দ্র স্থাপনসহ বাংলাদেশ টেলিভিশনের প্রযুক্তিগত ও অবকাঠামোগত উন্নয়নে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। ১৯৭২ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর বাংলাদেশের গেজেটে প্রকাশিত রাষ্ট্রপতির ১১৬:৫ নম্বর আদেশক্রমে বাংলাদেশে অবস্থিত সাবেক টেলিভিশনের যাবতীয় স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ করে তথ্য মন্ত্রণালয়ের হাতে ন্যস্ত করা হয়।[২৫] বাংলাদেশ টেলিভিশনকে জাতীয়করণের মূল উদ্দেশ্য ছিল দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের জনগণের কাছে পৌঁছানোর জন্য টিভি নেটওয়ার্ক আরো বিস্তৃত করা এবং দেশ ও জাতির সার্বিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করা। সে লক্ষ্যেই ১৯৭৫ সালের ৬ই মার্চ মাসে ঢাকার রামপুরায় 'বাংলাদেশ টেলিভিশন'-এর একটি সর্বাধুনিক স্টুডিও কমপ্লেক্স প্রতিষ্ঠিত হয়।[২৬] একই বছরে নেটওয়ার্ক বাড়ানোর প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে নাটোরে ছোটো আকারে একটি টিভি স্টেশন নির্মিত হয়। মাইক্রোওয়েভ সুবিধার অভাবে সেখানে ঢাকার রেকর্ড করা অনুষ্ঠান পরীক্ষামূলকভাবে প্রচার করা হয়। অতঃপর ১৯৭৬ থেকে ১৯৭৯ সালের মধ্যে বিটিভির নেটওয়ার্ক সারা দেশ জুড়ে বিস্তৃতির লক্ষ্যে চট্টগ্রাম, খুলনা, সিলেট, ময়মনসিংহ ও রংপুর উপকেন্দ্র চালু হয় এবং নাটোর উপকেন্দ্রকে মাইক্রোওয়েভ নেটওয়ার্কের আওতায় উপকেন্দ্র এবং রাঙ্গামাটি, কক্সবাজারে পুনঃপ্রচারকেন্দ্র এবং ১৯৮৮ সালে সাতক্ষীরায় পুনঃপ্রচারকেন্দ্র স্থাপিত হয়। ফলে ১৯৮৮ সাল নাগাদ দেশের জনবসতির ৮০ ভাগ এলাকা অর্থাৎ দেশের ভৌগোলিক এনে ঢাকার অনুষ্ঠানমালা পূর্ণাঙ্গ আকারে রিলে করার ব্যবস্থা নেওয়া হয়। এভাবে প্রাথমিকভাবে দেশের জনবসতির প্রায় ৭৫ ভাগ এলাকা টিভি সম্প্রচারের আওতায় আসে।[২৭] ১৯৮০ সালের ডিসেম্বরে বাংলাদেশে রঙিন টেলিভিশন চালু হয়।[২৮] ১৯৮১-১৯৮২ সাল নাগাদ নোয়াখালীর বেগমগঞ্জে একটি আয়তনের ৭০% টিভি কভারেজের আওতায় চলে আসে।[২৯]

১৯৭৬ সালে বেতবুনিয়া ভূউপগ্রহ কেন্দ্রের মাধ্যমে অনুষ্ঠান গ্রহণ ও প্রচার শুরু হয়। ১৯৮০ সালের দিকে টিভির সম্প্রচার আরো বিস্তৃত করার জন্য ১৮ কিলোওয়াট শক্তিসম্পন্ন সর্বাধুনিক দুটি ট্রান্সমিটার সংস্থাপন করা হয়। তাছাড়া ঢাকায় ট্রান্সমিটারের উচ্চতা ৪৫০ ফুট পর্যন্তে বাড়ানো হয়।

---

[২৪] *তদেব*, পৃ. ৩২-৩৩।
[২৫] *তদেব*, পৃ. ৩২।
[২৬] সুধাংশু শেখর রায়, পৃ. ১৪।
[২৭] বিপ্লব শাহরিয়ার, পৃ. ৩৩।
[২৮] সুধাংশু শেখর রায়, পৃ. ১৬।
[২৯] বিপ্লব শাহরিয়ার, পৃ. ৩৩।

১৯৮০ সালের ডিসেম্বর থেকে পুরানো ১০ কিলোওয়াট ট্রান্সমিটার শুধু ঢাকার দর্শকদের জন্য দ্বিতীয় চ্যানেল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। খুব বেশি দর্শকপ্রিয়তা না পাওয়ায় ১৯৮৪ সালের ডিসেম্বরে দ্বিতীয় চ্যানেলটি বন্ধ হয়ে যায়। উন্নত বিশ্বের সাথে তাল মেলাতে গিয়ে ১৯৮০ সালের ১লা ডিসেম্বর রঙিন অনুষ্ঠান সম্প্রচার শুরু করলেও সম্প্রচারিত অনুষ্ঠানের ৬০ ভাগই ছিল সাদাকালো।[৩০] তবে সংবাদ পাঠ, সংবাদ চিত্র, স্টুডিওর বাইরে ধারণ করা অনুষ্ঠান, বিদেশি ফিল্ম ও ভিডিও ক্যাসেট ভিত্তিক অনুষ্ঠান রঙিন সম্প্রচারের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ফ্রান্স সরকারের অনুদানে ১৯৯৬ সালের ১৯শে ডিসেম্বর বাংলাদেশ টেলিভিশনের চট্টগ্রাম কেন্দ্র চালু হয়। এ কেন্দ্র থেকে প্রতিদিন দেড় ঘণ্টা স্থানীয় সম্প্রচার চালু হয় এবং প্রতিদিন পাঁচ মিনিটের বাংলা স্থানীয় সংবাদ প্রচারিত হয়।

স্বাধীনতা পরবর্তী প্রায় তিন দশক জুড়েই বিটিভিই ছিল সংবাদ ও বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানের জন্য এদেশের একমাত্র টিভি চ্যানেল। তিন দশকের পথ পরিক্রমায় বিটিভির অন্যতম প্রধান অনুষ্ঠানই ছিল 'খবর'। তবে এ কথা সত্য যে, সরকার নিয়ন্ত্রিত বিটিভির খবর দেশীয় সংবাদ পরিবেশনে বরাবরই সরকারের প্রতি অনুগত থেকে একপেশে সংবাদ পরিবেশন করতে বাধ্য হয়েছে। বিটিভির সংবাদ পরিবেশনা সম্পর্কে মিডিয়া গবেষক মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর বলেন :

> বিটিভির খবর যে গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান সেটা বলার অপেক্ষা রাখে না। তবে বিটিভির খবর দেখে সেই গুরুত্ব অনুভব করা যায় না। যারা উন্নত দেশে টিভির খবর দেখেছেন ও শুনেছেন, একমাত্র তাঁরাই অনুভব করতে পারবেন টিভির খবর কত হৃদয়গ্রাহী, তথ্য বহুল, বিশ্লেষণাত্মক ও জনপ্রিয় হতে পারে। তুলনা করে লাভ নেই, তবু বলব, আমাদের টিভির দেশীয় খবরাংশ দেখে বোঝার উপায় নেই দেশে সত্যি কী ঘটছে। টিভির খবরকে নিরানন্দ, বোরিং, একদেশদর্শী ও পানসে করে দেয়ার ব্যাপারে বিটিভির জুড়ি নেই।[৩১]

তবে সচিত্র প্রতিবেদনসহ আন্তর্জাতিক সংবাদের ব্যাপারে স্বাধীনতা পরবর্তী তিন দশকে বিটিভির প্রতি দর্শকরা আগ্রহী ছিল। সরকারি নিয়ন্ত্রণ এবং অন্যান্য কারণে বিটিভির বার্তা বিভাগের কিছু সীমাবদ্ধতা থাকলেও টিভি রিপোর্টিংয়ের ক্ষেত্রে 'খবর' এর বাইরে কিছু অনুষ্ঠান টিভি সাংবাদিকতার অনন্য দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। যেমন: 'যদি কিছু মনে না করেন', 'আইন আদালত', 'ইত্যাদি' এসব অনুষ্ঠানে টিভি রিপোর্টিংয়ের মাধ্যমে সামাজিক সমস্যা ও নানান অসংগতি তুলে ধরা হয়। 'যদি কিছু মনে না করেন' অনুষ্ঠানটির সফল পরিচালক ফজলে লোহানীর (১৯২৮-১৯৮৫) অনবদ্য টিভি রিপোর্টিংয়ের জন্য তাঁকে বাংলাদেশে 'আধুনিক টিভি সাংবাদিকতার জনক' হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। এ সম্পর্কে মিডিয়া গবেষক মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর বলেন :

> আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে, মরহুম ফজলে লোহানী তাঁর 'যদি কিছু মনে না করেন' অনুষ্ঠানে যে বিশেষ টিভি রিপোর্ট প্রচার করতেন তা এক কথায় অনবদ্য। বলা যায়, ফজলে লোহানীর টিভি প্রতিবেদন টিভি মাধ্যমটির গ্রহণযোগ্যতা অনেক গুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। দর্শকদের কাছ থেকে তিনি যে ফীডব্যাক পেয়েছেন তাও অতুলনীয়। ফজলে লোহানীকে বাংলাদেশে টিভি সাংবাদিকতার জনক বলা যায়।[৩২]

এরশাদ আমলে (১৯৮২-১৯৯০) এবং এর পরেও দেশীয় খবরের ব্যাপারে মানুষ বিটিভির চেয়ে বিদেশি বেতারের প্রতিই বেশি নির্ভরশীল ছিল। তবে এশিয়াভিশন এবং ইউরোভিশনের কল্যাণে প্রাপ্ত বিদেশি সংবাদের ব্যাপারে বিটিভির প্রতি দর্শকদের আগ্রহ ছিল। ইএনজি (ENG) অর্থাৎ ইলেকট্রনিক

---

[৩০] *তদেব*, পৃ. ৩৩-৩৪। ,

[৩১] মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর, *টেলিভিশন ভাবনা* (ঢাকা: অনুপম প্রকাশনী, ১৯৯৭), পৃ. ২৯।

[৩২] *তদেব*, পৃ. ৩১।

নিউজ গ্যাদারিং প্রযুক্তির প্রয়োগের ফলে বিটিভির খবরে প্রযুক্তিগত উন্নতি হয়েছে। নব্বইর দশকের শুরুতে বাংলাদেশে বিশেষত ঢাকাতে ডিশ এন্টেনার আবির্ভাবের মধ্য দিয়ে খবর ও অনুষ্ঠান প্রচারে বিটিভির একাধিপত্যে ছেদ পড়েছে।

বেসরকারি টিভি চ্যানেলের যাত্রা

আধুনিক প্রযুক্তি কাজে লাগিয়ে ২০০০ সালের ১৪ই এপ্রিল বেসরকারি খাতে প্রথম ও একমাত্র টেরেস্ট্রিয়াল চ্যানেল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে 'একুশে টেলিভিশন', যা এদেশের গণমাধ্যম জগতে আলোড়ন সৃষ্টি করে। আন্তর্জাতিক মিডিয়ার স্টাইল অনুসরণ করে পরিবেশিত অনন্য টিভি রিপোর্টিং ও সংবাদ উপস্থাপনার কারণে রাতারাতিই চ্যানেলটি জনপ্রিয়তার শীর্ষে পৌছে যায়। তথ্য ও চিত্রের সুসমন্বিত বিশেষায়িত প্যাকেজ রিপোর্টিংয়ের মাধ্যমে একুশে টিভি এদেশের টিভি সাংবাদিকতায় নতুন দিগন্ত উন্মোচন করে। একুশে টিভির অনন্য স্টাইলের বদৌলতে অনেক রিপোর্টারই একেবারে তারকা খ্যাতি লাভ করেন। বিটিভির গতানুগতিক সংবাদ উপস্থাপনা ও রিপোর্টিংয়ের বাইরে একুশে টিভির শৈল্পিক সংবাদ উপস্থাপনা ও রিপোর্টিং দেখে অনেকেই তখন টিভি সাংবাদিকতাকে 'গ্ল্যামারাস পেশা' হিসেবে ভাবতে শেখেন। উল্লেখ্য যে, এদেশের প্রথম বেসরকারি টিভি চ্যানেল 'এটিএন বাংলা' হলেও বেসরকারি টিভি চ্যানেল হিসেবে 'একুশে টেলিভিশন'ই প্রথম সংবাদ প্রচার শুরু করে। আর 'এটিএন বাংলা' সংবাদ শুরু করে ২০০১ সালের ১৬ই আগস্ট থেকে। একুশে টিভির এই সফলতার নেপথ্যে ছিলেন সাংবাদিক সায়মন ড্রিং। কেননা এ চ্যানেলটি সম্প্রচারের আগেই সায়মন ড্রিংয়ের তত্ত্বাবধানে একদল সাংবাদিককে প্রশিক্ষিত করা হয় এবং তাদের সমন্বিত কর্ম প্রচেষ্টার ফলেই একুশে টিভির সংবাদও বিনোদনের এক নতুন উপাদানে পরিণত হয়। লাইসেন্স সংক্রান্ত জটিলতায় আদালতের রায়ে ২০০২ সালের ২৯শে আগস্ট একুশে টিভির টেরেস্ট্রিয়াল সম্প্রচার বন্ধ হয়ে যায়। তবে পরে ১৪ই এপ্রিল ২০০৫ স্যাটেলাইটের মাধ্যমে সম্প্রচারের অনুমোদন পায় এবং ২০০৭ সালের ২৯শে মার্চ আবারও আনুষ্ঠানিকভাবে একুশে টিভির স্যাটেলাইট সম্প্রচার চালু হয়।[৩৩]

একুশে টিভি চালু হওয়ার আগেই অনুষ্ঠান রফতানির মাধ্যমে বেসরকারি পর্যায়ে টিভি অনুষ্ঠান প্রচারের ধাপে প্রবেশ করে বাংলাদেশ। ১৯৯৭ সালের ১৫ই জুলাই ভারতের তৎকালীন এটিএন নামের স্যাটেলাইট চ্যানেলে একটি নির্দিষ্ট সময় ভাড়া করে বাংলাদেশি অনুষ্ঠান সম্প্রচার শুরু করে মাল্টিমিডিয়া প্রোডাকশন লিমিটেড। ধীরে ধীরে বাংলাদেশের অনুষ্ঠানের সময়সীমা বাড়তে থাকে এবং এক পর্যায়ে মাল্টিমিডিয়া প্রোডাকশন লিমিটেড পুরো এটিএন বাংলা চ্যানেলের মালিকানা কিনে নেয়। ২০০১ সাল থেকে এটিএন বাংলায় খবর প্রচার করা শুরু করা হয়।[৩৪] অন্যদিকে ১৯৯৯ সালের ১লা আক্টোবর, ইমপ্রেস টেলিফিল্ম লিমিটেড, বাংলাদেশ টেলিভিশনের জন্য প্যাকেজ নাটক এবং অনুষ্ঠান নির্মাণের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে চালু করে 'চ্যানেল আই' স্যাটেলাইট টেলিভিশন চ্যানেল। শুরু থেকেই ২৪ ঘন্টার ডিজিটাল এই চ্যানেলটি মানসম্পন্ন অনুষ্ঠান নির্মাণের জন্য জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। ২০০১ সাল থেকে প্রচার হয় চ্যানেল আই সংবাদ।[৩৫]

---

[৩৩] http: www.ekushey-tv.com.

[৩৪] http: www.atnbangla.tv.

[৩৫] http: www.channelitv.net.

'সময়ের সাথে আগামীর পথে' শ্লোগান নিয়ে ২০০৩ সালের ৩রা জুলাই, ইন্টারন্যাশনাল টেলিভিশন চ্যানেল লিমিটেড-এর উদ্যোগে সম্প্রচার শুরু করে 'এনটিভি'। অত্যাধুনিক প্রযুক্তি, ঝকঝকে ছবি, মানসম্মত অডিও ও ভিডিও ধারণের কারণে শুরুতেই দর্শকের নজর কাড়ে এ চ্যানেলটি। তাছাড়া রিয়েলিটি শো এবং রুচিসম্মত অনুষ্ঠানের জন্য ব্যাপক দর্শকপ্রিয়তা অর্জন করে এনটিভি। সম্প্রচারের প্রথম দিন থেকেই খবর পরিবেশন করা শুরু করে চ্যানেলটি।[৩৬]

এটিএন বাংলা, চ্যানেল আই এবং এনটিভি এই তিনটি চ্যানেলসহ পরবর্তীতে চালু হওয়া টিভি চ্যানেলগুলোর সংবাদ উপস্থাপনা ও রিপোর্টিংয়ের বেলায় একুশে টিভির সেট করা টিভি সাংবাদিকতার মডেলকেই অনুসরণ করেছে বললে অত্যুক্তি হবে না। আর এ কারণেই বিটিভি-র সংবাদের প্রতি দর্শকরা আগ্রহ হারিয়ে ফেললেও বেসরকারি স্যাটেলাইট চ্যানেলের সংবাদের প্রতি দর্শকরা আকর্ষণবোধ করে। বেসরকারি স্যাটেলাইট চ্যানেলের পাশাপাশি বিটিভিও ২০০৪ সালের ১১ই এপ্রিল থেকে 'বিটিভি ওয়ার্ল্ড' নামে চালু করে সরকারি স্যাটেলাইট চ্যানেল চালুর মাধ্যমে ২৪ ঘণ্টা ব্যাপী অনুষ্ঠান প্রচার করছে।[৩৭] বেসরকারি চ্যানেল 'বৈশাখী টিভি' ২০০৪ সালের ২৭শে ডিসেম্বর থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে সম্প্রচার শুরু করে। 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনায়' শ্লোগান নিয়ে দেশীয় সংস্কৃতিকে প্রাধান্য দিয়ে এ চ্যানেলটি সংবাদ ও অনুষ্ঠান প্রচার করছে।[৩৮] পরবর্তী এক বছরের মধ্যেই ২০০৫ সালের ২৬শে ডিসেম্বরে নতুন চ্যানেল হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করে 'আরটিভি'। রাজধানীর কাওরান বাজারে আরটিভির প্রধান কার্যালয় অবস্থিত।[৩৯] আরটিভির পরে ২০০৬ সালের ২৪শে জানুয়ারি থেকে বিনোদনভিত্তিক চ্যানেল হিসেবে আনুষ্ঠানিক সম্প্রচার শুরু করে 'চ্যানেল ওয়ান'। লাইসেন্স সংক্রান্ত জটিলতার কারণে ২০১০ সালের ২৭শে এপ্রিল এ চ্যানেলটি বন্ধ হয়ে যায়।[৪০] 'চ্যানেল ওয়ান' এর আনুষ্ঠানিক সম্প্রচারের মাত্র দুই মাস পরেই ২০০৬ সালের ৩১শে মার্চ যাত্রা শুরু করে 'বাংলাভিশন'। এ চ্যানেলটি ছিল বিএনপি নেতৃত্বাধীন চার দলীয় জোট সরকারের (২০০১-২০০৬) সময়ের সর্বশেষ নতুন টিভি চ্যানেল। 'দৃষ্টি জুড়ে দেশ' এই শ্লোগান নিয়ে সম্প্রচারের প্রথম দিন থেকেই চ্যানেলটি সংবাদ ও অনুষ্ঠান প্রচার করে আসছে।[৪১] এ দেশের প্রথম ২৪ ঘণ্টা সংবাদভিত্তিক চ্যানেল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে 'সিএসবি নিউজ'। চ্যানেলটি পরীক্ষামূলক সম্প্রচার শুরু করে ২৪শে মার্চ ২০০৭ সালে এবং আনুষ্ঠানিকভাবে সম্প্রচার শুরু হয় ২০০৭ সালের ৭ই এপ্রিল থেকে। শুধুমাত্র সংবাদভিত্তিক চ্যানেল হিসেবে প্রচারের কয়েক মাসের মধ্যেই 'সিএসবি নিউজ' দর্শকমহলে ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করে। পরবর্তীতে ২০০৭ সালের ২০শে থেকে ২২শে আগস্টে সংঘটিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে উত্তেজনাকর পরিস্থিতি সম্পর্কিত সংবাদ পরিবেশনার ব্যাপারে তৎকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার (২০০৭-২০০৮), ২০০৭ সালের ২৩শে আগস্ট 'সিএসবি নিউজ'কে প্রথমে সতর্ক করে এবং পরে ২০০৭ সালের ৬ই সেপ্টেম্বর সরকারি আদেশে চ্যানেলটির সম্প্রচার বন্ধ হয়ে যায়।[৪২] 'একটি সুন্দর পৃথিবীর জন্য' এই শ্লোগান নিয়ে ইসলামি মূল্যবোধ বিকাশের লক্ষ্যে ২০০৭

---

[৩৬] http: www.ntvbd.tv.
[৩৭] http: www.moi.gov.bd
[৩৮] www.boishakhi.tv
[৩৯] http: www.rtv.online.com
[৪০] http: www.wikipedia.org
[৪১] http: www.jagobd.com
[৪২] http: www.mediabangladesh.net

সালের ২৪শে মার্চ যাত্রা শুরু করে 'ইসলামিক টিভি'।[৪৩] রাজধানীর শাপলা চত্বরে ২০১৩ সালের ৫ই ও ৬ই মে হেফাজতে ইসলামের সমাবেশ সংক্রান্ত সংবাদ পরিবেশনার জের ধরে ২০১৩ সালের ৬ই মে মধ্যরাত থেকে চ্যানেলটির সম্প্রচার বন্ধ হয়ে যায়।[৪৪] দিগন্ত মিডিয়া কর্পোরেশনের উদ্যোগে দৈনিক নয়া দিগন্তের সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসেবে 'দিগন্ত টেলিভিশন' ২০০৮ সালের ২৮শে আগস্ট থেকে আনুষ্ঠানিক সম্প্রচার শুরু করে। 'সত্য ও সুন্দরের পক্ষে' এই শ্লোগান নিয়ে চ্যানেলটি ১৬ ঘণ্টা সংবাদ ও সংবাদভিত্তিক অনুষ্ঠান এবং ৮ ঘণ্টা বিনোদনভিত্তিক অনুষ্ঠান প্রচার করে।[৪৫] 'ইসলামিক টেলিভিশন'-এর মতো একই কারণে ২০১৩ সালের ৬ই মে মধ্যরাত থেকে এ চ্যানেলটির সম্প্রচার বন্ধ হয়ে যায়।[৪৬] আওয়ামীলীগ নেতৃত্বাধীন মহাজোট সরকারের (২০০৯-২০১৩) সময়ের প্রথম বেসরকারি চ্যানেল হিসেবে ২০০৯ সালের ২৬ মার্চে 'দেশ টিভি' আনুষ্ঠানিক সম্প্রচার শুরু করে। মধ্যপ্রাচ্য, অস্ট্রেলিয়া, যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপের দর্শকরাও দেশটিভির সংবাদ ও বিনোদন অনুষ্ঠান উপভোগ করছেন।[৪৭] এটিএন বাংলা চ্যানেলের সিস্টার কনর্সান (sister concern) হিসেবে ২৪ ঘণ্টা সংবাদভিত্তিক চ্যানেল হিসেবে 'এটিএন নিউজ' আত্মপ্রকাশ করে ২০১০ সালের ৭ই জুন। 'বাংলার ২৪ ঘণ্টা' এ শ্লোগান নিয়ে চ্যানেলটি শুধু সংবাদ ও সংবাদভিত্তিক অনুষ্ঠান প্রচার করছে।[৪৮] বেক্সিমকো গ্রুপের উদ্যোগে ২৪ ঘণ্টার সংবাদভিত্তিক চ্যানেল হিসেবে 'ইনডিপেনডেন্ট টেলিভিশন' ২০১০ সালের মার্চে বাংলাদেশ সরকার থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে সম্প্রচারের অনুমোদন পায় এবং একই বছরের ৩০শে অক্টোবর থেকে চ্যানেলটি আনুষ্ঠানিক সম্প্রচার শুরু করে।[৪৯] ২০১০ সালে আরো দু'টি বেসরকারি টিভি-চ্যানেল আনুষ্ঠানিকভাবে সম্প্রচার শুরু করে। এ চ্যানেল দুটি হলো 'মোহনা টিভি' (১১ই নভেম্বর, ২০১০),[৫০] এবং 'মাইটিভি' (২০শে ডিসেম্বর, ২০১০)।[৫১] ২০১১ সালে আরো পাঁচটি নতুন স্যাটেলাইট চ্যানেল আনুষ্ঠানিক সম্প্রচার শুরু করে। চ্যানেলগুলো হলো 'চ্যানেল নাইন' (৮ এপ্রিল, ২০১১),[৫২] 'সময় টিভি' (১৭ এপ্রিল, ২০১১),[৫৩] 'আছরাঙা টিভি' (৩০ জুলাই, ২০১১),[৫৪] 'বিজয় টিভি' (১৬ ডিসেম্বর, ২০১১),[৫৫] এবং 'চ্যানেল সিক্সটিন' (১৬ ডিসেম্বর, ২০১১)।[৫৬] ২০১২ সালে সম্প্রচার শুরু করে 'চ্যানেল টুয়েন্টিফোর' (২৪শে মে, ২০১২),[৫৭] 'গাজী টিভি' (১২ই জুন,

---

[৪৩] http: www.wikipedia.org
[৪৪] *দৈনিক প্রথম আলো*, ৭ মে, ২০১৩।
[৪৫] http: www.wikipedia.org
[৪৬] *দৈনিক প্রথম আলো*, ৭ মে, ২০১৩।
[৪৭] www.desh.tv
[৪৮] www.atnbangla.tv
[৪৯] www.jagobd.com
[৫০] www.mohonatv.com
[৫১] www.mytvbd.tv
[৫২] www.mediabangladesh.net
[৫৩] www.somoynews.tv
[৫৪] www.mediabangladesh.net
[৫৫] www.jagobd.com
[৫৬] www.jagobd.com
[৫৭] www.jagobd.com

২০১২),[৫৮] এবং 'একাত্তর টিভি' (২১শে জুন, ২০১২)।[৫৯] ২০১৩ সালের ১৯শে জানুয়ারি এবং ২৭শে জানুয়ারি আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করে যথাক্রমে 'এসএ টিভি,'[৬০] এবং 'এশিয়ান টিভি'।[৬১] ২০১৪ সালের ৫ই এপ্রিল থেকে 'যমুনা টিভি আনুষ্ঠানিক সম্প্রচার শুরু করে। উপরোক্ত চ্যানেলসমূহ ছাড়াও 'গান বাংলা টিভি' এবং 'মিলেনিয়াম টেলিভিশন' পরীক্ষামূলক সম্প্রচার শুরু করেছে যথাক্রমে ২০১৩ সালের ১৪ই অক্টোবর এবং ২০১৩ সালের ১৪ই আগস্ট থেকে।[৬২] এছাড়া আরো তেরোটি নতুন স্যাটেলাইট চ্যানেল সরকারি অনুমোদনের বিবেচনাধীন রয়েছে।[৬৩] স্যাটেলাইট চ্যানেল ছাড়াও বেসরকারি পর্যায়ে বাংলাদেশে চালু রয়েছে অনলাইনভিত্তিক কয়েকটি টিভি চ্যানেল। বাংলাদেশের প্রথম ইন্টারনেট টেলিভিশন 'বাংলা টুয়েন্টিওয়ান টিভি' ২৭শে এপ্রিল, ২০১২ সালে চালু হয়।[৬৪] এছাড়াও এটিএন গ্রুপের কনসার্ন হিসেবে অনলাইনভিত্তিক থ্রিজি চ্যানেলরূপে 'এটিএন মিউজিক টিভি' এবং 'এটিএন ইসলামিক টিভি' যথাক্রমে ৩রা জুন এবং ২৭শে জুলাই, ২০১৪ অনুষ্ঠান প্রচার শুরু করে।[৬৫]

ইন্টারনেট সংযোগের মাধ্যমে কম্পিউটার, ল্যাপটপ কিংবা অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল সেটের মাধ্যমে পৃথিবীর যে কোনো প্রান্ত থেকে এ সব অনলাইনভিত্তিক টিভি চ্যানেলর সংবাদসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠান উপভোগ করা সম্ভব। অনলাইনভিত্তিক এ সব চ্যানেল অবশ্যই বাংলাদেশে টিভি সম্প্রচারের ক্ষেত্রে এক নতুন মাত্রা যোগ করেছে। অন্যদিকে বাংলাদেশ থেকে সম্প্রচারিত স্যাটেলাইট চ্যানেলসমূহের অনলাইন ভার্সন থাকায় দর্শকদের কাছে টিভি সম্প্রচারের দিগন্ত আরো বেশি প্রসারিত হয়েছে। বাংলাদেশে বর্তমানে (২০১৪ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত) বন্ধ হওয়া চ্যানেলসমূহ ছাড়া বেসরকারি পর্যায়ে ২৩টি স্যাটেলাইট চ্যানেল চালু আছে। (পরিশিষ্ট দেখুন)

বর্তমানে চলমান অধিকাংশ বেসরকারি টিভি চ্যানেলের মালিকানায় রয়েছেন ব্যবসায়ী এবং রাজনীতিবিদরা। তাই অনেক টিভি চ্যানেলের বিরুদ্ধে এরকম অভিযোগ রয়েছে যে, এসব চ্যানেলের সাংবাদিকতা, মালিকপক্ষের ব্যবসায়িক এবং রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। তাই বেশ কিছু টিভি চ্যানেলে পেশাদারি সাংবাদিকতার মান দারুণভাবে ক্ষুণ্ন হচ্ছে। কিছু কিছু চ্যানেলে মালিক নিরেট রাজনীতিবিদ হওয়ায় সেসব চ্যানেলে রাজনৈতিক পক্ষপাতদুষ্ট সংবাদ পরিবেশনের অভিযোগ রয়েছে।

অধিকাংশ স্যাটেলাইট চ্যানেলের অতি বাণিজ্যমুখী প্রবণতার কারণে সামাজিক দায়বদ্ধতা ও গণমানুষের আকাঙ্ক্ষার বিষয়টি অনেকাংশে উপেক্ষিত হচ্ছে। মুনাফামুখী দৃষ্টিভঙ্গি, মালিকের রাজনৈতিক ও ব্যবসায়িক স্বার্থ সংরক্ষণ করতে গিয়ে অনেক টিভি চ্যানেলেই গণমানুষের স্বার্থ ও

---

[৫৮] www.wikipedia.org
[৫৯] www.jagobd.com
[৬০] www.jagobd.com
[৬১] www.jagobd.com
[৬২] www.jagobd.com
[৬৩] লাইসেন্সের জন্য অপেক্ষমাণ এ তেরোটি স্যাটেলাইট চ্যানেলসমূহ হলো: গ্রীন টিভি, নিউজ টুয়েন্টিফোর, তিতাস টিভি, ঢাকা বাংলা টেলিভিশন, মিলেনিয়াম টিভি, নিউ ভিশন টিভি, রেনেসাঁ টিভি, রঙধনু টিভি, ক্যামব্রিয়ান টেলিভিশন, যাদু মিডিয়া টিভি, চ্যানেল টুয়েন্টিওয়ান, আমার গান, এ টিভি। (http: www.mediabangladesh.net)
[৬৪] www.jagobd.com.
[৬৫] www.jagobd.com

দাবিকে পাস কাটিয়ে পরিবেশিত হচ্ছে নিয়ন্ত্রিত সংবাদ। বেসরকারি টেলিভিশনের কাঠামোই এমন যে, এখানে সিদ্ধান্ত সবসময়ে শীর্ষ-তল ধারায় প্রবাহিত হয়। টিভি চ্যানেলেই কর্পোরেট আধিপত্য বেড়ে যাওয়ায় মালিকদের ইচ্ছে অনিচ্ছেই হয়ে উঠছে মুখ্য বিবেচ্য বিষয় আর এর ফলে সাংবাদিকদের স্বাধীনতা আরো সংকুচিত হয়ে পড়ছে। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, অনেক রিপোর্টারই এমন অভিযোগ করেছেন যে, মালিকপক্ষের চাপে তারা হয় পুরো একটি বিষয়কে এড়িয়ে যেতে বাধ্য হয়েছেন অথবা আংশিক সত্য প্রকাশ করতে পেরেছেন। কেননা কর্মক্ষেত্রে সাংবাদিকদের সবচেয়ে সমস্যাজনক বিষয় হলো যে সংবাদ প্রযোজক, উপস্থাপক এবং রিপোর্টারদেরকে চাকরিতে টিকে থাকতে চাইলে সচরাচর অবশ্যই চুক্তি স্বাক্ষর করতে হয়, যা গণতান্ত্রিক সমাজের মৌলিক অধিকারকে বাধাগ্রস্ত করে। মূলত সাংবাদিকদেরকে প্রতিনিয়ত এ ধরনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে দায়িত্ব পালন করতে হয়। নানা চাপ এবং বাধা সত্ত্বেও বেশ কিছু টিভি চ্যানেলের সাংবাদিকরা সাহসিকতার সাথে দায়িত্ব পালন করে আসছেন। ২০০৩ সালের ইরাক যুদ্ধের সময়ে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বাগদাদ থেকে আনিস আলমগীর যে টিভি রিপোর্টিং করেছেন, তা এক কথায় চরম দুঃসাহসিক এবং বাংলাদেশের চ্যালেঞ্জিং টিভি সাংবাদিকতার এক অনন্য দৃষ্টান্ত।

পেশাগত দক্ষতা ও প্রযুক্তিগত মানের দিক থেকে আমাদের দেশে টিভি সাংবাদিকতা অনেক দূর এগিয়েছে এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে বেসরকারি টেলিভিশনের উদ্যোক্তাদের খানিকটা ভুল সিদ্ধান্তের কারণে চাহিদা অনুযায়ী উল্লেখযোগ্য সংখ্যক প্রশিক্ষিত টিভি সাংবাদিক গড়ে উঠছে না।

তবে এ কথা সত্য যে, একুশে টিভি-র প্রাক্তন সাংবাদিক জ. ই. মামুন, মুন্নী সাহা, তুষার আবদল্লাহ, শাহনাজ মুন্নী, সুপন রায়, শামসুদ্দিন হায়দার ডালিম, হাসনাইন খুরশেদ, মোস্তফা ফিরোজ প্রমুখ প্রশিক্ষিত রির্পোটাররা বর্তমানে বিভিন্ন টিভি চ্যানেলে কর্মরত আছেন এবং তাদের তত্ত্বাবধানে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় প্রাতিষ্ঠানিক ডিগ্রিধারীরা টিভি সাংবাদিকতায় যুক্ত হয়ে বেশ ভাল রিপোর্টিং করছেন যা আমাদের টিভি সাংবাদিকতাকে আরো এগিয়ে নিয়ে যাবে এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

আমাদের দেশে বেসরকারি টিভি চ্যানেলের সংবাদের প্রতি দর্শকদের যেমন আকর্ষণ রয়েছে তেমনি অযাচিতভাবে বিজ্ঞাপনে বিঘ্নিত সংবাদের ব্যাপারে রয়েছে প্রবল আপত্তি। গত কয়েক বছরে সংবাদের মাঝে বিজ্ঞাপন প্রচারের বিষয়টি এমন একটি জায়গায় চলে গেছে তা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়।

সংবাদের প্রতিটি শ্লট এখন বিজ্ঞাপনদাতাদের কাছে বিক্রি হয়ে যায়। সংবাদের চেহারাই এখন এ রকম যে, তা বিজ্ঞাপনের আগে পরে বা মাঝখানে পরিবেশিত হয়। সংবাদের মাঝে বিজ্ঞাপন নয় বরং বিজ্ঞাপনের মাঝে একটু সংবাদ পরিবেশনা। উদাহরণস্বরূপ ৩ সেপ্টেম্বর ২০০৯ তারিখ এনটিভির সাড়ে দশটার সংবাদে দেখা গেছে ৪৭ মিনিট ব্যাপী প্রচারিত সংবাদ-অনুষ্ঠানে ২৭ মিনিট সংবাদ প্রচারিত হয়েছে এবং বিজ্ঞাপন প্রচারিত হয়েছে প্রায় ২০ মিনিট জুড়ে। সংবাদের উপস্থিতি একটু বেশি সময় জুড়ে হলেও তার শরীর মোড়া ছিল বিজ্ঞাপনেই। কারণ এনটিভির সংবাদ শিরোনাম ছিল 'পূর্বাচল আমেরিকান সিটি শিরোনাম', 'অর্থনীতির সংবাদের শিরোনাম ছিল, 'পাইওনিয়ার ইন্সুরেন্স অর্থনীতির খবর'। একই দিনে চ্যানেল আইতে বিজ্ঞাপন বিরতিতে দেখা গেল, ইস্টার্ন ব্যাংক বিরতি, সিটিসেল সংবাদ শিরোনাম, গ্রীন ডেল্টা বাণিজ্য সংবাদ। প্রায় প্রতিটি প্রাইভেট চ্যানেলই এভাবে সংবাদ উপস্থাপন করছে যেন মনে হয় সংবাদ নয় এটি বিজ্ঞাপন মেলা। এ ধরনের অধিকতর মুনাফামুখী প্রবণতা গ্রহণযোগ্য নয়।

স্বাধীনতার চার দশকের অধিককাল অতিক্রান্ত হলেও বাংলাদেশে সরকারি-বেসরকারি টেলিভিশন ও বেতারের জন্য কোনো সুনির্দিষ্ট সম্প্রচার নীতিমালা ছিল না। এ লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার 'জাতীয় সম্প্রচার নীতিমালা-২০১৪' প্রণয়ন করেন এবং গত ৪ঠা আগস্ট, ২০১৪ মন্ত্রীসভায় নীতিগতভাবে অনুমোদন করেন। মন্ত্রীসভায় অনুমোদনের পর ৭ই আগস্ট, ২০১৪ তথ্য মন্ত্রণালয় এ সংক্রান্ত একটি গেজেট প্রকাশ করেন।[৬৬] দীর্ঘদিন পর 'জাতীয় সম্প্রচার নীতিমালা' প্রণয়ন নিঃসন্দেহে একটি ভালো ও প্রশংসনীয় উদ্যোগ। কিন্তু এ সম্প্রচার নীতিমালায় সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি সার্বিকভাবে কর্তৃত্ববাদী ও নিয়ন্ত্রণমূলক হওয়ায় এ নিয়ে আলোচনা, সমালোচনা ও বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে এবং সংবাদকর্মীসহ সংশ্লিষ্ট সকলের মধ্যে উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা, সংশয় ও সন্দেহের অবকাশ পরিলক্ষিত হয়। তবে গণতন্ত্র ও প্রচার মাধ্যমের স্বাধীনতা একটি অন্যটির অনুষঙ্গ বলে একটি সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য জাতীয় সম্প্রচার নীতিমালা থাকা আবশ্যক।

উপসংহার

প্রায় পাঁচ দশকের পথ পরিক্রমায় নানা চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে উন্নত বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে বাংলাদেশের টেলিভিশন সাংবাদিকতা নতুন নতুন প্রযুক্তির উৎকর্ষে দিনে দিনে আরো সমৃদ্ধ ও বিকশিত হচ্ছে। স্যাটেলাইট এবং অনলাইনের সুবাদে আমাদের টিভি চ্যানেলের সংবাদ ও অনুষ্ঠান এখন দেশের সীমানা পেরিয়ে বলা যায় পৃথিবী জুড়েই সম্প্রচারিত হচ্ছে। বিংশ শতাব্দী এবং একবিংশ শতাব্দীর প্রাযুক্তিক বিপ্লবে আমাদের টিভি সাংবাদিকতা দারুণভাবে প্রভাবিত। সর্বাধুনিক প্রযুক্তিভিত্তিক যন্ত্রপাতির সমন্বয়ে উন্নতমানের অডিও এবং ভিডিও ধারণ-সংবলিত অত্যাধুনিক স্টুডিও, ইএনজি ক্যামেরা, হাই ডেফিনেশন টিভি ক্যামেরা, এস এনজি, ইলেকট্রনিক ফিল্ড প্রোডাকশন ব্যবস্থাসহ সংবাদ ও অনুষ্ঠান সফলভাবে প্রচার করার জন্য প্রায় সব ধরনের উন্নত সাজ-সরঞ্জাম-আমাদের প্রায় প্রতিটি টেলিভিশন চ্যানেলেরই আছে। তারপরও কেন আমরা আন্তর্জাতিক দুনিয়ার বিবিসি, সিএনএন, আল-জাজিরার চেয়ে টিভি সাংবাদিকতায় এখনো অনেক পিছিয়ে আছি তা আমাদেরকে অবশ্যই মূল্যায়ন করতে হবে। এ ক্ষেত্রে কেবল প্রাযুক্তিক ও আর্থিক সীমাবদ্ধতাকে কারণ হিসেবে বিবেচনা করলে তা যথার্থ হবে না। বাংলাদেশের টিভি সাংবাদিকতার প্রবণতাসমূহ গভীরভাব বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, সরকারি নিয়ন্ত্রণ, মালিক পক্ষের অনৈতিক প্রভাব, অধিকতর মুনাফামুখী দৃষ্টিভঙ্গি বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতার চর্চাকে ব্যাহত করছে। এ সব সমস্যা দূরীকরণে দরকার যথাযথ পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন। মনে রাখা দরকার দেশ ও জাতির উন্নয়নে স্বাধীন গণমাধ্যমের ইতিবাচক অগ্রযাত্রা নিশ্চিত করার মাধ্যমেই একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করা সম্ভব।

---

[৬৬] *বাংলাদেশ প্রতিদিন*, ৮ আগস্ট ২০১৪।

পরিশিষ্ট

বাংলাদেশে সম্প্রচারিত টিভি-চ্যানেলসমূহের তালিকা

ক্রমিক নং	টিভি-চ্যানেলসমূহের নাম	সম্প্রচারের তারিখ
০১	বাংলাদেশ টেলিভিশন (বিটিভি)	২৫ ডিসেম্বর ১৯৬৪
০২	এটিএন বাংলা	১৬ জুলাই ১৯৯৭
০৩	চ্যানেল আই	০১ অক্টোবর ১৯৯৭
০৪	একুশে টিভি (ইটিভি)	১৪ এপ্রিল ২০০০
০৫	এনটিভি	০৩ জুলাই ২০০৩
০৬	বিটিভি ওয়ার্ল্ড	১১ এপ্রিল ২০০৪
০৭	বৈশাখী টিভি	২৭ ডিসেম্বর ২০০৪
০৮	আরটিভি	২৬ ডিসেম্বর ২০০৫
০৯	চ্যানেল ওয়ান *	২৪ জানুয়ারি ২০০৬
১০	বাংলাভিশন	৩১ মার্চ ২০০৬
১১	সিএসবি নিউজ*	০৭ এপ্রিল ২০০৭
১২	ইসলামিক টিভি*	২৪ মার্চ ২০০৭
১৩	দিগন্ত টিভি*	২৮ আগস্ট ২০০৮
১৪	দেশ টিভি	২৬ মার্চ ২০০৯
১৫	এটিএন নিউজ	০৭ জুন ২০১০
১৬	ইন্ডিপেনডেন্ট টিভি	৩০ অক্টোবর ২০১০
১৭	মোহনা টিভি	১১ নভেম্বর ২০১০
১৮	মাই টিভি	২০ ডিসেম্বর ২০১০
১৯	সংসদ বাংলাদেশ টিভি	২৫ জানুয়ারি ২০১১
২০	চ্যানেল নাইন	০৮ এপ্রিল ২০১১
২১	সময় টিভি	১৭ এপ্রিল ২০১১
২২	মাছরাঙা টিভি	৩০ জুলাই ২০১১
২৩	বিজয় টিভি	১৬ ডিসেম্বর ২০১১
২৪	চ্যানেল সিক্সটিন	১৬ ডিসেম্বর ২০১১
২৫	চ্যানেল টুয়েন্টিফোর	২৪ মে ২০১২
২৬	গাজী টিভি	১২ জুন ২০১২
২৭	একাত্তর টিভি	২১ জুন ২০১২
২৮	এসএ টিভি	১৯ জানুয়ারি ২০১৩
২৯	এশিয়ান টিভি	২৭ জানুয়ারি ২০১৩
৩০	যমুনা টিভি	০৫ এপ্রিল ২০১৪

*চিহ্নিত টিভি চ্যানেলগুলো বর্তমানে বন্ধ রয়েছে

ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ জার্নাল
সংখ্যা ২৩ (১৪২২ বঙ্গাব্দ)

বাংলাদেশে সংবাদ বিষয়ক আইনের উদ্ভব ও বিকাশ

আব্দুল্লাহ্ আল্ মঞ্জুর হোসেন*

Abstract: Bangladesh adopted the laws previously enacted during British and Pakistan period. Very few laws are enacted after independence of Bangladesh. The laws relating to news media expanded a long way. This paper traces historical and conceptual evolution of laws pertaining to news media and analyzes the impediments placed against the media. Though the constitution of the People's Republic of Bangladesh ensures the freedom of speech and presss in its provision, the freedom also binds the media within some limitations.

ভূমিকা

পেশা হিসেবে সাংবাদিকতা সামাজিক ক্রমবিকাশের ধারায় উদ্ভূত হয়েছে এবং এর ধারাবাহিকতায় সাংবাদিকতা বিষয়ক আইনের উৎপত্তি হয়েছে। ষোড়শ শতকে বিশ্বে সংবাদপত্রের প্রসার শুরু হয় এবং এর জনপ্রিয়তা দ্রুত বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। উনিশ শতকের পূর্ব পর্যন্ত কোথাও পেশাদারি সাংবাদিকতা সৃষ্টি হয়নি।[১] আর এর জনপ্রিয়তা, প্রসারতা এবং গ্রহণযোগ্যতার দিকে খেয়াল রেখে শাসকগোষ্ঠী একে খুব দ্রুত নিয়ন্ত্রণ করার প্রয়োজন বোধ করে। আর এ কারণে সৃষ্টি হয় সংবাদ সংক্রান্ত বিভিন্ন আইন ও বিধিমালার। প্রথম দিকের আইন বা বিধিমালাগুলো ছিল একে দমন ও নিয়ন্ত্রণ করার। কারণ শাসকগোষ্ঠী লক্ষ্য করেন যে, সরকার-বিরোধী কোনো খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হলে তা জনগণের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলে এবং শাসনকার্যে ক্ষতি হয়। আধুনিক সংবাদপত্রের চারটি বৈশিষ্ট্য 'প্রচারণা, প্রাসঙ্গিকতা, সর্বজনীনতা এবং নিয়মিত ব্যবধানে প্রকাশ' এই পেশাদারিত্বমূলক গুণাবলিগুলো অর্জন করতে অনেক সময় পাড়ি দিতে হয়েছে।[২] সংবাদপত্রের গুরুত্ব সবাই বুঝতে সক্ষম হয়। ফলে প্রথমদিকে যেমন সংবাদ মাধ্যমকে দমন, পীড়ন ও নিয়ন্ত্রণ করার জন্য বিভিন্ন আইন বা নীতিমালা পাশ হয় তেমনি সংবাদপত্র, সাংবাদিকতা এবং সংবাদ মাধ্যমের উৎকর্ষ সাধন করার জন্যও বিভিন্ন

---

* সহকারী অধ্যাপক, আইন বিভাগ, বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি, ঢাকা, বাংলাদেশ।

[১] খ. আলী আর রাজী, মঞ্জুরুল ইসলাম, নাঈমুল ইসলাম খান, *সাংবাদিকতা: প্রথম পাঠ* (ঢাকা: বাংলাদেশ সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট, জার্নালিজম অ্যান্ড কমিউনিকেশন, ১৯৯৭), পৃ. ৬১।

[২] Michael Kunezik. *Concepts of Journalism North and South* (Bonn: Friedrich Ebert-Stiftung, 1988), p.15.

নীতিমালা ও আইন প্রণয়ন করা হয়। এসব আইনের নীতিমালা ও এর বিকাশের ধারা নিয়ে এই রচনায় সংক্ষিপ্ত আকারে একটি চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

সংবাদ বিষয়ক আইনের উদ্ভব ও বিকাশ

পৃথিবীব্যাপী যখন প্রেস এবং সাংবাদিকতার প্রসার ঘটা শুরু হয় তখন আইন দ্বারা বা নিষেধাজ্ঞা দ্বারা তা দমন ও নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থাও নেওয়া হয়। ছাপাখানার প্রসারের ফলে বিভিন্ন প্রকাশনা প্রকাশ পাওয়া শুরু করে। এসব প্রকাশনার অনেক বিষয়বস্তু স্পর্শকাতর ও শাসকগোষ্ঠীবিরোধী হওয়ায় একে নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা নেওয়া হয়। আর তা নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রয়োজন হয় আইনের। তাই নিয়ন্ত্রণ করার জন্য ছাপাখানার উপর লাইসেন্স প্রথা চালু করা হয়। সংবাদপত্রে নিষেধাজ্ঞা আরোপের ব্যাপারে আঠারো শতক পর্যন্ত কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করতে দেখা যায়নি। বরং একে ব্যবহার করে রাষ্ট্রক্ষমতায় টিকে থাকার প্রয়াস পেয়ে যায় ক্ষমতাসীনেরা। সেন্সরশিপ ব্যবস্থা চালু হওয়ার ফলে রাজনৈতিক খবর ছাপা বন্ধ হয়ে যায় এবং প্রচার সংখ্যা কমিয়ে দেওয়া হয়। প্রথম ১৪৮২ সালে সেন্সরশিপ অধ্যাদেশ বা ডিক্রি জারি করে ওয়ার্জবার্গ এবং বাসেল শহরের ক্যাথলিক চার্চ। যাজক সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে প্যামফ্লেট বা ছোট পুস্তিকা ছাপানোর কারণে প্রেসের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়।[৩] যাজক সম্প্রদায় বুঝতে পেরেছিলেন, যদি ছাপাখানা ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণহীনভাবে চলতে থাকে তাহলে তাদের অস্তিত্ব হুমকির সম্মুখীন হতে পারে। ১৪৮৭ ও ১৫৫৯ সালে পোপ ডিক্রি জারি করেন যে, পোপের কোর্ট বা তার প্রতিনিধির পূর্বানুমতি ছাড়া কেউ কোনো কিছু প্রকাশ করতে পারবে না। এবং তিনি শুধু লেখা ও ছাপাই নিষিদ্ধ করলেন না, কোনো কোনোটির পাঠও নিষিদ্ধ করলেন। ১৫৩০ সালে জার্মানির আউগসবার্গে রাজকীয় সংসদ কোনা কিছু ছাপা হলে তাতে প্রিন্টারের পরিচয় এবং কোথা থেকে ছাপা হয়েছে এই তথ্যগুলো মুদ্রিত করা বাধ্যতামূলক করে। ১৫৭০ সালে স্পেয়ারের রাজকীয় সংসদ ঘোষণা দেয় যে, শুধুমাত্র রাজকীয় শহরগুলোতে বই ছাপা যাবে। এর উদ্দেশ্য ছিল প্রকাশনাকে দমন করার কাজকে সহজ করা। উদার স্বাধীন সংবাদ মাধ্যমের পক্ষে সর্বপ্রথম সমর্থন আসে ইংরেজ সাহিত্যিক জন মিল্টনের কাছ থেকে। ১৬৪৪ সালে তিনি ইংলিশ পার্লামেন্টে এক মূল্যবান বক্তব্য রাখেন। সে বক্তব্যটি পরবর্তীকালে 'এরিওপেজিটিকা' নামে সমধিক পরিচিত লাভ করে।[৪] এতে তিনি ১৬৪৩ সালের ১৪ই জুন পাশ হওয়া 'লাইসেন্সিং অর্ডারের' তীব্র সমালোচনা করেন। 'ভালো মন্দের বিচারে বিবেকের ভূমিকাই মুখ্য' এই শাশ্বত ধারণার ভিত্তিতে তিনি বিবাচন বা 'সেন্সরশিপের' বিরুদ্ধভাব প্রকাশ করেন। সেন্সরশিপমূলক প্রতিষ্ঠানগুলির বিপক্ষে দাঁড়িয়ে তিনি একথা বলতেও দ্বিধা করেননি যে, কোনো লেখা প্রকাশের অধিকার খর্ব করার সিদ্ধান্ত মূলত একটি অসৎ প্রচেষ্টা।[৫] ১৬৮৮ সালে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রণ করার অধিকার করার লাভ করে। ১৬৯৫ সালে পার্লামেন্ট লাইসেন্সিং আইন নবায়ন না করার কারণে নিয়ন্ত্রণের অধিকার শেষ হয়ে যায়। ১৭১৭ সাল পর্যন্ত ব্রিটেনের পার্লামেন্ট সম্পর্কে কোনো রিপোর্ট করার অধিকার সংবাদপত্রের ছিল না, যদিও অনেক ক্ষেত্রে পার্লামেন্টের অজান্তে পার্লামেন্টের অধিবেশন সংক্রান্ত রিপোর্টিং অনেক সংবাদপত্র করেছে। ১৭৭১ সালে এ ধরনের বিধি নিষেধ একেবারে আনুষ্ঠানিকভাবে তুলে নেওয়া হয়। আমেরিকান এবং ফরাসিরা যথাক্রমে ১৭৭৬ এবং ১৭৮৯-এ তাদের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে সংবাদপত্রের স্বাধীনতার বিষয়টি সরাসরি উল্লেখ করে। ১৭৯১ সালে আমেরিকা তাদের সংবিধানের প্রথম সংশোধনীতে সংবাদপত্রের

---

[৩] খ. আলী আর রাজী, মঞ্জুরুল ইসলাম, নাঈমুল ইসলাম খান, *সাংবাদিকতা: প্রথম পাঠ*, পৃ. ৬২।

[৪] David Wainwright, *Journalism Made Simple* (London: W. H. Allen & Co. Ltd., 1972), p. 27.

[৫] R. Lorimer and M. Gasher, *Mass Communication in Canada* (Ontario: Oxford University Press, 2001), p. 56.

স্বাধীনতার বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করে।[৬] ফরাসি সংবিধানের "মানুষ ও নাগরিকের অধিকারসমূহ" শীর্ষক ১১তম অনুচ্ছেদে স্বাধীনভাবে প্রত্যেক ব্যক্তি বা নাগরিককে মতপ্রকাশ করার, চিন্তা করার, লেখার এবং মুদ্রণ করার ব্যাপারে নিশ্চিয়তা প্রদান করা হয়।[৭] ১৯১৯ সালে জার্মানিতে মতামত প্রকাশের স্বাধীনতাকে মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয় এবং ১৯৩৩ সালে স্থগিত করা হয়। শেষ পর্যন্ত ১৯৪৯ সালে মতামত প্রকাশের স্বাধীনতাকে সাংবিধানিকভাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। ধীরে ধীরে কালক্রমে সারাবিশ্বে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সাংবিধানিকভাবে স্বীকৃতি পাওয়া শুরু করে।

এরই ধারাবাহিকতায় ভারতবর্ষ তথা বাংলাদেশের সংবাদ, সাংবাদিকতা ও সংবাদপত্র বিষয়ক আইনের প্রচলন শুরু হয় মূলত ইংরেজ শাসনামলে। ভারতবর্ষে ইংরেজ বেসামরিক সুশীল সমাজের লোকেরা সংবাদপত্র প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করে। ১৭৬৮ সালে উইলিয়াম বোল্টস প্রথম সংবাদপত্র প্রকাশ করতে চাইলে কোম্পনি তাকে অনুমতি না দিয়ে নানা অজুহাত দেখিয়ে দ্রুত কলকাতা থেকে তাড়িয়ে দেয়।[৮] পরবর্তীতে ১৭৮০ সালের ২৯শে জানুয়ারি ভারতবর্ষের প্রথম ছাপানো সংবাদপত্র 'বেঙ্গল গেজেট' প্রকাশিত হয়, যার প্রকাশক ছিলেন জেমস অগাস্টাস হিকি। এর ছয় মাসের মধ্যে 'ইন্ডিয়া গেজেট' নামে আরেকটি পত্রিকা প্রকাশিত হয় যার পৃষ্ঠপোষকতায় ছিলেন ওয়ারেন হেস্টিংস ও ব্রিটিশ সরকার। ১৭৮০ সালে 'বেঙ্গল গেজেট' পত্রিকার ডাক ব্যবস্থার মাধ্যমে বিলি করা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়।[৯] ১৭৮১ সালের জুন মাসে ওয়ারেন হেস্টিংস ও রেভারেন্ড জে. কিরেন্ডার সুপ্রিম কোর্টে হিকির বিরুদ্ধে মামলা করেন। মামলার টাকা ও জরিমানার টাকা পরিশোধে ব্যর্থ হলে ১৭৮২ সালে তার ছাপাখানাটি আটক করা হয়। এভাবে ভারতের প্রথম সংবাদপত্রের ইতি ঘটে। ১৭৮৫ সালে কলকাতা হতে প্রকাশিত ইউরোপীয়দের স্বার্থ-বিরোধী ইউরোপীয় মালিকানায় প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলোর উপর বিধি নিষেধ জারি করা হয়। এই আদেশটির নাম ছিল "জেনারেল অর্ডারস"। এই আইনের মূল বিষয় ছিল গভর্নর জেনারেল পরিষদের কোনো সিদ্ধান্ত বা আদেশ প্রকাশ করা যাবে না। ১৭৯৫ সালে মাদ্রাজ ও বোম্বাইতে সেন্সরশিপ পদ্ধতি চালু হয়। এ ব্যবস্থায় সরকারি কোনো সংবাদ ছাপতে চাইলে আগে সমর সচিবের কাছ থেকে অনুমোদন করিয়ে নিতে বলা হয়। কিন্তু কলকাতায় এই পদ্ধতি তৎক্ষণিকভাবে চালু করা সম্ভব হয়নি এবং যেসব সাংবাদিক ও প্রকাশক কোম্পানির কথা শুনতো না তাদের ইউরোপে ফেরত পাঠানো হতো। বেঙ্গল জার্নালের উইলিয়াম ডুনো

---

[৬] 1st Amendment of the Constitution of the United States of America, 1776 provides, "Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances" (United States Information Agency), p. 28.

[৭] Article 11 of the Declaration of the Rights of Man and of the Citizen of 1789 provides, "The free communication of ideas and opinions is one of the most precious of the rights of man. Every citizen may, accordingly, speak write and print with freedom, but shall be responsible for such abuses of this freedom as shall be defined by law." (New World Enclyopedia, /entry/Declaration_of_the_Rights_of_Man_ and_of_the_Citizen)

[৮] এমরান জাহান, "ঔপনিবেশিক আমলে সংবাদপত্র দমন আইন ও বাংলা সংবাদপত্র ১৭৮০-১৯০০", *ইতিহাস*, ৪৪ বর্ষ ১ম সংখ্যা, (ডিসেম্বর ২০১০), পৃ. ৪৪।

[৯] *Hicky's Bengal Gegette,* November 11, 1780; C.E. Buckland, *Dictionary of Indian Biography* (London: 1906), p. 200.

এবং ক্যালকাটা জার্নালের জেমস বাকিংহামকে সরকার জোর করে ইউরোপে ফেরত পাঠায়।[১০] সে সময় পর্যন্ত যারা সংবাদপত্রের মালিক বা প্রকাশক ছিলেন তারা সবাই ইংরেজ, কোনো ভারতীয় ছিলেন না। ১৭৯৯ সালের মে মাসে ভারতের গভর্নর জেনারেল মারকুইস অব ওয়েলেসলি পাঁচ দফা রেগুলেশন জারি করে যা প্রেস অর্ডিন্যান্স নামে পরিচিত। এই অর্ডিন্যান্সের মাধ্যমে তিনি পুরো ভারতবর্ষের সংবাদপত্রকে সেন্সর ব্যবস্থার মধ্যে আনেন। এই আইনে সংবাদপত্র ছাপার সময়ে কাগজে সম্পাদক ও মুদ্রাকরের নাম ছাপতে হবে এবং কাগজ প্রকাশ করতে গেলে সরকারের কাছ থেকে ঘোষণাপত্র নিতে হবে। সপ্তাহের রবিবার কোন পত্রিকা প্রকাশিত করা যাবে না। এই আইন অমান্য করলে সম্পাদক ও প্রকাশককে ইউরোপে পাঠিয়ে দেওয়া হবে।[১১] ১৮১৮ সালের ২রা অক্টোবর জেমস সিল্ক বাকিংহামের সম্পাদনায় দ্বিসাপ্তাহিক "ক্যালকাটা জার্নাল" বা "ক্যালকাটা ক্রনিকল অব পলিটিক্যাল কর্মাশিয়াল এন্ড লিটিরারি গেজেট" প্রকাশিত হয়। এই কাগজটি ১৮১৯ সালের ১লা মে হতে ভারতবর্ষের প্রথম দৈনিক পত্রিকার মর্যাদা পায়।

১৮২৩ সালের নভেম্বর মাসের দশ তারিখের মধ্যে ক্যালকাটা জার্নাল প্রকাশ বন্ধ করে দেওয়া হয়। সরকারের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের সমালোচনা করায় এবং তা অব্যাহত রাখায় ১৮২৩ সালের এপ্রিল মাসের মধ্যে সম্পাদককে ভারত ছেড়ে চলে যাওয়ার আদেশ দেওয়া হয়। যাওয়ার সময় তিনি অর্নটকে পত্রিকার দায়িত্ব দিয়ে যান এবং ঐ বছর সেপ্টেম্বর মাসে অর্নটকেও ভারত ছাড়তে বাধ্য করা হয়। ১৮২৩ সালের ৪ঠা এপ্রিল জারি করা হয় "অ্যাডাম রেগুলেশনস"। সংবাদপত্রের স্বাধীনতাকে খর্ব করার আইন হিসেবে আইনটিকে গণ্য করা যায়। এই আইনটি 'অ্যাডাম গ্যাগ' নামে পরিচিতি পায়। এই আইনটির মূল বিষয় ছিল, কোনো কিছু মুদ্রণ করতে এবং ছাপাতে গেলে ছাপানোর আগে অবশ্যই গভর্নর জেনারেল পরিষদের অনুমতি নিতে হবে। লাইসেন্সবিহীন সংবাদপত্র প্রকাশ করলে চারশত রুপি জরিমানা এবং সর্ব্বোচ চারমাসের কারাদণ্ডের বিধান রাখা হয়।[১২] ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে হলফ করার বিধান রাখা হয়। গভর্নর জেনারেল যে কোনো সময় লাইসেন্স বাতিল করতে পারবেন এবং বিনা লাইসেন্সে কিছু প্রকাশ করলে জরিমানা ও কারাদণ্ড উভয় শাস্তির বিধান রাখা হয়।[১৩] ১৮২৫ সালের ৩০শে ডিসেম্বর ভারতের সংবাদপত্রের উপর আবার নিষেধাজ্ঞা বা বিধি নিষেধ জারি করে কোর্ট অব ডাইরেক্টরস। এই নিষেধাজ্ঞায় বলা হয়, কোম্পানির কোনো কর্মচারী কোনোভাবে কোনো সংবাদপত্রের সাথে যুক্ত হতে পারবে না এবং সংবাদপত্রের সাথে কোনো প্রকার সম্পর্ক রাখতে পারবে না। কেবল নির্ভেজাল সাহিত্য ও বিজ্ঞান বিষয়ক পত্রিকার বেলায় এর ব্যতিক্রম ঘটবে। যদিও এই বিধি নিষেধের ফলাফল সরকারের জন্য সুখকর হয়নি। কারণ এর ফলে সংবাদপত্রগুলো আগের চেয়ে বেশি সরকারবিরোধী অবস্থানে চলে যায়। ১৮২৮ সালে লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক ভারতের গভর্নর জেনারেল নিযুক্ত হওয়ার পর ভারতবর্ষে প্রচুর সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। তিনি একটি কমিটি গঠন করে দেন এবং কমিটি ১৮২৮ সালে ভারতের সংবাদপত্রের সংখ্যা কত ছিল তার প্রতিবেদন দেয়। ১৮২৮ থেকে ১৮৩৫ সাল পর্যন্ত সময়কে ভারতীয় সংবাদপত্রের স্বর্ণযুগ বলে ধরা হয়।[১৪] লর্ড বেন্টিঙ্ক চলে গেলে ১৮৩৫ সালে লর্ড মেটকাফ অস্থায়ী গভর্নর জেনারেল হিসেবে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। তিনি নতুন আইন প্রণয়ন করেন, লাইসেন্স ছাড়াই শুধুমাত্র রেজিস্ট্রেশন করেই সংবাদপত্র প্রকাশ করা যাবে। কিন্তু আইন-

---

[১০] *Calcutta Gegette,* September 6, 1792; Natarajan, *A History of the Press in India* (India: Bombay, 1962), p. 203.

[১১] *Beyelys Minute*, 17th Oct. 1822, Home Public No. 8, *Report of the Select Committee on the Supperession of the Calcutta Journal,* Appendix, pp. 77-88.

[১২] ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, *বাংলা সাময়িক পত্র, ১ম খণ্ড* (কলকাতা, ১৯৩২), পৃ. ৩৯।

[১৩] তারাপদ পাল, *ভারতের সংবাদপত্র: ১৭৮০-১৯৪৭* (কলকাতা: সাহিত্য সদন, ১৯৭২), পৃ. ৫৮।

[১৪] গাজী শামসুর রহমান, *সংবাদ বিষয়ক আইন* (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৮৪), পৃ. ৬৪-৬৫।

শৃঙ্খলা ও সরকারি নীতির বিপক্ষে ক্ষতিকারক কিছু প্রকাশ করলে তার দায়িত্ব সম্পাদককে নিতে হবে এবং প্রয়োজনবোধে তাকে শাস্তি দেওয়া যাবে। মেটকাফের সময় ইউরোপীয় এবং ভারতীয়দের জন্য একই আইন প্রণয়ন করা হয়। নতুন এ সিদ্ধান্তের ফলে আগের ১৮২৩ সালের অ্যাডাম রেগুলেশনস, ১৮২৫ ও ১৮২৭ সালের বোম্বাই রেগুলেশনস এবং মাদ্রাজের সেন্সরশিপ ব্যবস্থা বাতিল হয়ে যায়।[১৫] নতুন এ আইনে লাইসেন্স কিংবা প্রি-সেন্সরশিপের বিধান বিলুপ্ত করা হয়। ১৮৫৬ সাল পর্যন্ত এ আইনটি কার্যকর ছিল। আর এ সময়ের মধ্যেই বাংলাদেশে সংবাদপত্রের বিস্তৃতি ঘটে এবং বাংলাদেশে প্রথম সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়।

১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহ সংঘটিত হয় যা আসলে স্বাধীনতার সংগ্রাম হিসেবে বিবেচনা করা যায়। ধারণা করা হয়, সংবাদপত্রের অবাধ স্বাধীনতার কারণেই এ বিদ্রোহ বা সংগ্রামের ভয়াবহতা বৃদ্ধি পেয়েছিল। ১৮৫৭ সালের সংগ্রামের সময় দেশীয় সংবাদপত্রগুলি জনমত সৃষ্টিতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। ১৮৫৭ সালে লাইসেন্স প্রথা পুনরায় প্রবর্তন করা হয়। আইনে সকল প্রকার মুদ্রিত বস্তুকে লাইসেন্স নিতে বাধ্য করা হয়।[১৬] এ প্রসঙ্গে বলা হয়, সরকার যদি ১৮৫৮ সালের প্রাক্কালে দেশীয় সংবাদপত্রে প্রকাশিত জনমতের গুরুত্ব দিতো তাহলে ১৮৫৭-৫৮ সালের বিপ্লবের ভয়াবহতা পূর্বেই নির্ধারণ করতে পারতো।[১৭] এর প্রেক্ষিতে গভর্নর জেনারেল লর্ড ক্যানিং ১৮৫৭ সালের ১৩ই জুন প্রেস অ্যাক্ট জারি করেন।[১৮] সেই ঘোষণায় বলা হয়েছিলো, "রাজানুমতি বিরহে কোনো মুদ্রণযন্ত্র সংস্থাপন করিলে অথবা রাজাভিমত বিরুদ্ধ সংবাদপত্রের বা পুস্তক বিশেষ অভিপ্রায় বিকাশ করিলে ৫ হাজার টাকা দণ্ড, দুই বৎসরের অনধিক কারাবাস করিতে হইবে।"[১৯] ক্যানিং ঘোষিত এই আইন "১৮৫৭ সালের পনের আইন" নামে পরিচিত। এ আইনের আরেকটি বিশেষত্ব হলো আইনটি ভারতীয় ও ইউরোপীয় ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্র উভয়ের ক্ষেত্রেই সমভাবে প্রযোজ্য ছিল। আইনটিতে ১৮২৩ সালের অ্যাডাম রেগুলেশনসের মূল নিবর্তনমূলক বিধানগুলো হলো, ভারত কিংবা ইংল্যান্ড সরকারের বিরুদ্ধে সমালোচনামূলক বিবৃতি, মন্তব্য কাগজে ছাপা যাবে না। আইনটি মূলত বাংলা ভাষায় প্রকাশিত পত্র পত্রিকার উপর আঘাত হানে। ফলে 'রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ' সহ প্রায় ১২/১৩টি বাংলা পত্রিকার প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়। আইনটি বেশিদিন স্থায়িত্ব লাভ করেনি, মাত্র এক বছর বহাল থাকার পর ১৮৫৮ সালে বাতিল হয়ে যায়। ১৮৬০ সালে 'পিনাল কোড' বা দণ্ডবিধি প্রণয়ন করা হয়। এই আইনে সংবাদপত্র সম্পর্কে বিভিন্ন বিধান রাখা হয়। মানহানি ও অশ্লীলতার শাস্তির বিষয়ে এই আইনে বিধান রাখা হয়।[২০] ১৮৬৭ সালে প্রেস অ্যান্ড রেজিস্ট্রেশন অব বুক্স অ্যাক্ট পাশ করা হয়। এতে সকল সংবাদপত্র এবং পুস্তকের কপি নিবন্ধন এবং সংরক্ষণের বিধান রাখা হয়। ১৮৭০ সালে পিনাল কোডে রাজদ্রোহ বা রাষ্ট্রদ্রোহ নিয়ন্ত্রণ ধারা যুক্ত করা হয়। এই বিধানকে সংবাদপত্রের উপর নতুন হুমকি হিসেবে গণ্য করা হয়, কারণ এতে বলা হয়েছিল, "যে সরকারের প্রতি অপ্রিয় মনোভাব সৃষ্টি করবে বা দেশবাসীকে সরকারের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করবে তাকেই শাস্তি দেওয়া হবে। সেই শাস্তি জরিমানা, জেল এবং

---

[১৫] Copy of the Minutes in Connection with the Act XI of 1835, Parlimentary Papers, East India Native Press, p.6.

[১৬] গাজী শামসুর রহমান, *সংবাদ বিষয়ক আইন*, পৃ. ২৪২।

[১৭] এমরান জাহান, "ঔপনিবেশিক আমলে সংবাদপত্র দমন আইন ও বাংলা সংবাদপত্র ১৭৮০-১৯০০", পৃ. ৪৮।

[১৮] Act XV of 1857, *Calcutta Gegette Extraordinary*, June 13, 1857 Home Department; Mirnal Kanti Chanda, *History of the English Press in Bengal 1780-1857* (Calcutta: K.P. Baghchi, 1987), p. 446.

[১৯] তারাপদ পাল, *ভারতের সংবাদপত্র: ১৭৮০-১৯৪৭*, পৃ. ৬৪-৯৩-৯৪।

[২০] ধারা ৫০০, ২৯২ এবং ২৯৩, দণ্ডবিধি, ১৮৬০।

যাবজ্জীবন কারাদণ্ড পর্যন্ত হতে পারে।"[২১] পরবর্তীতে সময়ে এই আইনের প্রয়োগ দেখা গিয়েছিল ১৮৯১ এবং ১৮৯৭ সালে। সিডিশান অ্যাক্ট অনুসারে মামলা দায়ের করা হয়েছিলো 'বঙ্গবাসী' ও 'কেশরী' নামের দুটি পত্রিকার বিরুদ্ধে। সংবাদপত্রগুলো তৎকালীন সরকারের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের সমালোচনা করতে থাকলে সরকার সংবাদপত্রগুলোকে নিজের পক্ষে কাজ করানোর জন্য সরকারের জনসংযোগ কর্মকাণ্ডে তাদের সংযুক্ত করে এবং সরকারের উপর যেন নির্ভরশীলতা বাড়ে সে উদ্দেশ্যে সরকারি বিজ্ঞাপন দেওয়া শুরু করে। ১৮৭৭ সালে প্রেস কমিশন গঠন করা হয় এবং ১৮৭৮ সালে দেশি ভাষায় প্রকাশিত পত্রিকাগুলোর জন্য "ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট" প্রণয়ন করা হয় যা Irish Coercion Act-এর অনুকরণে প্রণয়ন করা হয়। এই আইনের বিশেষ দিক ছিল উপমহাদেশীয় ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলোকে নিয়ন্ত্রণে আনা এবং সরকারবিরোধী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে প্রচলিত আইনকে আরও কার্যকরভাবে প্রয়োগ করা।[২২] এছাড়াও ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত পত্রিকার মুদ্রাকর ও প্রকাশকের এ মর্মে স্বীকারোক্তি দিতে হতো যে, কোনো পত্রিকা এমন কোনো বিষয় প্রকাশ করতে পারবে না, যা সরকারের বিরুদ্ধে বিরূপ মনোভাব সৃষ্টি করতে পারে। আদালতের ওয়ারেন্ট ছাড়া ছাপাখানায় প্রবেশের অধিকারও এই আইনে দেওয়া হয়। রাষ্ট্রদ্রোহিতামূলক সকল লেখার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষমতা দেওয়া হয়।[২৩] পরে ১৮৮১ সালে প্রচণ্ড বিরোধিতা ও সমালোচনার মুখে আইনটি রদ করা হয়। ১৮৮৫ সালে টেলিগ্রাফ আইন চালু করা হয়। আইনে টেলিগ্রামের মাধ্যমে সংবাদপত্রের জন্য পাঠানো সংবাদ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করা হয়। সংবাদপত্রের জন্য পাঠানো টেলিগ্রাম-সংবাদ নিয়ন্ত্রণের পুরো অধিকার যেন সরকারের হাতে কুক্ষিগত অবস্থায় থাকে তার ব্যবস্থা করা হয়। ১৮৯১ সালের ২৫শে জুন ভারতীয় সংবাদপত্রের উপর নতুন নিবর্তনমূলক আইন প্রবর্তন করা হয়। এ আইনে সংবাদপত্র ব্যবস্থাপনাকে সর্বভারতীয় পরিবর্তে রাজ্য ও অঞ্চলভিত্তিতে বিকেন্দ্রিত করা হয়। এই আইনের মূল বিষয় ছিল, সংবাদপত্রের অধিকার ও স্বাধীনতা রাজ্য ও অঞ্চল সমূহের প্রশাসন দ্বারা নির্ধারিত হবে।[২৪] প্রতি প্রদেশে রাজনৈতিক প্রতিনিধি নিযুক্ত থাকবে এবং তার অনুমতি ব্যতীত সংবাদপত্র প্রকাশনা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। আইন অমান্য করলে রাজনৈতিক প্রতিনিধি লিখিত নির্দেশের মাধ্যমে সাতদিনের মধ্যে স্থানীয় এলাকা পরিত্যাগ করতে বাধ্য করতে পারতো। এলাকায় ফেরত আসার জন্যও তার অনুমতির দরকার পড়তো। এ আদেশ অমান্য করার দণ্ড ছিল বলপূর্বক বহিষ্কার। ১৮৯৮ সালে গোপন প্রেস কমিটি গঠন করা হয়।[২৫] ১৮৯৮ সালে ফৌজদারি কার্যবিধি জারি করা হয়, যার কতিপয় ধারা সংবাদক্ষেত্রকে স্পর্শ করে।[২৬] ফৌজদারি কার্যবিধি আইনের কতিপয় বিধান যা বিদ্রোহাত্মক বা রাজদ্রোহ সংক্রান্ত কোন বিষয় প্রকাশ করাকে এবং ধারা ১৫৩(ক) তে উল্লেখিত বিষয় যার প্রকাশ করাকে দণ্ডনীয় অপরাধ হিসেবে গণ্য করে।[২৭] ১৮৯৮ সালে দণ্ডবিধিতে শ্রেণীশত্রুতা সৃষ্টির অপরাধের বিষয়টি যোগ করা হয়।[২৮] ১৮৯৮ সালের ডাকঘর আইনে বলা হয়, যদি সন্দেহ হয় তাহলে কর্তৃপক্ষ ইচ্ছা করলে যে কোনো চিঠি খুলে পড়তে ও আটক করতে পারবে।[২৯]

---

[২১] ধারা ১২৪ (ক), দণ্ডবিধি, ১৮৬০।
[২২] গাজী শামসুর রহমান, *সংবাদ বিষয়ক আইন*, পৃ. ২৩৫।
[২৩] *তদেব*, পৃ. ২৩৬-২৩৭।
[২২] *তদেব*, পৃ. ২৩৬।
[২৫] *তদেব*।
[২৬] তদেব, পৃ. ২৪২।
[২৭] ধারা ১০৮ এবং ১৪৪, ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮।
[২৮] ধারা ১৪১-১৬০ এবং ধারা ৫০৫।
[২৯] ধারা ২৭ (খ), ডাকঘর আইন, ১৮৯৮।

১৯০৮ সালে নিউজপেপার (ইনসাইটমেন্ট টু ওফেন্স) অ্যাক্ট পাশ করা হয়। এটা সংবাদপত্র সম্পর্কিত অত্যন্ত কঠোর একটি আইন। আইনটি ম্যাজিস্ট্রেটকে এমন ক্ষমতা প্রদান করে যে, যদি কোনো সংবাদপত্র হিংসাকে প্রশ্রয়সূচক কিছু প্রকাশ করে তাহলে সরকার সেই কাগজ 'সিজ' করতে পারবে।[৩০] সংবাদপত্রগুলোর তীব্র প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করে ১৯১০ সালে ঐ আইনের পাশাপাশি নতুন আইন প্রেস অ্যাক্ট পাশ করা হয়। ফলে কঠোর বিধি নিষেধ দূর হওয়ার আশা একেবারে ক্ষীণ হয়ে যায়। ১৯১০ সালের আইনের মূল বক্তব্য হচ্ছে, রাষ্ট্রদ্রোহ, হত্যা ইত্যাদি অপরাধে উদ্দীপনা সৃষ্টিকারী কোনো লেখা প্রকাশিত হলে সংশ্লিষ্ট ছাপাখানাকে জামানত 'ডিপোজিট' করার আদেশ দেওয়ার অধিকার সরকারকে দেওয়া হয়। ১৯১৩ সালে Criminal Law Amendment Act, 1913 এবং Defence of India Regulations ১৯১৪ সালে জারি করা হয়, যার উদ্দেশ্য ছিল সমালোচনা দমন করা এবং আন্দোলনকে স্তব্ধ করে দেওয়া। একের পর এক বিভিন্ন নীতিমালা যা সংবাদক্ষেত্রকে ক্ষতিগ্রস্ত করে চলেছিল। সরকারি আদেশের মাধ্যমে সংবাদপত্র ও মুদ্রণালয় বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। ১৯২১ সালে স্যার তেজ বাহাদুর সাপ্রুর সভাপতিত্বে প্রেস ল' কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটি সাংবাদিকদের সাক্ষ্য গ্রহণ করে এবং সুপারিশ করে যে, ১৯০৮ ও ১৯১০ সালের আইন দুটি যেন বাতিল করা হয় এবং 'প্রেস এ্যান্ড বুকস্ অ্যাক্ট', 'দি কাস্টমস অ্যাক্ট' এবং 'পোস্ট অফিস অ্যাক্ট' সংশোধন করা হয়।[৩১] এর প্রেক্ষিতে ১৯২২ সালে ১৯০৮ ও ১৯১০ সালের আইন দুটি বাতিল করা হয় এবং 'প্রেস অ্যান্ড রেজিস্ট্রেশন অব বুক্স অ্যাক্ট' সংশোধন করা হয়। ১৯২৩ সালে 'অফিসিয়াল সিক্রেটস অ্যাক্ট' পাশ করা হয়। গোপনীয় সংবাদ যাতে প্রকাশ না পায় তার বিধান এই আইনে রাখা হয়। ১৯২৬ সালে 'কনন্টেম্পট অব কোর্ট অ্যাক্ট' পাশ করা হয় যাতে আদালতের মর্যাদা, সম্মান ও কর্তৃত্ব এবং ভাবমূর্তি যেন কোনোভাবেই নষ্ট না হয়। বিচারকগণ অথবা আদালতসমূহ অবমাননার স্বীকার হয় এমন কোনো খবর প্রকাশ বা উপস্থাপন করা যাবে না, বা এমন কিছু প্রকাশ করা যাবে না যাতে আদালতের প্রতি জনগণের আস্থা কমে যায় বা প্রশ্নবিদ্ধ হয় এমন বিধান করাই ছিল এ আইন প্রণয়নের মূল উদ্দেশ্য। ১৮৬০ সালে প্রণীত পিনাল কোডের সংশোধনী আনা হয় ১৯২৭ সালে। এতে ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাতের বিষয়টি সন্নিবেশিত করা হয়।[৩২] ১৯৩০ সালে 'বেঙ্গল অর্ডিন্যান্স' জারি করা হয়। আইনে সন্ত্রাসবাদীদের জন্য সংক্ষিপ্ত বিচারালয় প্রতিষ্ঠার বিধান রাখা হয়। ১৯৩১ সালে 'প্রেস (ইমারজেন্সি পাওয়ারস) অ্যাক্ট' জারি করা হয়। সরকারি ঘোষণা অনুযায়ী এই আইনের উদ্দেশ্য ছিল "to provide for the better control of the press"।[৩৩] এই আইন হত্যার উস্কানি বা বলপ্রয়োগে উৎসাহ যোগাতে পারে এমন প্রকাশনার বিরুদ্ধে জারি করা হয়। আইনে এমন কোনো সংবাদ প্রকাশ যা হত্যার বা অপরাধ সংঘটনে উৎসাহ জোগাচ্ছে বা জোগায়, এমন কোনো খবর নির্দিষ্ট বা অনির্দিষ্টভাবে কোনো ব্যক্তির কাজকে সমর্থন বা প্রশংসা করে অথবা বাস্তব বা অতিরঞ্জিত খবর প্রকাশ বা ছাপানোর মাধ্যমে তা অপরাধ সংঘটনকে সাহায্য করছে এমন সন্দেহ হলে বা প্রতীয়মান হলে সরকার মুদ্রাণালয়ের জামানত বাজেয়াপ্ত বা মুদ্রাণালয় বাজেয়াপ্ত করতে পারে। ডাক ও শুল্ক বিভাগকে মুদ্রাণালয়ের কাগজপত্র আটক করার ক্ষমতা দেয়া হয়।[৩৪]

---

[৩০] *তদেব*, পৃ. ২৪৩।

[৩১] *তদেব*, পৃ. ২৪০।

[৩২] ধারা ২৯৫ (ক), দণ্ডবিধি, ১৮৬০।

[৩৩] রেজোয়ান সিদ্দিকী, *বাংলাদেশের সংবাদপত্রের ইতিহাস, ১৭৮০-১৯৪৭* (ঢাকা: বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট, ২০০৩), পৃ. ৬৮।

[৩৪] তদেব, পৃ ২৪১।

১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ (ভারত-পাকিস্তান) ভাগের পর ব্রিটিশ সরকারের প্রণীত প্রায় সকল আইনই পাকিস্তান সরকার আত্তীকরণ করে নেয় এবং সংবাদক্ষেত্রের উন্নয়নকে দুটি পর্যায়ে ভাগ করে। প্রথম অধ্যায়ে ভারত বিভাগের পর প্রথম দশকে অপেক্ষাকৃত ভালো উৎপাদন সুবিধা এবং বিজ্ঞাপন আয়ের ফলে সার্কুলেশনের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় সংবাদপত্র শিল্প বাংলাদেশে মোটামুটি সুষ্ঠু ও শক্ত ভিত্তিতে এগুতে থাকে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে ১৯৫৮ থেকে ১৯৭১ সালকে বিবেচনা করা যায়। সংবাদপত্র শিল্প এ সময়ে পেশাগত ও গুণগত উৎকর্ষ সাধন করে। পাকিস্তান সরকার তিনটি পাঁচসালা পরিকল্পনা গ্রহণ করে। এসব পরিকল্পনা মুদ্রণ মাধ্যম ও শিল্পের প্রসারে সাহায্য করে। দেশ ভাগের ফলে সংবাদপত্রে যে সমস্যা ও অস্থিতিশীলতার সৃষ্টি হয়েছিল তা ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত সময়ে যথেষ্ট উন্নতি লাভ করে এবং ধীরে ধীরে নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে। ১৯৫০ সালে পাকিস্তান সরকার পিনাল কোডের সংশোধনী আনে, এতে দেশের উদ্ভবের ব্যাপারে বিরূপ মন্তব্যের বিষয় সম্পর্কে শাস্তিযোগ্য ধারা যুক্ত করা হয়।[৩৫] ১৯৬২ সালে এই আইনের আরেকটি সংশোধনী আনা হয়, যা ছাত্রদের রাজনীতিতে প্রবেশের জন্য প্রভাব বিস্তার সম্পর্কিত। ১৯৬৩ সালে চলচ্চিত্র বিবাচন আইন জারি করা হয়। এর উদ্দেশ্য ছিল স্থানীয় চলচ্চিত্র শিল্পের সংরক্ষণ এবং চলচ্চিত্র বিবাচন বোর্ডের কাছে সরকার বিরোধী প্রতীয়মান হবে অথবা অন্য কোনো কারণে কর্তৃপক্ষ পছন্দ করবে না এমন সব চলচ্চিত্র প্রদর্শন বন্ধ করা। এতে আরো বিধান ছিল, কোনো ছাড়পত্র দেওয়া চলচ্চিত্র স্থানীয় এলাকার মধ্যে প্রদর্শিত হওয়া উচিত না বলে মনে করলে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ইচ্ছা করলে তার প্রদর্শন বন্ধ করে দিতে পারে। ১৯৬৩ সালে আরও একটি আইন বলবৎ হয় যা অশ্লীল বিজ্ঞাপন প্রদর্শন নিষিদ্ধ করে। অশ্লীল ও অনৈতিক বিষয়ের প্রচারণার প্রভাব থেকে সমাজকে বাঁচানোর জন্য এই আইন প্রণীত হয়।[৩৬] ১৯৬৩ সালে গ্রন্থস্বত্ব অধ্যাদেশ প্রণীত হয় যা কোনো গ্রন্থস্বত্বে হস্তক্ষেপকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ নির্দেশ করে। বিভিন্ন সময়ে এই অধ্যাদেশের বিভিন্ন সংশোধনী আনা হয়। ১৯৬৫ সালে শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) জারি করা হয়। এই আইন মূলত দোকান এবং বাণিজ্যিক ও শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে চাকরির শর্তাবলি এবং নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রণীত হয়। আইনে উল্লেখ করা হয় কোনো সংবাদপত্রে ২০ বা তারচেয়ে বেশি সংখ্যক সংবাদপত্র কর্মচারী নিযুক্ত থাকলে বা পূর্ববর্তী ১২ মাসে কোনো একটি দিনে উক্ত সংখ্যক সংবাদপত্র কর্মচারী নিযুক্ত থাকলে আইনের আওতায় আসবে এবং আইনের ধারাসমূহ উক্ত সংবাদপত্রের প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। ১৯৬৫ সালে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ হয়। এর প্রেক্ষিতে পাকিস্তানের তৎকালীন সামরিক সরকার পাকিস্তান প্রতিরক্ষা অধ্যাদেশ ও পাকিস্তান প্রতিরক্ষা বিধি জারি করে যা মূলত সংবাদপত্রগুলোকে দমন করার জন্য প্রণীত হয়েছিল। পাকিস্তান প্রতিরক্ষা আইন দৈনিক ইত্তেফাক প্রকাশনা বন্ধ করে দেয় এবং নিউ নেশন পত্রিকার মুদ্রণালয় সরকার বাজেয়াপ্ত করে।[৩৭] ১৯৬৯ সালে শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশ জারি করা হয়। ট্রেড ইউনিয়ন গঠন, মালিক ও শ্রমিকের মধ্যকার সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ এবং উভয় পক্ষের মধ্যেকার মতানৈক্য অথবা বিরোধের উৎপত্তি নিবারণ ও নিষ্পত্তিকরণ সংক্রান্ত আইনের সংশোধন ও সমন্বয় সাধন এই আইনের উদ্দেশ্য এবং উক্ত বিধানগুলো সংবাদপত্র কর্মচারীদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে বলে বিধানে রাখা হয়।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতার সংগ্রাম শুরু হয়। ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সন্ত্রাস ও অরাজকতা থেকে সংবাদক্ষেত্রও রেহাই পায়নি। সংবাদপত্র অফিসগুলোকেও ঐ রাতে তারা হামলার লক্ষ্যবস্তু হিসেবে ঠিক করে। "দি পিপল", "ইত্তেফাক", "সংবাদ" অফিসসহ

---

[৩৫] ধারা ১২৩ (ক), দণ্ডবিধি, ১৮৬০।

[৩৬] আবু নছর মো: গাজীউল হক, *বাংলাদেশের গণমাধ্যম আইন ও বিধিমালা* (ঢাকা: ইউপিএল ও অ্যামিক, ১৯৯৬), পৃ. ৩০।

[৩৭] *তদেব*, পৃ. ২২।

আরও সংবাদপত্র অফিসে হামলা, ভাংচুর ও অগ্নি-সংযোগের ঘটনা ঘটে। এতে বেশ কয়েকজন সাংবাদিক নিহত হয়েছে বলে জানা যায়।[৩৮] ২৬শে মার্চ সেন্সরশিপ জারি করা হয়। এর দুদিন পর থেকে সংবাদপত্র ছাপার অনুমতি পাওয়া যায়। স্বাধীনতা যুদ্ধের পুরো সময়টাই দেশের সংবাদপত্র মাধ্যম পাকিস্তান সরকারের নিয়ন্ত্রণে ছিল। ১৯৭১ সালে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর বাংলাদেশে প্রথম সংবাদপত্র বিষয়ক আইন পাশ করা হয় ১৯৭৩ সালে। যদিও তার আগেই ১৯৭২ সালে বাংলাদেশের সংবিধানে সংবাদপত্রের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দেয়া হয়। বাংলাদেশের সংবিধানের ৩৯ নং অনুচ্ছেদে বাক স্বাধীনতার অধিকার, ভাব প্রকাশের অধিকার, সংবাদপত্রের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দানের অধিকারের কথা বলা হয়েছে। ১৯৭৩ সালে দি প্রিন্টিং প্রেস অ্যান্ড পাবলিকেশন (ডিক্লেয়ারেশন অ্যান্ড রেজিস্ট্রেশন) অ্যাক্ট পাশ হয়। মুদ্রণ যন্ত্র বসানো, সংবাদপত্র মুদ্রণ ও প্রকাশের জন্য ঘোষণা দান এবং গ্রন্থাদি নিবন্ধনের জন্য এই আইন জারি করা হয়। অর্থাৎ, এই আইনের আওতায় বাংলাদেশে কোনো সংবাদপত্র ও সাময়িকী প্রকাশ করতে হলে যে কোনো ব্যক্তিকে প্রকাশ্যে সরকারের কাছ থেকে অনুমতি, ঘোষণা ও নিবন্ধীকরণ করিয়ে নিতে হবে।[৩৯] এই আইনে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে সংবাদপত্র প্রকাশের অনুমতি দানের ক্ষমতা দেওয়া হয়। ১৯৭৪ সালে নিউজপেপার এমপ্লয়িজ (কন্ডিশন অব সার্ভিস) অ্যাক্ট পাশ করা হয়। এই আইনের মাধ্যমে সাংবাদিক ও সংবাদপত্র কর্মীদের সুযোগ সুবিধার বিধান উল্লেখ করা হয়। ১৯৭৪ সালে স্পেশাল পাওয়ার্স অ্যাক্ট পাশ করা হয়। আইনটি খুবই জরুরি, কারণ এই আইনের বিধানে সরকার ক্ষেত্র বিশেষে 'প্রি-সেন্সরশিপ' জারি করতে, কাগজ বাজেয়াপ্ত করতে এবং প্রকাশনা বন্ধ করতে পারবে বলে উল্লেখ করা হয়। ১৯৭৪ সালে আরেকটি আইন পাশ করা হয় যা শুধু বাংলাদেশের সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে যুগান্তকারীই নয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণও বটে। প্রেস কাউন্সিল অ্যাক্ট পাশ হয় যার মাধ্যমে বাংলাদেশে 'প্রেস কাউন্সিল' প্রতিষ্ঠিত হয়। সংবাদক্ষেত্রের মান উন্নয়ন এবং স্বাধীনতা রক্ষা করা 'প্রেস কাউন্সিলের' দায়িত্ব।

১৯৭৪ সালে শিশু আইন প্রণীত হয়। আইনে ১৬ বছর বয়স পর্যন্ত ব্যক্তিকে শিশু হিসেবে ঘোষণা দেওয়া হয়। তাছাড়াও যদি কোনো আদালতের শুনানিতে কোনো শিশু জড়িত থাকে তাহলে তার কোনো বিবরণ, এবং প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট শিশুর পরিচিত প্রকাশ হয়ে যেতে পারে এমন রিপোর্ট সংবাদপত্র, সাময়িকী বা বার্তাপত্রে প্রকাশ বা মুদ্রণ এবং শিশুর ছবি ছাপা নিষিদ্ধ করা হয়।[৪০] ১৯৭৫ সালের জুন মাসে The Newspaper (Annulment of Declaration) Act, 1975 জারি করা হয়। ফলে তৎকালীন বাংলাদেশে চারটি সংবাদপত্র ছাড়া বাকি সব সংবাদপত্র বন্ধ হয়ে যায়। চারটি সংবাদপত্রগুলো হলো, বাংলাদেশ অবজারভার, বাংলাদেশ টাইমস, দৈনিক বাংলা ও দৈনিক ইত্তেফাক। সংবাদপত্রগুলো সরকার কর্তৃক অধিগৃহীত হয়। পত্রিকাগুলো পরিচালনার জন্য সরকার বোর্ড গঠন করে দেয় এবং এজন্য The Government Owned Newspaper (Management) Act, 1975 প্রণয়ন করা হয়। পরে অবশ্য সরকার চারটি সংবাদপত্রেরই মালিকানা ফেরত দেয়। আর পরে যে দুটি আইন দ্বারা সংবাদপত্র বন্ধ করা হয়েছিল এবং তাদের পরিচালনার বোর্ড গঠন করা হয়েছিল সেই দুটি আইন পরে বাতিল করা হয় এবং পরিচালনার বোর্ডও বাতিল করা হয়। ১৯৭৯ সালে বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা অধ্যাদেশ প্রণয়ন করা হয়, যার মাধ্যমে সংবাদ সংস্থা প্রতিষ্ঠা লাভ করে। বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থাগুলোর সেবা, সংবাদ ও তার সঙ্গে জড়িত ঘটনাসূত্রে সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলির দায়িত্ব গ্রহণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে আইনটি জারি করা হয়। সাংবাদিকতার নৈতিকতার ক্ষেত্রে উচ্চ

---

[৩৮] গাজী শামসুর রহমান, সংবাদ বিষয়ক আইন, পৃ. ২৫৩।

[৩৯] ধারা ৭ ও ধারা ১২, দি প্রিন্টিং প্রেস অ্যান্ড পাবলিকেশন (ডিক্লেয়ারেশন অ্যান্ড রেজিস্ট্রেশন) অ্যাক্ট, ১৯৭৩।

[৪০] ধারা ২ ও ১৭, শিশু আইন ১৯৭৪ (১৯৭৪ সালের ৩৩ নং আইন)।

মানসম্পন্ন সংবাদ সংস্থা গড়ে তোলার জন্য পরোক্ষভাবে উৎসাহ দানও এই অধ্যাদেশের লক্ষ্য।[৪১] ১৯৮২ সালে শিল্প সম্পর্ক (বিধিমালা) অধ্যাদেশ পাশ করা হয়। উচ্চতর জাতীয় উৎপাদনশীলতা অর্জন এবং শিল্পসমূহে শান্তি ও শৃঙ্খলা রাখতে এবং নিয়ন্ত্রণ করতে এই আইন পাশ করা হয়। ১৯৯০ সালে ১৯৭৪ সালে প্রণীত বিশেষ ক্ষমতা আইনের ১৬, ১৭, ১৮ ধারা বাতিল করা হয়। এর ফলে প্রকাশনা বন্ধ করে দেওয়া এবং 'প্রিসেন্সরশিপ' ক্ষমতা বিলুপ্ত করা হয়। ২০০০ সালে গ্রন্থস্বত্ব আইন প্রণীত হয়। পূর্বের গ্রন্থস্বত্ব অধ্যাদেশ-এর পরিবর্তে আইন কার্যকর হয়। গ্রন্থস্বত্ব আইন প্রণয়নের মাধ্যমে লেখকের বা রচয়িতার অধিকার সংরক্ষিত হয়। আইন সাহিত্য-কর্ম, কবিতা, নাটক, গবেষণা কাজ, সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবর বা রচনা, কম্পিউটার প্রোগ্রাম, বিভিন্ন ধরনের ডাটাবেজ, সিনেমা, সঙ্গীত রচনা, যে কোনো ধরনের চিত্র-কর্ম বা শিল্প-কর্ম, ফটোগ্রাফি, হস্তশিল্প, স্থপতি, বিজ্ঞাপন, নকশা ইত্যাদিকে কপিরাইট আইনের আওতায় আনে। লেখক বা রচয়িতা যতক্ষণ পর্যন্ত তার রচনার স্বত্ব বা তার রচনা পুনরুৎপাদনের অনুমতি না দেয় ততক্ষণ পর্যন্ত লেখকের অধিকার অগ্রগণ্য। বিধানটি সংবাদপত্র, সাময়িকী, পত্রিকাসহ অনেক প্রকাশনা মাধ্যমকে অন্তর্ভুক্ত করে। ২০০৬ সালে বাংলাদেশ শ্রম আইন প্রণীত হয়। আইনে শ্রম ও শ্রমিক সংক্রান্ত যাবতীয় বিধান উল্লিখিত। আইনটি প্রণয়নের মাধ্যমে পূর্বের প্রণয়নকৃত শ্রম সংক্রান্ত ২৭টি আইন বাতিল করা হয়। আইনের বিভিন্ন ধারায় সংবাদপত্র সংক্রান্ত বেশ কিছু বিধান সন্নিবেশিত রয়েছে। সংবাদপত্র, সংবাপত্র শ্রমিক, সংবাদপত্র ছাপখানা শ্রমিক এবং সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া সংবাদপত্র শ্রমিকের মজুরি বোর্ড ও মজুরি নির্ধারণ সংক্রান্ত বিধান, সংবাদপত্র শ্রমিকগণের জন্য ভবিষ্য তহবিল সংক্রান্ত বিধানাবলি এই আইনে উল্লেখ করা হয়েছে।

এরপর সংবাদ বিষয়ক আর কোনো আইন বর্তমান সময় পর্যন্ত দেখা যায় না। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতা বিষয়ক সুনির্দিষ্ট কিছু আইন প্রণীত হলেও পূর্বের কিছু আইন যা ব্রিটিশ সরকার প্রণয়ন করে গেছে সেই আইনগুলো বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর বাংলাদেশ সরকার আত্তীকরণ করে। আইনগুলোর বিভিন্ন বিধানে সংবাদ, সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতা বিষয়ক বিভিন্ন বিধান বিক্ষিপ্তভাবে রয়েছে। এই আইনগুলো দ্বারাই সংবাদ মাধ্যম বা সংবাদপত্রগুলো পরিচালিত হচ্ছে। অবাধ তথ্যের আদান প্রদান, দুর্নীতি মুক্তকরণ এবং যেকোনো শ্রেণীর জনগণ যেন যে কোনো ধরনের তথ্য পেতে পারে তা নিশ্চিত করার জন্য তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ প্রণয়ন করা হয়েছে। ফলে যেকোনো শ্রেণীর জনগণ সরকারি অফিসসহ যেকোনো তথ্য জানার অধিকার লাভ করে। কিন্তু এই আইন সংবাদ মাধ্যম বা সংবাদক্ষেত্রকে এর আওতায় আনে না। জাতীয় পর্যায়ের আইনের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক নীতিমালাও গৃহীত হয়েছে। ১৯৬৫ সালে আন্তর্জাতিক জনসংযোগ নীতিমালা বা কোড অব এথেন্স এবং ১৯৮৭ সালে সাংবাদিকদের পেশাগত উৎকর্ষ ও নৈতিকতা বিষয়ক ইউনেস্কো সুপারিশ প্রণীত হয়, যা সাংবাদিকতা পেশায় নতুন মাত্রা যোগ করে। সাংবাদিকতাকে পেশা হিসেবে উন্নত ও তার উৎকর্ষ বৃদ্ধির জন্য জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক পর্যায়ে আরও বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে এবং হচ্ছে।

বাংলাদেশে সংবাদপত্র বিষয়ক বিভিন্ন আইন

বাংলাদেশে প্রচলিত সংবাদ বিষয়ক বিভিন্ন আইনগুলো হলো: দণ্ডবিধি ১৮৬০, অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন ১৮৭৬, টেলিগ্রাফ আইন ১৮৮৫, ডাকঘর আইন ১৮৯৮, ফৌজদারি কার্যবিধি ১৮৯৮, দাপ্তরিক

---

[৪১] আবু নছর মোঃ গাজীউল হক, *বাংলাদেশের গণমাধ্যম আইন ও বিধিমালা*, পৃ. ৩৬।

গোপনীয়তা আইন ১৯২৩, আদালত অবমাননা আইন ১৯২৬, কপিরাইট অধ্যাদেশ ১৯৬২, অশালীন বিজ্ঞাপন নিষিদ্ধকরণ আইন ১৯৬৩, চলচ্চিত্র সেন্সরশিপ আইন ১৯৬৩, শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) ১৯৬৫, শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশ ১৯৬৯, ছাপাখানা ও প্রকাশনা (ঘোষণা ও নিবন্ধন) আইন ১৯৭৩, প্রেস কাউন্সিল আইন ১৯৭৪, বিশেষ ক্ষমতা আইন ১৯৭৪, সংবাদপত্র কর্মচারী (চাকরির শর্তাবলি) আইন ১৯৭৪, শিশু আইন ১৯৭৪, সরকার নিয়ন্ত্রিত সংবাদপত্র (ব্যবস্থাপনা) আইন ১৯৭৫, সংবাদপত্র (নিবন্ধন বাতিল) আইন ১৯৭৫, বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা অধ্যাদেশ ১৯৭৯, শিল্প সম্পর্ক (নিয়ন্ত্রণ) অধ্যাদেশ ১৯৮২, চলচ্চিত্র সেন্সরশীপ (সংশোধন) অধ্যাদেশ ১৯৮২, কপিরাইট আইন ২০০০, বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬।

বাংলাদেশে প্রচলিত আইনসমূহ যা সরাসরি সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতাকে খর্ব করে

অফিসিয়াল সিক্রেটস অ্যাক্ট, ১৯২৩

বাংলাদেশের সংবাদ মাধ্যমগুলিকে তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে সরকারি কর্মচারী-কর্মকর্তাদের কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। বরং এই আইনে উল্লেখ আছে কোনো সরকারি কর্মচারী-কর্মকর্তা ইচ্ছে করলে কোনো তথ্যাদি প্রদান করা থেকে বিরত থাকতে পারেন। এ বিষয়ে অফিসিয়াল সিক্রেটস অ্যাক্ট ১৯২৩ (চ্যাপ্টার-১৩ এবং এ্যাক্ট নং ১৯) ব্রিটিশ শাসকদের থেকেই উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া। এটি ১৯১১ সালের 'ইংলিশ অফিসিয়াল সিক্রেটস অ্যাক্ট' এর অনুকরণ। এই আইনের ধারা ৩, ৩(১), ৫, ৫(২), ১৪ তে উল্লেখ করা হয়েছে যে, যদি কোনো তথ্যের প্রকাশ বাংলাদেশের নিরাপত্তা ও স্বার্থের পরিপন্থী হয় তাহলে তা প্রকাশ করা যাবে না। এছাড়া দেশের নিরাপত্তামূলক কার্যক্রম, দেশের সুরক্ষা এবং সঞ্চিত সামরিক শক্তি সংক্রান্ত তথ্যাদিও প্রকাশ করার উপর বিধি নিষেধ আরোপ করা হয়।[৪২] আইনটির কারণে সংবাদ মাধ্যমের কাছে যে কোনো তথ্য প্রদানকে একটি অপরাধ হিসাবে দেখা হয়। এমনকি সেই তথ্যটির সাথে রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার বিষয়টির যদি কোনো সম্পর্ক নাও থাকে তবুও তা প্রকাশ করা বেআইনি। আইনটি কার্যকর করার ব্যাপারে সরকারি বিভাগগুলি খুব তৎপর; কারণ এই আইনের কারণে তারা অতিরিক্ত ঝামেলার হাত থেকে রেহাই পায়। আইনের কার্যকারিতার কারণে সরকারি তথ্যের অবাধ প্রবাহ বাধাগ্রস্ত হয়। আইন অনুসারে বিশেষ অনুমতি ছাড়া সরকারি তথ্য পাবার কোনো সুযোগ নেই। সরকারি কোনো তথ্য যদি সংবাদ মাধ্যম নিতে চায় তাহলে তাকে প্রথমে একটি প্রশ্নপত্র প্রস্তুত করতে হয়; তারপর সেটিকে পাঠাতে হয় তথ্য মন্ত্রণালয়ে, তথ্য মন্ত্রণালয় তখন সেই প্রশ্নপত্রটি সংশ্লিষ্ট সরকারি বিভাগে পাঠায়, সরকারি বিধি মোতাবেক মন্ত্রী বা সচিবকে পাশ কাটিয়ে সরকারি কোনো তথ্য পাওয়া অসম্ভব।

স্পেশাল পাওয়ারস অ্যাক্ট, ১৯৭৪

স্পেশাল পাওয়ারস অ্যাক্টের ১৬, ১৭ এবং ১৮ ধারায় ক্ষতিকর কার্যের নিষেধাজ্ঞার নামে মূলত সংবাদপত্রের স্বাধীনতাকে খর্ব করা হয়েছে। ১৯৭৪ সালের ৯ই ফেব্রুয়ারি আইনটি পাশ হয় (অ্যাক্ট নং XIV অব ১৯৭৪); ১৯৯১ সালের আইন নং ১৮ র মাধ্যমে ১৯৯১ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত

[৪২] Gazi Shamsur Rahman, *Laws Relating to Press in Bangladesh* (Dhaka: Press Council, 1985), p. 41.

স্পেশাল পাওয়ারস অ্যাক্টের পরিবর্তন-পরিবর্ধন করা হয়।[৪৩] উপরোক্ত ধারাগুলি অনুযায়ী যদি কোনো ব্যক্তি সংবাদ মাধ্যমে ক্ষতিকর কোনো রিপোর্ট প্রকাশ করে তাহলে তাকে পাঁচ (৫) বছর কারাদণ্ড ভোগ করতে হবে। এছাড়াও, যদি কোনো সংবাদপত্র ক্ষতিকর কোনো রিপোর্ট প্রকাশ করে তাহলে সরকার তার প্রকাশনা নিষিদ্ধ করতে পারবে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, প্রকাশিত তথ্য সত্য মিথ্যা যাই হোক না কেন সেটা বিবেচ্য বিষয় হবে না। এই আইনে এমন কিছু অগণতান্ত্রিক বিধান আছে যা মত প্রকাশের স্বাধীনাতাকে খর্ব করে। এর বিধান অনুযায়ী যে কোনো প্রকাশনার উপর সরকারের নিয়ন্ত্রণ অধিকার রয়েছে এবং সরকার যেকোনো রকমের প্রকাশনাকে নিষিদ্ধ করার সুযোগ পাবে। এমনকি কোন সত্য রিপোর্টের বিরুদ্ধেও সরকার অবস্থান নিতে পারবে। সত্য হওয়া সত্ত্বেও রিপোর্টটি সরকারের জন হিতকর না বা ক্ষতিকর এ অজুহাতে সরকার উক্ত পত্রিকার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে। তাই নিঃসন্দেহে বলা যায় এ আইনটি একটি নিষ্পেষণমূলক আইন।[৪৪]

প্রেস ডিক্লারেশন এন্ড রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্ট, ১৯৭৩

বাংলাদেশে কোনো ব্যক্তিকে সংবাদপত্র, সাময়িকী ও বই ইত্যাদি প্রকাশ করতে চাইলে প্রেস ডিক্লারেশন এন্ড রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্টের নিয়ম অনুযায়ী সরকারের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে ঘোষণা ও নিবন্ধীকরণ করতে হবে। এই আইনের ২০ নং ধারা অনুসারে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ঘোষণার সত্য নির্ণয়ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিবন্ধন বাতিল ঘোষণা করতে পারবে।[৪৫] এই ধারায় উল্লেখিত বিধান অনুসারে ম্যাজিস্ট্রেট এই আইনের ধারা ১২-এর আওতায় কোনো ঘোষণা প্রমাণীকরণ সাপেক্ষে কোনো প্রকাশনাকে অনুমতি প্রদান করতে পারে এবং ২০/এ ধারা অনুযায়ী কিছু পত্র পত্রিকাকে বন্ধ ও বাজেয়াপ্ত ঘোষণাও করতে পারে; এবং এ বিষয়ে পত্রপত্রিকার সাথে সম্পর্কিত সকল ব্যক্তির বিরুদ্ধে 'সার্চ ওয়ারেন্ট' জারি করতে পারবে। প্রকৃত সাংবাদিক এবং প্রকাশকের মান যাচাই করার পরিবর্তে এ আইনটির কারণে প্রচলিত আইনের অবনমন সাধিত হয়েছে। এখানে গুণগত মান বিবেচনা না করে বরং রাজনৈতিক বিবেচনার দিকেই বেশি নজর দেওয়া হয়েছে। আইনটির কারণে সরকারের মধ্যে সংবাদপত্রসহ অন্যান্য পত্র পত্রিকা প্রকাশের উপর বিধি নিষেধ আরোপের একটি প্রবণতার সৃষ্টি হয়। ১৯৯১ সালে ছাপাখানা ও প্রকাশনা (ঘোষণা ও নিবন্ধীকরণ) সংশোধন আইন দ্বারা এই আইনের কিছু পরিবর্তন আনা হয়। এই আইন সংশোধন করে সংবাদপত্র আপিল বোর্ড গঠন ও স্থাপন করা হয়েছে এবং সরকারের কিছু ক্ষমতা বোর্ডকে দেওয়া হয়েছে। এর ফলে প্রকাশনা ও নিবন্ধন বাতিলের ব্যাপারে বোর্ডের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হিসেবে বিবেচিত। এই বোর্ডের উদ্দেশ্য সংবাদপত্রকে কিছুটা স্বাধীনতা দেওয়া।

ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮

দুষ্কৃতির তদন্ত এবং তার জন্য শাস্তি বিধানের প্রক্রিয়া নিরূপণ করতে ১৮৯৮ সালের 'দ্যা কোড অব ক্রিমিনাল প্রসিডিউরের' সূত্রপাত ঘটে। ১৯৯১ সালে 'কোড অব ক্রিমিনাল প্রসিডিউর অধ্যাদেশের' মাধ্যমে সরকার 'কোড অব ক্রিমিনাল প্রসিডিউর' এর ৯৯/এ ধারা, ৯৯/বি নং ধারা, ৯৯/ডি নং ধারা

---

[৪৩] S A Salam, *Mass Media in Bangladesh: Newspaper, Radioand Television* (Dhaka: PIB Press, 1997), p. 25.

[৪৪] G Hoque, *Mass Media Laws and Regulation in Bangladesh* (Singapore: AMIC Publications, 1992), p. 32.

[৪৫] G. Kibriya, *The Press in Bangladesh and Issues of Mass Media* (Dhaka: Sunday Publications, 1985), p. 16.

এবং 'সেডিউল নং ২' সংশোধন করেছে।[৪৬] সংবাদপত্রগুলি মাঝে মাঝে এমন সব সত্যকে জনসমক্ষে উপস্থাপন করে যা মানুষের ধর্মীয় অনুভূতির জন্য অত্যন্ত সংবেদনশীল। এ সকল সত্য তথ্য কখনও কখনও সম্প্রদায় বা শ্রেণীদ্বন্দ্বেরও জন্ম দিয়ে থাকে। 'কোড অব ক্রিমিনাল প্রসিডিরের' ৯৯ (৩) নং ধারার মাধ্যমে উপরোক্ত বিষয়গুলো পত্রপত্রিকায় ছাপানো হলে তা নিষিদ্ধ করার এখতিয়ার সরকারকে প্রদান করা হয়েছে। এ সকল বিধান বলেই সরকার তাদের মালামাল জব্দ করতে এবং সার্চ ওয়ারেন্ট জারি করতে পারে। এ জাতীয় কর্মকাণ্ডের জন্য সংবাদপত্রের মালিকের দুই বছরের কারাদণ্ড বা জরিমানা, বা উভয়বিধ শাস্তির বিধান রাখা হয়েছে।

দণ্ডবিধি, ১৮৬০

দণ্ডবিধির বিভিন্ন ধারায় সংবাদ সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে, যেমন – মানহানি, রাষ্ট্রদ্রোহ, অশ্লীলতা, ধর্মবিশ্বাসে আঘাত, নির্বাচন সম্পর্কে মিথ্যা বিবৃতি ইত্যাদি। এর মধ্যে অনেকগুলো বিষয় রয়েছে যা খুবই স্পর্শকাতর এবং যা সংবাদ প্রকাশের ধারাকে ব্যাহত করে, যা অনেক সময়ে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান অনেকের জন্যই মানহানিকর হতে পারে, রাষ্ট্রদ্রোহী হতে পারে, আবার ধর্মবিশ্বাসে আঘাত দিতে পারে। তাই সংবাদ প্রকাশের সময় এগুলোকে খেয়াল রেখে প্রকাশ করা উচিত। আবার সত্য ও বস্তুনিষ্ঠ তথ্য প্রকাশের ক্ষেত্রেও এ বিষয়গুলো বাধা হয়ে দাঁড়ায়, যা এক অর্থে সংবাদ প্রকাশের স্বাধীনতাকে খর্ব করে। দণ্ডবিধির ৫০১ ধারায় মানহানিকর কোনো সংবাদ প্রকাশের বিষয়ে বলা হয়েছে। সংবাদপত্রের কাজ হচ্ছে বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশন করা। কিন্তু ফৌজদারি আইনে অনেক সময়ে সত্য ঘটনার প্রকাশও মানহানিকর হয়। আর দণ্ডবিধির আলোচ্য ধারাসহ ৫০২ ধারাতেও মানহানির পরিধি পরিষ্কার নয়। এজন্য একজন সংবাদিকের সত্য সংবাদ পরিবেশন করতে গিয়েও আদালতের সামনে যাওয়ার ভয় থাকে, যা সংবাদপত্রের স্বাধীনতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে। বর্তমানে কার্টুন একটি শিল্প মাধ্যম হিসেবে পরিগণিত হচ্ছে। কিন্তু ৫০২ ধারায় মানহানির কার্টুন প্রকাশ শাস্তিযোগ্য অপরাধ। আর মানহানি একান্তই অভিযোগকারীর চিন্তাপ্রসূত বিধায় একজন সংবাদিকের মানহানির প্রেক্ষাপটে বিবেচনা বাস্তবসম্মত নয়। এজন্য সংবাদপত্র বা সাংবাদিকের আলোচ্য ৫০১ এবং ৫০২ ধারার অধীনে পেশাগত উদ্দেশ্য পালনে বাধার সৃষ্টি হয়। অপর দিকে ৫০৫(ক) ধারায় দেশের নিরাপত্তা বা জনশৃঙ্খলার সাথে সংশিষ্ট সংবাদ পরিবেশনের অপরাধের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু দেশের নিরাপত্তা ও জনশৃঙ্খলা সময় ও পরিস্থিতি ভেদে ভিন্ন রূপ ধারণ করে। যদি সংবাদপত্রের উদ্দেশ্য সঠিক ও অবাধ তথ্যপ্রবাহ হয়ে থাকে তাহলে নীতি ৫০৫ (ক) ধারার সাথে সাংঘর্ষিক। প্রায়ই দেখা যায়, জন-শৃঙ্খলা বা নিরাপত্তার অজুহাতে অনেক সময় সংবাদ প্রকাশের উপর সরকারি হস্তক্ষেপ করা হয়, যা জন হস্তক্ষেপ না হয়ে নির্বাহী হস্তক্ষেপ তথা রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ হয়ে যায়, যা একজন সাংবাদিক বা সংবাদপত্রের স্বাধীনতার ক্ষেত্রে ক্ষতিকর। তাই সংবাদপত্রের সংবাদ পরিবেশনে দণ্ডবিধির সংশ্লিষ্ট ৫০১, ৫০২ বা ৫০৫ (ক) ধারা অধিকতর সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট ব্যাখ্যামূলক করা উচিত। দণ্ডবিধি (সংশোধন) অধ্যাদেশ ১৯৯১ দ্বারা ১৮৬০ সালের দন্ডবিধি আইনের সংশোধন করা হয়েছে। দণ্ডবিধি আইনের ৫০৫ ধারা সংশোধন করে সেখানে শাস্তির বিধান ২ বছর থেকে বাড়িয়ে ৭ বছর করা হয়েছে। ১৯৭৩ সালের ছাপাখানা ও প্রকাশনা (ঘোষণা ও নিবন্ধীকরণ) আইন সংশোধন করে প্রেস আপিল বোর্ড গঠন করা হয়েছে, যার উদ্দেশ্য সংবাদপত্রকে কিছুটা স্বাধীনতা দেওয়া। কিন্তু দণ্ডবিধির ৫০৫ (ক) ধারা সংযোজনের মাধ্যমে সেই স্বাধীনতাকে খর্ব করা হয়েছে।

---

[৪৬] M. Islam, *Constitutional Law of Bangladesh* (Dhaka: Saikat Press Ltd., 1995), p. 27.

উপসংহার

বাংলাদেশে প্রচলিত যে সকল আইন এখানে আলোচনা করা হয়েছে তাদের অধিকাংশই বাংলাদেশের পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে গ্রহণযোগ্য নয়, অধিকাংশ আইনই বাংলাদেশে সংবাদ প্রকাশের স্বাধীনতাকে বাধাগ্রস্ত করে। এসব আইনের অনেক বিষয় সংবাদ মাধ্যম এবং গণতন্ত্রের মধ্যে বিরাজমান পারস্পরিক সম্পর্ককে নষ্ট করছে। আর এ কারণে গণতন্ত্রায়ণে সংবাদ মাধ্যমের ভূমিকাকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে দেখা প্রয়োজন। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৩৯ নং অনুচ্ছেদ একদিকে যেমন বাক স্বাধীনতার অধিকার, ভাব প্রকাশের অধিকার, সংবাদপত্রের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দানের অধিকারের কথা বলা হয়েছে, তেমনি অনুচ্ছেদের উপ-অনুচ্ছেদ (২) সংবাদ বিষয়ক কিছু বিধি নিষেধ আরোপ করা হয়েছে। অফিসিয়াল সিক্রেটস অ্যাক্টসহ আরো কিছু আইন নিয়ন্ত্রণমূলক এবং সেগুলি বাংলাদেশের তথ্য অধিকারকে বাধাগ্রস্ত করে, এ সম্পর্কিত সরকারি তথ্যের অধিকারকে খর্ব করে এবং সাংবাদিকগণকে স্বাধীনভাবে কাজ করতে বাধাগ্রস্ত করে। এ সকল আইনের কারণেই আমরা নিশ্চিতভাবে এ কথা বলতে পারি না যে, বাংলাদেশে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা আছে। ভারতীয় উপমহাদেশের অধিকাংশ সরকারি সংবাদপত্রকে নিয়ন্ত্রিত রাখতে সহায়ক অনেক ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী আইনকে বহাল রাখা হয়েছে। অফিসিয়াল সিক্রেটস অ্যাক্টসহ অন্যান্য বেশ কিছু আইন বাংলাদেশ, ভারত, এবং পাকিস্তানে একই উদ্দেশ্য নিয়ে অত্যন্ত মারাত্মকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে ও হচ্ছে। সুতরাং 'জনগণের প্রহরী' এবং 'জনগণের তথ্য দাতা' হিসেবে সংবাদপত্রের যে গণতান্ত্রিক ভূমিকা রয়েছে উক্ত নিয়ন্ত্রমূলক আইনের কারণে সেটি স্পষ্টতই বাধাগ্রস্ত হয়। সংবাদপত্রের স্বাধীনতার ক্ষেত্রে উদার দৃষ্টিভঙ্গি এবং গণতান্ত্রিক মনোভাবের ভিত্তিতে এখানে বাংলাদেশের সংবাদপত্র বিষয়ক আইনগুলিকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। যে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জনগণ এবং সরকার একে অন্যের তথ্যের অধিকার ভোগ করে তাকেই আদর্শ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বলা যায়। তথ্যের অধিকার নিশ্চিতকরণের বিষয়টি অবশ্যম্ভাবীভাবে সরকারের মন্ত্রণালয়সমূহের উপর নির্ভরশীল। তবে এক্ষেত্রে সংবাদ মাধ্যম সংক্রান্ত আইনের সংশোধন আবশ্যক। সংশোধনীর মাধ্যমে সংবাদ মাধ্যমের নিরাপত্তামূলক এবং অনুসন্ধানমূলক কর্মকাণ্ডের অধিকার দেওয়া প্রয়োজন। সংবাদ মাধ্যমকে হয়ে উঠতে হবে সর্বসাধারণের আশ্রয়স্থল যেখানে সকল মানুষ পারস্পরিক যোগাযোগের মাধ্যমে একটি মতৈক্যে পৌঁছাতে পারবে, সেই মত্যৈকের ভিত্তিতে সমাজকে দিতে পারবে নির্দেশনা। সংবাদ মাধ্যমগুলোর অবশ্যই গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কাজ করা উচিত। তাদের কাছে মানুষের অর্থাৎ অতিসাধারণ থেকে সকল শ্রেণীর তথা সিভিল সোসাইটির জনগণের মতামত প্রকাশের সুযোগ থাকতে হবে। স্বাধীনতভাবে কাজ করার প্রতিবন্ধকতা 'জনগণের প্রহরী' হিসাবে সংবাদ মাধ্যমগুলির কাজ করার অমিত সম্ভাবনাকে নষ্ট করছে। প্রধান বিচারপতি ককবার্নের মতে, সকলেই জানেন যে সংবাদক্ষেত্র থেকে যেসব সমালোচনা করা হয়ে থাকে তা জনকল্যাণমূলক কর্তব্যের যথার্থ পরিচালনার শ্রেষ্ঠ গ্যারান্টি।[৪৭] একজন সাংবাদিক কতটুকু পেশাগত দায়িত্ব পালন করবে তার মাপকাঠি থাকা প্রয়োজন। সবসময় বিবেক ও মূল্যবোধ সঠিকভাবে কাজ করে না, আর তখনই দরকার হয় আইনের। সংবাদ বিষয়ক আইন এমন হওয়া দরকার যা সংবাদপত্রের ধারাকে ব্যাহত করবে না, তাকে আরও কার্যকরভাবে বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতার প্রসারে সাহায্য করবে।

---

[৪৭] সুধাংশু শেখর রায়, *রিপোর্টিং* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০১), পৃ. ১২২।

ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ জার্নাল
সংখ্যা ২৩ (১৪২২ বঙ্গাব্দ)

মানবতাবাদী দার্শনিক ধারা ও বাঙালি মানস

জওশন আরা জলি*

Abstract: Humanism is one of the central features of philosophy that emphasizes on human interests and values in a meticulous manner. The adherents' of humanism in the west reject other worldliness in their studies and emphasize on the capacity of people predominately. But, its eastern followers try to combine both physical and spiritual aspirations of people. Though no humanist tradition developed in Bengal as great as western one, humanist tradition of thoughts, is in the psyche of Bengali thinkers with the passage of time. This paper aims to focus on some leading tendencies of western and eastern humanism admitting the uniqueness of eastern trend, in conjunction with the ideas of Bengali thinkers, in this regard.

ভূমিকা

মানবতাবাদ হলো এমন একটি দর্শন, যা মানুষের মূল্য তথা মর্যাদাকে স্বীকার করে এবং তাকেই সবকিছুর পরিমাপক হিসেবে গণ্য করে কিংবা মানুষের প্রকৃতি, তার সীমাবদ্ধতা অথবা তার স্বার্থকে আলোচ্য বিষয় হিসেবে গ্রহণ করে।[১] পল এডওয়ার্ড সম্পাদিত 'দি এনসাইক্লোপিডিয়া অব ফিলোসফি'তে সাম্যবাদ, প্রয়োগবাদ, ব্যক্তিত্ববাদ ও অস্তিত্ববাদ বিষয়ক মতবাদগুলোকেও মানবতাবাদ হিসেবে নির্দেশ করা হয়।[২] কেননা এ সকল মতবাদই মানবকেন্দ্রিক, মানুষের অনন্তশক্তি ও সম্ভাবনায় বিশ্বাসী, মানুষ হিসেবে মানুষের পূর্ণ স্বীকৃতি দিতে সচেষ্ট। মানবতাবাদের কেন্দ্রবিন্দু মানুষ। নিরন্তর সৃষ্টিশীলতার মধ্য দিয়ে বর্তমান পৃথিবী যে রূপ পরিগ্রহ করেছে মানুষই তার প্রত্যক্ষ স্রষ্টা। ভুল-ভ্রান্তি, পরাজয়, ভীরুতা থাকলেও সকল বাধা অতিক্রম করে শেষ যুদ্ধে জয়ী হওয়ার ক্ষমতা মানুষের রয়েছে। এভাবেই আত্মশক্তির উদ্বোধনের মাধ্যমে মানবতাবাদ মানুষকে সত্য, সুন্দর ও পূর্ণ করে তোলে। এই

---

* প্রভাষক, দর্শন বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

[১] Paul Edwards, ed., *The Encyclopedia of Philosophy*, vol. 4 (New York: The Macmillan Company &The Free Press, 1967), 69-70.

[২] Ibid., 72.

মর্মবাণীকে হৃদয়ে ধারণ করে পাশ্চাত্যের সোফিস্ট থেকে শুরু করে প্রকৃতিবাদ, বস্তুবাদ, রেনেসাঁস আন্দোলন, জ্ঞানালোক আন্দোলন, উপযোগবাদ, প্রয়োগবাদ, দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ ও অস্তিত্ববাদ এবং প্রাচ্যের বৌদ্ধ দর্শন, বৈষ্ণব দর্শন, বেদান্ত কিংবা সুফিবাদ – সকল দার্শনিক ধারাই মানুষ ও তার ক্ষমতাকে বিশেষভাবে মূল্যায়ন করে। তবে, পাশ্চাত্য দর্শনে মানবতাবাদের যে স্বরূপ লক্ষ করা যায় তা পার্থিব, প্রত্যক্ষবাদী, ইহজাগতিক। কিন্তু প্রাচ্য মানবতাবাদ মানুষের দিব্য মহিমায় বিশ্বাসী। বাঙালি মানসেও এই মানবতাবাদী উপাদান বা চিন্তাধারার প্রাচুর্য লক্ষণীয়। আলোচ্য প্রবন্ধে পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের মানবতাবাদী দার্শনিক ধারাগুলোর সংক্ষিপ্ত উল্লেখসহ প্রাচ্য ধারার স্বাতন্ত্র্য তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

মানবতাবাদের পাশ্চাত্য ধারা

মানবতাবাদ শব্দটি ইংরেজি Humanism শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ। Humanism শব্দটি ল্যাটিন 'Literae Humaniores' থেকে এসেছে। শব্দটির অনেক ব্যাখ্যা পরিলক্ষিত হয়। অনেকে মনে করেন এর দ্বারা প্রাচীন সাহিত্য, সংস্কৃতির গবেষণা ও অনুশীলনকে বুঝায়। এক সময় Humanist বলতে বোঝাতো হারিয়ে যাওয়া প্রাচীন গ্রিক, ল্যাটিন জ্ঞান ও সাহিত্য চর্চাকারীকে। প্রকৃতপক্ষে, মানবতাবাদ মানে মানুষকে ভালবাসা বা মূল্য দেওয়া, ন্যায়বিচারকে মূল্য দেওয়া, পীড়িতের প্রতি সমবেদনা, সৎ কথা বলা, কথায় ও কাজে এক থাকা, সংস্কৃতি ও সৌন্দর্যকে ভালবাসা, মুক্তবুদ্ধির চর্চা করা, কুসংস্কার দূর করা ইত্যাদি।

মানবতাবাদ শব্দটির অর্থ যেমন ব্যাপক তেমনি এর ইতিহাসও সুদীর্ঘ। খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতকের দ্বিতীয়ার্ধে গ্রীকদর্শনে 'সোফিস্ট' নামে এক শিক্ষক সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ঘটে। পূর্ববর্তী গ্রীক দার্শনিকরা যেখানে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মূল তত্ত্বের স্বরূপ অনুসন্ধানে সচেষ্ট ছিলেন, সেখানে সোফিস্টগণ ঘোষণা করলেন যে, বাহ্য প্রকৃতি নয়, মানব প্রকৃতি তথা মানুষ ও মানুষের প্রয়োজনই দার্শনিক অনুসন্ধানের মূল উপজীব্য। মানুষকে সকল কিছুর মানদণ্ড বিবেচনা করে[৩] সে আলোকে দর্শনের আলোচনার জন্য সোফিস্ট দার্শনিক প্রোটাগোরাসকে (খ্রিস্টপূর্ব ৪৮০-৪১০) মানবতাবাদী দর্শনের জনকও বলা হয়। তাঁর এই উক্তির মাধ্যমেই মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষিত হয়। এই ধারা পরবর্তীকালে আরও ক্রমবিকশিত হতে থাকে। গ্রীক দার্শনিক সক্রেটিস (খ্রিস্টপূর্ব ৪৬৯-৩৯৯) সত্য অনুসন্ধানে মানুষকে দেবতার উপর নির্ভর না করে নিজস্ব বৌদ্ধিক চেতনাশক্তির উপর নির্ভর করতে বলেছিলেন এবং এজন্য তাঁকে বিষপানে জীবন উৎসর্গও করতে হয়।

গ্রীক দার্শনিক অ্যারিস্টটল (খ্রিস্টপূর্ব ৩৮৪-৩২২) এর পদার্থবিদ্যা, জীববিদ্যা, মনোবিদ্যা, নীতিবিদ্যা এবং রাষ্ট্রনীতি প্রভৃতি প্রায় সব বিজ্ঞানের কেন্দ্রবিন্দু ছিল মানুষ এবং মানুষের প্রকৃতি। তাঁর মতে, মানুষ প্রকৃতির ক্ষুদ্র এবং চূড়ান্ত লক্ষ্য, বিশেষ কারণে অন্য সকল জীব হতে আলাদা।[৪] মানবীয় চিন্তাধারাকে প্রাকৃতিকবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত করার জন্য কেউ কেউ তাঁর মানতাবাদকে প্রকৃতিবাদী মানবতাবাদও বলে থাকেন। তবে দাস প্রথার সমর্থন, স্ত্রী এবং সন্তানদের উপর যথাক্রমে স্বামী এবং

---

[৩] Bertrand Russell, *History of Western Philosophy* (2nd ed.; London: George Allen & Unwin Ltd., 1975), 94.

[৪] "Man is the measure of all things, of things that are that they are, and of things that are not that they are not." Frank Thilly, *A History of Philosophy* (reprint; New Delhi: SBW Publishers, 2000), 87-88.

বাবার প্রভুত্ব স্বীকার এবং রাষ্ট্রের সকল নাগরিকদের সমান অধিকার সমর্থন না করার কারণে অ্যারিস্টটল তাঁর মানবতাবাদে মানুষকে পূর্ণ মর্যাদা দিতে সমর্থ হননি। আধুনিক দর্শনে অ্যারিস্টটলের প্রকৃতিবাদী মানতাবাদকে পুনরুজ্জীবিত করেছেন হার্বাট স্পিনোজা (১৬৩২-১৬৭৭)। তাঁর বিখ্যাত সূত্রটি হলো 'দিউস সিভে ন্যাচুরা' (*Deus sive Natura*) অর্থাৎ ঈশ্বর অথবা প্রকৃতি এই শব্দ দুটি প্রতিস্থাপনযোগ্যএবং তিনি মানুষকে প্রকৃতির অখণ্ড অংশ বলে উল্লেখ করেন।[৫] পরবর্তীতে চার্লস ডারউইন (১৮০৯-১৮৮২) এর বিবর্তনবাদ প্রকৃতিবাদী মানবতাবাদকে আরো জোরালো করে। আমেরিকায় এই চিন্তাধারার প্রধান পুরোধা ছিলেন জন ডিউই (১৮৫৯-১৯৫২)। তার মতে, বাস্তবতা সম্পূর্ণরূপে প্রদত্ত, তৈরি বা নির্দিষ্ট পন্থা নয়, বরং তা হলো পরিবর্তনশীল, ক্রমবর্ধমান ও উন্নয়নশীল। মানুষের সচেতন চিন্তা এবং বিশ্বাস বাস্তবতার গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

প্রকৃতিবাদী মানবতাবাদের পাশাপাশি বস্তুবাদী মানবতাবাদেরও একটি ধারা রয়েছে। প্রাচীন গ্রীসে ডেমোক্রিটাস (খ্রিস্টপূর্ব ৪৬০-৩৭০), ইপিকিউরাসের (খ্রিস্টপূর্ব ৩৪১-২৭০) দর্শনে এই চিন্তাধারা লক্ষ করা যায়। ডেমোক্রিটাস বিশ্বজগতে সংঘটিত সবকিছুকে অসীম সংখ্যক অনন্ত, অদৃশ্যমান পরমাণুর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া বলে উল্লেখ করেন। নৈতিকতার ক্ষেত্রে তিনি প্রফুল্লতা অর্জনের জন্য মানুষকে সংযম ও সংস্কৃতির চর্চার আহ্বান জানান। ইপিকিউরাস সুখকে মানব জীবনের পরম লক্ষ্য এবং ভালত্বের মানদণ্ড বলে মত প্রকাশ করেছেন। তাঁর মতে, বৌদ্ধিক জীবনযাপনের জন্য সুখ বা আনন্দকে বেছে নেওয়া হলো জ্ঞানের অংশ। সপ্তদশ শতাব্দীতে টমাস হবস (১৫৫৮-১৬৭৯) তাঁর পূর্ণাঙ্গ বস্তুবাদে দেহ এবং এর গতিকে দর্শনের মূল বিষয়বস্তু হিসেবে উল্লেখ করে বস্তুবাদী মানবতাবাদকে সর্বব্যাপী করে তোলেন। তাঁর মতে, মন হলো মস্তিষ্কের অভ্যন্তরীণ একটি সূক্ষ্ম দেহ এবং দেহের সংরক্ষণের জন্য সকল উপায় অবলম্বন করা মানুষের অধিকার এবং যুক্তিসংগত।

চৌদ্দ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ইতালিতে যে মানবতাবাদী রেনেসাঁস আন্দোলনের সূত্রপাত হয়, তার মূল লক্ষ্য ছিল প্রাচীন গ্রীক ও রোমান দর্শন, সাহিত্য, শিল্পকলাকে পুনরুজ্জীবিত করে মানুষের কল্যাণে প্রয়োগ করা। ইবনে সীনা, ইবনে রুশদ, আল-গাজালী, আবু বকর প্রমুখ সুপ্রসিদ্ধ আরব চিন্তাবিদগণের মাধ্যমে প্রাচীন গ্রীসীয় বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি নতুনরূপে স্পেনের মধ্য দিয়ে ইতালিসহ ইউরোপের বিভিন্ন দেশে বিস্তার লাভ করে। মধ্যযুগীয় সকল প্রকার ধর্মান্ধতা ও কুসংস্কার পরিহার করে প্রাচীন সংস্কৃতির পুনরাবিষ্কার ও উন্নয়ন এবং মুক্ত চর্চার মাধ্যমে মানুষকে তার স্বকীয় মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করাই ছিলো রেনেসাঁস আন্দোলনের মূল লক্ষ্য ও উপজীব্য। পেট্রার্ক, বোক্কাসিও, র‍্যাফেল, মাইকেল এঞ্জেলো, লিওনার্দো দা ভিঞ্চি, পিকো অব মিরানডোলা প্রমুখ ছিলেন এই আন্দোলনের মূর্ত প্রতীক।

অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ফ্রান্সে ধর্মীয় ও রাজনৈতিক সব বন্ধন থেকে চিন্তা ও বুদ্ধিকে মুক্ত করার লক্ষ্যে যে বিরাট বিপ্লব সংঘটিত হয়, তা ফরাসি এনলাইটেনমেন্ট বা জ্ঞানালোক আন্দোলন নামে পরিচিতি লাভ করে। মেটরি (১৭০৯-১৭৫১), হেলভেটিয়াস (১৭১৫-১৭৭১), হলব্যাক (১৭২৩ - ১৭৮৯), ডিডেরো ছিলেন এই আন্দোলনের প্রবর্তকগণের মধ্যে অন্যতম। বৈশ্বিক দৃষ্টিভঙ্গি, সমস্যা সমাধানে মানব মনের ক্ষমতায় আস্থা, বুদ্ধিবৃত্তিক উপায়ে মানবজীবন, রাষ্ট্র, ধর্ম, নৈতিকতা, ভাষা সর্বোপরি এই জগৎকে দেখা ও বোঝা জ্ঞানালোক আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য।[৬]

---

[৫] "Man is the microcosm and final goal of nature, distinguished from all other living beings by the possession of reason." Samuel Enoch Stumpf, *Socrates to Sartre: A History of Philosophy* (New York: McGraw- Hill Book Company, 1975), 257.

[৬] Thilly, *History of Philosophy*, 382.

উনবিংশ শতাব্দীতে আরনেস্ট হেকেল (১৮১৮-১৮৮৩), ফুয়েরবাখ (১৮০৪-১৮৭৭), কার্ল মার্কস (১৮১৮-১৮৮৩) ও এঙ্গেলসের বস্তুবাদী চিন্তার নেতৃত্বে জার্মানিতেও বস্তুবাদী মানবতাবাদের বিকাশ ঘটে। হেগেলের দ্বন্দ্বতত্ত্বকে ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদের ভিত্তিতে নির্ধারণ করে মার্কস সূচনা করলেন দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী মতবাদের, যা পর্যায়ক্রমে সাম্যবাদে রূপ লাভ করে। অর্থনৈতিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় মানুষের সৃষ্টিশীল ভূমিকার স্বীকৃতি, ইতিহাস পরিবর্তনের ধারক ও বাহক হিসেবে মানুষকে মূল্যায়ন, সকল প্রকার সামাজিক শোষণের বিরুদ্ধে সর্বহারা শ্রমিক শ্রেণীর সংগ্রাম এবং নতুন শ্রেণীহীন সমাজ গঠন ইত্যাদি মার্কসীয় মানবতাবাদের মর্মকথা।

বস্তুবাদী ও প্রকৃতিবাদী মানবতাবাদের বাইরেও এর আরো কিছু ধারা লক্ষণীয়। এর মধ্যে ধর্মীয় মানবতাবাদ অন্যতম। উনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপ ও আমেরিকায় যে ইউনিটেরিয়ান আন্দোলন সংঘটিত হয়, তা মূলত মানবতাবাদী আন্দোলন। ১৫৫৩ সালে ফরাসী লেখক মিগুয়েল সার্ভিটাসকে একটি প্রচারপত্র ছাড়ার অপরাধে ইতালিতে পুড়িয়ে মারার মাধ্যমে এই আন্দোলনের সূচনা হয়। সার্ভিটাস ত্রিমূর্তিরূপে কল্পিত ঈশ্বরের যে ধারণা, তার বিরোধিতা করে ঈশ্বরকে এক ও অদ্বিতীয় বলে ঘোষণা করেছিলেন। পরবর্তীতে ইউনিটেরিয়ান আন্দোলন আমেরিকাতে বিস্তার লাভ করে। ১৯৩৩ সালে এই আন্দোলনের পক্ষে যে "মানবতাবাদী ইস্তাহার" প্রকাশিত হয়, ধর্মীয় ক্ষেত্রে ব্যক্তি স্বাধীনতার দাবি ছিল তার মূল কথা।[৭]

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ফরাসী দার্শনিক অগাস্ট কোঁতের (১৭৭৮-১৮৭৫) Positivismও মানবতাবাদী মতবাদ হিসেবে পাশ্চাত্যে জনপ্রিয়তা লাভ করে। বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত তাঁর এই মতবাদকে পরবর্তীতে তিনি ধর্মের রূপ দিয়েছিলেন এবং এটাকে তিনি মানবতার ধর্ম হিসেবে অভিহিত করেন। এছাড়াও এই মতবাদে তিনি মানবতাকে ঈশ্বরের স্থলাভিষিক্ত করে *Grand-Etre*কে সর্বোচ্চ সত্তা আখ্যায়িত করেন। তাঁর মতে, মানবতা হলো পূজনীয় মহান সত্তা, যা আপেক্ষিক, পরিবর্তনযোগ্য এবং পূর্ণতা অর্জনে সক্ষম।[৮] সবকিছু আবশ্যিকভাবে মানবতার সাথে যুক্ত হতে হবে, ভালোবাসা হলো কেন্দ্রীয় প্রেরণা, অপরের জন্য বাঁচা হলো পরম চাওয়া।[৯] ইংল্যান্ডের হার্বার্ট স্পেনসারও ছিলেন প্রত্যক্ষবাদী (Positivist)। তিনি ব্যক্তির অধিকার, স্বাধীনতা ও সুখের উপর গুরুত্বারোপ করেন এবং ব্যক্তির নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠায় সামাজিক নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার মত প্রকাশ করেন।

এ মতবাদগুলোর বাইরে উনবিংশ শতাব্দীতে ব্রিটিশ দার্শনিক জেরমি বেনথাম (১৭৪৮-১৮৩২), জেমস মিল (১৭৭৩-১৮৩৬) ও জন স্টুয়ার্ট মিল (১৮০৬-১৮৭৩) প্রবর্তিত উপযোগবাদ, এফ. সি. এস. শিলার, জ্যাঁ পল সার্ত্রে (১৯০৫-১৯৮০) অস্তিত্ববাদের যে রূপরেখা তুলে ধরেছিলেন সেই মতবাদগুলোকেও মানবতাবাদী দর্শন হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে। উপযোগবাদ অনুসারে, যে কাজ সর্বসাধারণের সুখ উৎপাদনে উপযোগী সে কাজ যথাযথ বা ভালো। আর যে কাজ এরূপ সুখ উৎপাদনে উপযোগী নয় তা অনুচিত বা মন্দ কাজ। সর্বাধিক লোকের সর্বাধিক সুখই নৈতিক আদর্শ হওয়া উচিত। প্রয়োগবাদ বিমূর্ত তত্ত্বচিন্তার পরিবর্তে বাস্তবিক কার্যকারিতাকেই সত্যতা নির্ণয়ের

---

[৭] বসুধা চক্রবর্ত্তী, *মানবতাবাদ* (কলিকাতা: দীপায়ন প্রকাশনী, ১৯৬১), ২২।

[৮] Stumpf, *Socrates to Sartre*, 347-348.

[৯] Thilly, *History of Philosophy*, 511.

মাপকাঠি বলে মনে করে। আর অস্তিত্ববাদ ব্যক্তিমানুষের মূর্ত অস্তিত্বকে প্রাধান্য দিয়ে মানুষের আত্মনিষ্ঠায় গঠিত জগৎ ভিন্ন অপর কোনো জগতের অস্তিত্ব অস্বীকার করে।

মানবতাবাদের প্রাচ্য ধারা

পাশ্চাত্যের ন্যায় প্রাচ্যেও প্রাচীনকাল থেকে মানবতাবাদী চিন্তাধারার বিকাশ ঘটে। তবে পাশ্চাত্যে বিকশিত মানবতাবাদী চিন্তাধারার সঙ্গে প্রাচ্য ধারার পার্থক্য রয়েছে। প্রাচ্য ধারার মানবতাবাদের অনেকাংশ জুড়ে রয়েছে অধ্যাত্মবাদ। তবে এর সঙ্গে মানবপ্রেমও গভীরভাবে মিশে রয়েছে। অন্যদিকে পাশ্চাত্য ধারার মানবতাবাদে মানুষকেই তার নিজের ভাগ্যনিয়ন্তা মনে করা হয়। সমকালীন প্রাচ্য চিন্তাবিদদের মতে, মানব আকাঙ্ক্ষার দুটো দিক লক্ষণীয়, পার্থিব ও আধ্যাত্মিক। পার্থিব কিছু করার আকাঙ্ক্ষা মানুষের ইচ্ছাশক্তি ও সামর্থ্যের উপর নির্ভরশীল। অন্যদিকে, আধ্যাত্মিক আকাঙ্ক্ষা সাধারণ, শারীরিক স্তরকে অতিক্রম করে মানুষকে উচ্চ থেকে উচ্চতর স্তরে পৌঁছানোর দিক নির্দেশনা দেয়। এই মতে মানবতাবাদকে পূর্ণরূপে স্বীকার করতে হলে উভয় প্রকার আকাঙ্খার পরিতৃপ্তির কথা বলা হয়।[১০]

প্রাচীন ভারতে ন্যায়, বৈশেষিক এবং সাংখ্য দর্শনে বস্তুবাদী উপাদান পরিলক্ষিত হলেও বিশুদ্ধ বস্তুবাদী চিন্তার নিদর্শন পাওয়া যায় চার্বাক দর্শনে। চার্বাক মতে, ইন্দ্রিয় সুখই জীবনের পরম কল্যাণ। ঈশ্বর, আত্মা, পরলোক কিংবা পুনর্জন্ম সকল কিছুর অস্তিত্বকে অস্বীকার করে চার্বাকগণ তৎকালীন নির্বিচারবাদী দর্শনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে সবিচার দর্শনের ভিত্তি রচনা করেন। প্রাচ্যে মানবতাবাদের বিকাশে বৌদ্ধ ও জৈনধর্মের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। জৈন ধর্মে ঈশ্বরের অস্তিত্বকে অস্বীকার করার পাশাপাশি মানুষকে সবার উপরে স্থান দেওয়া হয়েছে। আর বৌদ্ধ ধর্মে তো মানবকল্যাণে নিজের জীবন পর্যন্ত বিলিয়ে দেওয়ার কথা বলা হয়েছে।

তবে শঙ্করাচার্যের অদ্বৈতবেদান্তে ধর্মীয় প্রভুত্বের কারণে মানবতাবাদী চিন্তাধারায় কিছুটা স্থবিরতা লক্ষ করা যায়। অদ্বৈতবাদ অনুসারে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে কেবলমাত্র একটি অখণ্ড সত্তা বিরাজমান এবং তা হলো ব্রহ্ম। পরিবর্তনশীল জগৎ মিথ্যা, মায়া। দেখার ভ্রমেই জগৎকে বহুরূপ এবং বৈচিত্র্যময় মনে হয়। তারপরও মানবতার জয়যাত্রা থেমে থাকেনি। ব্রাহ্মণ্যবাদী আধিপত্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ লক্ষ করা যায় চৈতন্যদেবের প্রেম দর্শনে, রামকৃষ্ণের জীব সেবায় এবং রামমোহনের সার্বিক মানবকল্যাণমুখী চিন্তাধারায়। পরবর্তীতে স্বামী বিবেকানন্দ (১৮৬৩-১৯০২), অরবিন্দ (১৮৭৩-১৯৫০), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) প্রমুখ চিন্তাবিদগণ এই ধারায় মানবকেন্দ্রিক সংস্কার নিয়ে আসেন। তাঁদের সকলের দর্শনে সাম্প্রদায়িকতার গণ্ডি পেরিয়ে সার্বিক মানবিকতার অনুসন্ধানের প্রচেষ্টা লক্ষণীয়।

দূর প্রাচ্যে মানবতাবাদী চিন্তার প্রয়াস লক্ষ করা যায় কনফুসিয়াসের জীবন দর্শনে। তিনি সকল প্রকার অতিপ্রাকৃতিক শক্তির অস্তিত্বে সন্দেহ প্রকাশ করেন এবং জীবনকে ভালবাসার উপর গুরুত্বারোপ করেন। কনফুসিয়াসের দার্শনিক শিক্ষার মূল ভিত্তি ছিল নীতিজ্ঞান। তাঁর নৈতিক শিক্ষার উপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে কনফুসীয় ধর্ম, যার মূল কথা হলো মানবতা তথা মানুষের কল্যাণ। এছাড়াও চীনে মানবতাবাদী চিন্তার প্রসারে হুয়াংদি, ইয়াও, সুং প্রমুখ চিন্তাবিদের অবদান উল্লেখযোগ্য।

অন্যান্য ধর্মের পাশাপাশি প্রাচ্য মানবতাবাদের বিকাশে ইসলাম ধর্মের ভূমিকাও তাৎপর্যপূর্ণ। শান্তি ও মানবতার ধর্ম ইসলাম এক বিশ্বজনীন জীবন বিধান, যেখানে জোর জবরদস্তির সুযোগ নেই। পবিত্র কুরআনে আছে: "দ্বীনের ব্যাপারে কোন জবরদস্তি বা বাধ্যবাধকতা নেই।"[১১] সহিংসতা, চরমপন্থা

---

[১০] Basant Kumar Lal, *Contemporary Indian Philosophy*, rep. (Delhi: Motilal Banarsidass, 1992), xix-xxi.

[১১] আল কুরআন, ২:২৫৬।

পরিহার করে সাম্য, স্বাধীনতা ও সৌভ্রাতৃত্বের ভিত্তিতে পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা, নৈতিক মূল্যবোধের সঠিক চর্চার মাধ্যমে মানব জীবনের মূর্ত-বিমূর্ত সকল সমস্যার গ্রহণযোগ্য সমাধানের ভিত্তিতে মানবতার পরিপূর্ণ বিকাশই ইসলামি জীবন দর্শনের মূল লক্ষ্য। মানবকল্যাণমুখী ও যুগোপযোগী এই সকল আদর্শের কারণে ইসলাম এশিয়া ও আফ্রিকার অন্যতম প্রধান ধর্মে পরিণত হয় এবং আরবসহ বিশ্বের অসংখ্য দেশে বিস্তৃতি লাভ করে। এছাড়াও শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার বিভিন্ন বাণীতে মানুষকে নিষ্কাম কর্ম করার জন্য যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তা মূলত মানবতারই বাণী। "কর্মেই তোমার অধিকার, ফলে নয়; কর্মফলের আকাঙ্ক্ষায় কর্ম করো না, (তা বলে) অকর্মে (আলস্যে) যেন তোমার মন না যায়।" (অধ্যায়-২, শ্লোক-৪৭) উল্লেখ্য যে, 'নিষ্কাম কর্ম' কেবল একটি ধর্মীয় ধারণা নয়, একটি জীবনঘনিষ্ঠ ধারণা, যার নৈতিক গুরুত্ব সার্বজনীন।[১২] এর মধ্যে কর্মের ব্যবহারিক দিক ও আধ্যাত্মিকতার পরিপূর্ণ সমন্বয় লক্ষ করা যায়।

প্রাচ্য ধারার স্বাতন্ত্র্য

বাংলায় মানবতাবাদী চিন্তাধারা বিকাশের ক্ষেত্রে বাঙালি মনীষীদের প্রাচীন ভারতীয় ষড় দর্শনচর্চা থেকে শুরু করে সহজিয়া দর্শন, সুফিবাদ, বৈষ্ণব আন্দোলন, লালনের বাউল দর্শন, ইয়ং বেঙ্গল মুভমেন্ট, মুসলিম সাহিত্যসমাজ, রামমোহনের ধর্ম-সংস্কার আন্দোলন ইত্যাদির সঙ্গে বিবেকানন্দ, অরবিন্দ, অক্ষয়কুমার, রবীন্দ্রনাথ, বিদ্যাসাগর, মানবেন্দ্রনাথ, গোবিন্দচন্দ্র দেব প্রমুখ দার্শনিক-চিন্তাবিদদেরও অবদান রয়েছে। উল্লেখ্য যে, জাতি হিসাবে বাঙালি মিশ্র হবার কারণে নানাবিধ সংস্কৃতি ও চিন্তাধারা বাঙালি মননকে প্রভাবিত ও সমৃদ্ধ করেছে। অনেকে মনে করেন বাঙালি মানসে তাই বিশুদ্ধ দর্শন চিন্তা পরিলক্ষিত হয় না। তবে, আদিম অনার্যদের সাংখ্য, যোগ ও তন্ত্রের চর্চায় অবিচল নিষ্ঠা ও আনুগত্যের মধ্যে তার কিছুটা স্বকীয়তা দেখা যায়।[১৩]

খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ-সপ্তম শতাব্দীতে প্রাচীন বাংলায় বৈদিক ধর্ম, দেবতাবাদ ও নিজস্ব সংস্কৃতি নিয়ে আর্যদের আবির্ভাব ঘটে।[১৪] তাদের বর্ণবাদ, জাতিভেদ ও অসাম্যের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে জৈন ও বৌদ্ধ দর্শন বিকাশ লাভ করে। জৈন দর্শন পরিত্যক্ত হলে ও গৌতম বুদ্ধের প্রচারিত অহিংসা ও মৈত্রীর বাণী বাঙালি মানবতাবাদী চিন্তনে বৈপ্লবিক পরিবর্তন নিয়ে আসে । বৌদ্ধ ধর্ম পরবর্তীতে বাঙালির সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যের প্রভাবে মহাযান, কালচক্রযান ও সহজযানে বিবর্তিত হয়েছে। তন্মধ্যে সহজিয়া দর্শন এদেশে ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে। "সহজাত মনুষ্য স্বভাবকে অতিক্রম করার চেষ্টা না করে স্বভাবের অনুকূলে পথ অবলম্বন করে আত্মোপলব্ধি করাই সহজ পথ"।[১৫] বৌদ্ধ দর্শনের এই মানবপ্রীতিবাদ বিজিত মুসলমানদের মাধ্যমে এদেশে সাম্য ও বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধে বিশ্বাসী ইসলামি তত্ত্বধারার অনুপ্রবেশের ক্ষেত্রকে প্রসারিত করে। সুফীধারার ইসলামের প্রভাবেই

---

[১২] স্বামী অমৃতত্বানন্দ, অনুবাদক ও ব্যাখ্যাতা, *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা* (২য় সং.; দিনাজপুর; শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম ও রামকৃষ্ণ মিশন, ২০০৮), ৫৫।

[১৩] আহমদ শরীফ, "বাঙালির মনন বৈশিষ্ট্য," *বাংলাদেশে দর্শন: ঐতিহ্য ও প্রকৃতি অনুসন্ধান*, সম্পাদিত, শরীফ হারুন (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৯৪), ২১।

[১৪] দেবপ্রিয় বড়ুয়া, "বাঙালির দর্শন চিন্তায় বৌদ্ধ প্রভাব," ৮৮।

[১৫] এন এইচ এম আবু বকর, *বাংলাদেশের সমকালীন দর্শনচর্চার ইতিহাস* (ঢাকা: নওরোজ কিতাবিস্তান, ২০০৫), তিন-চার।

বাঙালি সমাজ ব্রাহ্মণ্যবাদী সংস্কারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সোচ্চার হয়। ফলস্বরূপ চৈতন্যদেবের (১৪৮৬-১৫৩৪) হাত ধরে বিকশিত হয় 'প্রেম দর্শন' বা 'বৈষ্ণব বাদ'। চৈতন্যদেবের মূল বক্তব্য ছিল: 'আচণ্ডালে প্রেম কর দান'।[১৬] এছাড়াও সপ্তদশ শতাব্দীতে সাধক লালন শাহ (১৭৭২-১৮৯০)এর বাউল দর্শনের মূল উপজীব্য ছিল মানবপ্রেমের মাধ্যমে পরম পুরুষের উপলব্ধি। মানবিক তত্ত্বের অনুসন্ধানেই নিবেদিত হয়েছে মানবতাবাদী লালনের সমগ্র দর্শন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষদিকে উপযোগবাদ, প্রত্যক্ষবাদ, দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ প্রভৃতি চিন্তাধারার সংস্পর্শে বাঙালি বুদ্ধিজীবী ও চিন্তাবিদগণের মধ্যে যুক্তি ও বিচারধর্মী মানবতাবাদী চিন্তার প্রয়াস লক্ষ করা যায়। সেই প্রয়াসকেই বাঙালির রেনেসাঁ বলা হয়ে থাকে।[১৭] যে সকল বাঙালি বুদ্ধিজীবী ও চিন্তাবিদগণ উপযোগবাদ দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন তাঁরা হলেন – রাজা রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩), দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭-১৯০৫), অক্ষয়কুমার দত্ত (১৮২১-১৮৮৬), ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯০), কেশব চন্দ্র সেন (১৮৩৩-১৮৮৫), সীতানাথ তত্ত্বভূষণ প্রমুখ। সহিষ্ণুতা, সাহচর্য ও সৌহার্দ্যের বন্ধনে সকল ধর্ম মতাবলম্বীদের আবদ্ধ করে বিশ্বমানবের সমন্বয় ও কল্যাণ কামনা করাই রামমোহনের মানবতাবাদী দর্শনের উদ্দেশ্য ছিল। অক্ষয়কুমার দত্ত প্রার্থনার বিরোধিতা করে প্রকৃতির নিয়ম মেনে কাজ করাকেই ধর্ম বলে স্বীকৃতি দেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সকল প্রকার বিমূর্ততা পরিহার করে তাত্ত্বিক জ্ঞানকে বাস্তবতার নিরিখে মানবকল্যাণে প্রয়োগের উপর জোর দেন।

বিংশ শতাব্দীর শুরুতে কলকাতায় লুইস ভিভিয়ান ডিরোজিও (১৮০৯-১৮৩১) ও 'ইয়ং বেঙ্গল' নামে একদল তরুণের মধ্যে উপযোগবাদের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। এর ধারাবাহিক প্রভাব মুসলিম চিন্তাবিদদের মধ্যে নবাব আবদুল লতিফ (১৮২৮-১৮৯৩), সৈয়দ আহমদ খান, দেলোয়ার হোসেন আহমদ মির্জা (১৮৪০-১৯১৩) এবং সৈয়দ আমির আলীর মধ্যেও লক্ষ করা যায়। পরবর্তীতে ''মুসলিম সাহিত্য সমাজ''-এর বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন স্বাধীন বিচারবুদ্ধি বিকাশের মাধ্যমে মানবকল্যাণের পথকেই ত্বরান্বিত করে। কাজী আবদুল ওদুদ (১৮৯৪-১৯৭০), আবুল হোসেন (১৮৯৬-১৯৩৮), কাজী মোতাহের হোসেন (১৮৯৭-১৯৮১) প্রমুখ এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীতে অগাস্ট কোঁতের ধর্মীয় মানবতাবাদের প্রভাবে যোগেশচন্দ্র ঘোষ, দ্বারকানাথ মিত্র, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য এবং রামকমল ভট্টাচার্যের উদ্যোগে ''Positivist Society'' গঠিত হয়।

বিংশ শতাব্দীতে মানবেন্দ্রনাথ তাঁর মানবকেন্দ্রিক বস্তুবাদী দর্শনে মানুষ ও তার ব্যক্তিসত্তাকে বিশেষভাবে মূল্যায়ন করেন। মার্কসবাদ দ্বারা সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত হয়েও সমষ্টির কাছে ব্যক্তি মানুষের স্বাতন্ত্র্য ক্ষুণ্ন হওয়ায় পরবর্তীতে তিনি মার্কসবাদের উপর আস্থা হারিয়ে ফেলেন এবং নব্য মানবতাবাদ (Radical Humanism) শীর্ষক এক নতুন দার্শনিক ধারার কথা বলেন। এই দর্শনে মানবেন্দ্রনাথ বিলীন ব্যক্তি সত্তাকে উদ্ধার করে স্বাধীন, সার্বভৌম মানুষে পরিণত করতে চেয়েছেন। এই লক্ষ্যে তিনি মানব জীবনকে সকল প্রকার শৃঙ্খলা থেকে মুক্ত করে অতি প্রাকৃতিক শক্তিকে নির্ভর করে নয়, যুক্তি, নীতি ও মুক্তি এই তিনটি মূলনীতির ভিত্তিতে কার্যকরী করার কথা বলেছেন।

উপরোক্ত দার্শনিক ধারার বাইরে স্বামী বিবেকানন্দের (১৮৬২-১৯০২) ধর্ম সংস্কার চিন্তা ও রচনায় মানুষকে মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াস লক্ষ করা যায়। গুরু রামকৃষ্ণের "শিব জ্ঞানে জীব

---

[১৬] তদেব, পাঁচ।

[১৭] মফিজ উদ্দীন আহমদ, "বাঙালির দার্শনিক ঐতিহ্য ও সমকাল," *বাংলাদেশে দর্শন: ঐতিহ্য ও প্রকৃতি অনুসন্ধান*, ৩৪।

সেবা" আদর্শকে হৃদয়ে ধারণ করে তিনি মানুষকে অকৃত্রিম ভালোবেসেছিলেন, মানুষের মাঝেই ব্রহ্মকে খুঁজে পেয়েছিলেন। ধর্ম ও বিজ্ঞানকে সমন্বিত করে বিবেকানন্দ স্বপ্ন দেখেছিলেন এক নতুন পৃথিবীর, যে পৃথিবীর প্রতিটি মানুষ নিজের সুপ্ত দেবত্ববোধে জাগ্রত হয়ে মানবমুক্তির পথকে ত্বরান্বিত করবে। তাইতো তিনি আহ্বান করেন: "বিবাদ নয়, সহায়তা; বিনাশ নয়, পরস্পরের ভাবগ্রহণ; মতবিরোধ নয়, সমন্বয় ও শান্তি"।[১৮]

বিবেকানন্দ নির্দেশিত মানবকল্যাণের এই ধারা আরো সুদৃঢ় হয় রবীন্দ্রনাথের দর্শনে (১৮৬১-১৯৪১)। তিনি বিশ্বাস করতেন, প্রকৃত ধর্ম হলো মানব ধর্ম, মানুষের মধ্যে যে সত্য, যে মহৎ তাঁরই ধর্ম।[১৯] তাই মানুষকে অবহেলা করে যারা শুধুমাত্র নিজ অহংকে আঁকড়ে ধরে রাখে তারা মানব ধর্ম থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ে। কেননা, সসীম ব্যক্তি মানুষই হলো অসীম পরম সত্তার প্রতিবিম্ব। তিনি বলেন, "জীবনদেবতার সঙ্গে জীবনকে পৃথক করে দেখলেই দুঃখ, মিলিয়ে দেখলেই মুক্তি।"[২০] দুঃখ আসুক কিংবা মৃত্যু, মানুষ যেন তার আপন মহিমা থেকে বঞ্চিত না হয়, এটাই ছিল তাঁর মূল চাওয়া।

রবীন্দ্রনাথের মানবধর্মকে পরিপূর্ণ করার প্রয়াস লক্ষ করা যায় অরবিন্দের (১৮৭২-১৯৫০) অতিমানসতত্ত্বে। তিনি এমন একটি বিশ্বতন্ত্রের স্বপ্ন দেখেছিলেন যেখানে অতিমানস স্তরে উত্তীর্ণ জীবাত্মার নেতৃত্বে স্বাধীনতা, সাম্য, ন্যায়বিচার ও ভ্রাতৃত্ববোধ সমন্বিত শোষণমুক্ত সাম্যবাদী সমাজ গঠিত হবে। নিজের স্বকীয় সত্তাকে পূর্ণ বিকশিত করে মানসিক, আধ্যাত্মিক ও অধিমানসের স্তর অতিক্রমের মাধ্যমে সাধারণ মানুষই পৌঁছাতে পারে অতিমানস স্তরে। এভাবে ব্যক্তিসত্তার পরিবর্তনের মাধ্যমে সমাজ, প্রতিষ্ঠান, কার্যাবলীও পরিবর্তিত হবে এবং মাটির পৃথিবীতেই দিব্যজীবন প্রতিষ্ঠিত হবে বলে বিশ্বাস করতেন অরবিন্দ।[২১]

একইভাবে কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬) তাঁর রচনায় মানবতাকে সবার উপরে স্থান দিয়েছেন। তিনি বিশ্বাস করতেন, সকল মানুষের সত্তা এক ও অভিন্ন।[২২] তাঁর অসংখ্য কবিতায় সকল প্রকার সামাজিক অন্যায়, অবিচারের বিরুদ্ধে মানুষের বিদ্রোহী সত্তার পূর্ণ উদ্বোধনে মানবতার জয় ঘোষিত হয়েছে। এজন্য তাঁকে বিদ্রোহী কবিও বলা হয়ে থাকে। সকল প্রকার স্বার্থপরতা ভুলে স্বাধীনতা, সাম্য ও মানবীয় ঐক্যের ভিত্তিতে মানুষে মানুষে বিশ্ব ভ্রাতৃত্ববোধ প্রতিষ্ঠিত হবে, এই ছিল তাঁর স্বপ্ন। মানুষের প্রতি কবির উদাত্ত আহ্বান –

> এস ভাই হিন্দু! এস মুসলমান! এস বৌদ্ধ! এস ক্রিশ্চিয়ান! আজ আমরা সব গণ্ডী কাটাইয়া, সব সংকীর্ণতা, সব মিথ্যা, সব স্বার্থ চিরতরে পরিহার করিয়া প্রাণ ভরিয়া ভাইকে ভাই বলিয়া ডাকি।[২৩]

---

[১৮] ১৮৯৩ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর আমেরিকার শিকাগো ধর্ম-মহাসভায় সপ্তদশ (শেষ) অধিবেশনের বক্তৃতায় বিবেকানন্দ এই আহ্বান জানিয়েছিলেন। *স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা*, ১ম খণ্ড (৪র্থ সং.; কলকাতা: উদ্বোধন কার্যলয়, ২০১১), ২৮।

[১৯] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *মানুষের ধর্ম* (কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ১৯৭২), ৫৫।

[২০] তদেব, ৯০।

[২১] এন এইচ এম আবু বকর, "অরবিন্দের চিন্তাধারায় সমকালীন প্রসঙ্গ," *Prajna* 8 (June 2009): 84.

[২২] "জাতের চেয়ে মানুষ সত্য/ অধিক সত্য প্রাণের টান,/ প্রাণ-ঘরে সব এক সমান।" নজরুল ইসলাম, *বিষের বাঁশী* (কলকাতা: ডি.এম. লাইব্রেরি, ১৯৬৩), ৫৮।

[২৩] কাজী নজরুল ইসলাম, *নজরুল রচনাবলী*, ১ম খণ্ড (ঢাকা: কেন্দ্রীয় বাঙলা-উন্নয়ন বোর্ড, ১৯৬৬), ১২।

রবীন্দ্র, নজরুলের পর বিংশ শতাব্দীতে মানবতাবাদী জীবন দর্শনের চর্চার মাধ্যমে যে সকল চিন্তাবিদ মানব প্রগতির দিক নির্দেশনা দিয়েছেন তাঁদের মধ্যে গোবিন্দ চন্দ্র দেব (১৯০৭-১৯৭১) অন্যতম। তিনি অনুমান করেন যে, ভবিষ্যতের ইতিহাস কিছু বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত মানুষের ইতিহাস হবে না, বরং তা হবে পূর্ণ মর্যাদাসম্পন্ন সাধারণ মানুষের ইতিহাস। এই সাধারণ মানুষই আগামী বিশ্ব সমাজের একক এবং তার পূর্ণ বিকাশই হলো পরিপূর্ণ সামাজিক বিকাশের একমাত্র নির্ভরযোগ্য মানদণ্ড। আর সাধারণ মানুষের প্রয়োজন শুধুমাত্র বস্তুগত নয়, আধ্যাত্মিকও। কেননা, মানুষ হলো দেহ ও মন সমন্বিত একটি রহস্যময় সংগঠন। ফলে প্রচলিত বস্তুবাদ ও ভাববাদের মধ্যে যে বিরোধ, বাস্তব জীবনের এর তেমন কোন প্রতিফলন নেই।[২৪] তাই গোবিন্দচন্দ্র দেব জড়বাদ ও অধ্যাত্মবাদের সমন্বয়ের মাধ্যমে মানুষের জন্য একটি সুষ্ঠু জীবন দর্শন গঠনের অপরিহার্যতার কথা বলেন। আর এই দর্শনকে তিনি নাম দিয়েছেন সমন্বয়ী ভাববাদ (Synthetic Idealism)। তাঁর মতে,

> জড়বাদের সঙ্গে গভীর ধর্ম বিশ্বাস ও নির্মল নীতিবোধের সমঝোতা মানুষের বৃহত্তর জীবন-যাত্রার তাগিদেই গড়ে উঠবে। সেই সমন্বয়-দর্শনই হবে আগামী দিনের মানুষের জীবন-দর্শন, তত্ত্ব নির্ণয়ে তার এক সার্থক পদক্ষেপ।[২৫]

স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফের জীবনধর্মী দর্শন,[২৬] আবদুল মতীনের ভাবাবেগমুক্ত যুক্তি ও বিশ্লেষণধর্মী দর্শন,[২৭] এবং সাইদুর রহমানের 'কল্যাণ দর্শন,'[২৮] উল্লিখিত মানবতাবাদী চিন্তার পথনির্দেশক।

উপসংহার

উপরোক্ত আলোচনা থেকে যেটা স্পষ্টভাবে বোঝা যায় তা হলো, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মানবতাবাদী দার্শনিক ধারায় কিছু কিছু ক্ষেত্রে পার্থক্য লক্ষণীয়। মানবতাবাদের মূল সূর প্রায় একরকম হলেও পাশ্চাত্য ধারার মানবতাবাদে উপযোগবাদী, প্রত্যক্ষবাদী, বস্তুবাদী ও প্রকৃতিবাদী চিন্তাভাবনার অবস্থানের কারণে তাতে আধ্যাত্মিক বা অতি-প্রাকৃতিক শক্তির উপর নির্ভরশীলতা কম। ব্যক্তি-বিশেষের জীবন, দৃষ্টিভঙ্গি, সফলতা, সামাজিক মানবিক স্বার্থ ইত্যাদির কারণে ইহজাগতিকতাই এতে

---

[২৪] Hasan Azizul Huq, ed., *Works of Govinda Chandra Dev*, vol. 1 (Dhaka: Bangla Academy, 1980), 483.

[২৫] গোবিন্দ্র চন্দ্র দেব, *তত্ত্ববিদ্যা-সার* (ঢাকা: কেন্দ্রীয় বাঙলা- উন্নয়ন-বোর্ড, ১৯৬৬), ১৯১।

[২৬] "... দর্শনকে জীবন ধর্মী করতে হবে, জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন বা জীবনকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে কোন আকাশ কুসুমের পানে দর্শন ধাবিত হতে পারে না।" দেওয়ান মোঃ আজরফ, "বাংলাদেশ দর্শন," *বাংলাদেশ দর্শন সমিতির ষষ্ঠ সাধারণ সম্মেলনের কার্যবিবরণী* (নভেম্বর ১৯৮৬): ১৯।

[২৭] "যুক্তি-নিয়ন্ত্রিত বা প্রজ্ঞাদীপ্ত স্বার্থবুদ্ধি আমাদেরকে যে পথে ডাক দেয় সে পথ অন্যায়, হিংসা বা নির্দয়তার নয় – সে পথ ন্যায়ের তথা প্রেম আর মানবতার।" আবদুল মতীন, *যুক্তির আলোকে* (ঢাকা: বুক সোসাইটি, ১৩৮২), ১০১-১০২।

[২৮] "জীবন সংগ্রামের লক্ষ্য হবে কল্যাণময় নবীন পরিবেশের সৃষ্টি। এ পরিবেশে ব্যক্তির চেয়ে সমষ্টির কল্যাণই পাবে সমধিক গুরুত্ব, আর তা পালন করবে সমবায় ও সমবেত জীবনযাত্রার পদ্ধতি।" সাইদুর রহমান, "কল্যাণ দর্শন," *বাংলাদেশে দর্শন: ঐতিহ্য ও প্রকৃতি অনুসন্ধান*, ৩৭২।

অধিক প্রাধান্য পায়। বস্তুত বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি, যুক্তি-বিশ্লেষণধর্মীতাই পাশ্চাত্য মানবতার সারবস্তু। পক্ষান্তরে, প্রাচ্য মানবতায় ব্যক্তি স্বার্থের ঊর্ধ্বে মানুষের অন্তর্জগৎ বিশেষ করে নিজের স্বতন্ত্র সত্য সত্তাকে উপলব্ধির মাধ্যমে ইহজাগতিকতার সঙ্গে পরজাগতিকতাকে অধিক প্রাধান্য দেওয়া হয়। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মানবতাবাদী দর্শন বাঙালি মানসকে সমৃদ্ধ করলেও সামাজিক ভাবাদর্শকে তা তেমন প্রভাবিত করতে পারেনি। মানবতাবাদ এদেশে বাঙালির নিজস্ব বিশ্বাস, সংস্কার ও সংস্কৃতির আদলে স্বতন্ত্র রূপ লাভ করেছে। বাঙালির দর্শন চিন্তায় যে ধারাটিকে মানবতাবাদী হিসেবে উপরোক্ত আলোচনায় চিহ্নিত করা হয়েছে, তা প্রাচ্য ধারার মানবতাবাদী চিন্তার সঙ্গে সম্পর্কিত। তবে পাশ্চাত্য ধারার মানবতাবাদের অনেক প্রভাবও এতে লক্ষণীয়। সুনির্দিষ্টভাবে এ প্রভাবগুলো কী এবং বাঙালি মানস গঠনে এর প্রতিফলনের বিষয়টি পৃথক আলোচনার দাবি রাখে।

ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ জার্নাল
সংখ্যা ২৩ (১৪২২ বঙ্গাব্দ)

চলচ্চিত্র 'ঘেটুপুত্র কমলা': বিদ্যমান সমকামিতার প্রতীকী রূপায়ণ

এ বি এম সাইফুল ইসলাম,* মোঃ মোজাম্মেল হোসেন বকুল**

Abstract: World's influential film production companies which located in Hollywood of USA, second infulential film industry named Bollywood in India and other country's film industries have chosen some stories for their films which were linked with homosexuality over the period. But representation of homosexuality in Bangladeshi films is rare, though presence of homosexuality in Bangladeshi society is reported. Humayun Ahmed, a late noted writer and film maker of Bangladesh, took the subject of homosexuality in his film named 'Ghetuputra Kamala' (Ghetu Son Kamala). This paper examined how this film represents the homosexuality.

ভূমিকা

লোকজ সংগীতে থাকে গণমানুষের সারল্যমাখা অভিব্যক্তি, যা আবার একই সঙ্গে হয়ে থাকে অত্যন্ত গভীর ও হৃদয়গ্রাহী। লোকসংগীতে থাকে সরল-স্বাভাবিক জীবনের মনোরম আলেখ্য, আর সুর সোহাগের অনুপম মাধুর্য। বলা হয়ে থাকে, লোকসংগীত সকলের। সবাই এর শ্রোতা, আর প্রায় সকলেই এর গায়ক। সাধারণ সংগীত আর তত্ত্ব সংগীত – লোকসংগীত প্রধানত এই দুই ভাগে বিভক্ত।[১] সাধারণ সংগীতের বেশিরভাগই আঞ্চলিক বলে এর শাখা-প্রশাখার সংখ্যা প্রচুর। আর তত্ত্ব সংগীতের শাখা তুলনামূলকভাবে কম। আবার সাধারণ সংগীতের মধ্যে প্রেম সংগীতই আদিম। এই প্রেম সংগীতেরই একটি শাখার নাম 'ঘাটু গান'।

বর্তমান গবেষণা প্রবন্ধে 'ঘেটুপুত্র কমলা' নামে যে বাংলাদেশি চলচ্চিত্রটিকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে তার অন্যতম মূল উপজীব্য এই ঘাটু গান। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন গবেষকের লেখায় এই গানের নানারকম নাম পাওয়া গেছে। যেমন, গাঁটু, গাঁড়ু, গাড়ু, ঘাঁটু, ঘাটু, ঘেটু, ঘাটু গান প্রভৃতি। এই গান আবার নৃত্য সংগীতেরও অন্তর্গত।[২] ঘাটু গান মূলত বালিকাবেশী বালকের নৃত্যসহ গান। এক সময়ে বাংলাদেশের হাওরাঞ্চলে প্রচলিত থাকা এই গান আসলে এক ধরনের লোকাচার, যেখানে সমাজের

---

* সহকারী অধ্যাপক, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

** সহকারী অধ্যাপক, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

[১] মোহাম্মদ সিরাজুদ্দীন কাশিমপুরী (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের লোকসংগীত পরিচিতি* (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৭৩), ৪-৫।

[২] তদেব, ১৬-১৭।

বিত্তবান পুরুষেরা বালিকাবেশী বালককে অর্থের বিনিময়ে নিজের বাড়িতে রেখে ওই বালক ও তার দলের পরিবেশিত সঙ্গীত উপভোগ করতেন এবং ওই বালককে যৌনসঙ্গী হিসেবে ব্যবহার করতেন।[৩] বাংলাদেশের হাওরাঞ্চলের তৎকালীন সমাজে প্রকাশ্যে এই প্রথা প্রচলিত ছিল, যা আসলে ছিল এক ধরনের সমকামিতা।

শক্তিশালী শিল্পমাধ্যম হিসেবে চলচ্চিত্রে সমাজের এমন সব বিষয় উঠে আসে যার চর্চা সাধারণত প্রকাশ্যে তেমন একটা দেখা যায় না। কিন্তু চলচ্চিত্রে কাহিনি-বিন্যাসের মাধ্যমে বাস্তব সমাজের তুলনামূলক অনালোচিত সেসব বিষয় সুচারুরূপে তুলে আনা সম্ভব, যা দর্শক-শ্রোতাকে সেই বিষয়টি নিয়ে ভাবনার খোরাক যোগাতে পারে। ইমপ্রেস টেলিফিল্মের প্রযোজনায় কথাসাহিত্যিক হুমায়ূন আহমেদের (১৯৪৮-২০১২) কাহিনি, চিত্রনাট্য, পরিকল্পনা ও পরিচালনায় নির্মিত চলচ্চিত্র 'ঘেটুপুত্র কমলা'-য় (২০১২) এই ঘাটু গানকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশের তৎকালীন সমাজে বিদ্যমান অভিজাত পুরুষদের সমকামিতাকে তুলে ধরা হয়েছে। এ চলচ্চিত্রটির কেন্দ্রীয় প্রসঙ্গ হলো অভিজাত পরিবারের একজন পুরুষের যৌনসঙ্গী হিসেবে বালকপ্রীতি অর্থাৎ সমকামিতা। বর্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য এই চলচ্চিত্রটি বাংলাদেশের হাওরাঞ্চলের সমাজের এমন একটি বাস্তবতাকে তুলে ধরেছে যা ঠিক সেই আঙ্গিকে বর্তমানে বিদ্যমান নয়। চলচ্চিত্রে পরিবেশিত ভাষ্য অনুযায়ী, ঘাটু গানের আড়ালে সমকামিতার এই প্রথা এখন বাংলাদেশ থেকে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে, অর্থাৎ বর্তমানে তা ইতিহাসের পাতায় ঠাঁই নিয়েছে। তবু চলচ্চিত্রে এর উপস্থাপন এবং চলচ্চিত্রটির পাঠ আমাদের বর্তমান সমাজ ও সংস্কৃতিতে প্রকাশ্যে বা অপ্রকাশ্যে প্রচলিত সমকামিতার অস্তিত্ব সম্পর্কে ভাবতে বাধ্য করে। আমাদের বর্তমান সমাজ-সংস্কৃতিতে বিদ্যমান সমকামিতার স্বরূপ বুঝতে তাই বর্তমানে ইতিহাসে রূপান্তরিত হওয়া সমকামিতার বিষয়কে উপজীব্য করে নির্মিত এ চলচ্চিত্রের টেক্সট বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

এই গবেষণা-প্রবন্ধের মূল আলোচনায় প্রবেশের আগে সমকামিতার ইতিহাস, ঘাটু গানের বিবর্তন ও চলচ্চিত্রে সমকামিতা সম্পর্কে আলোচনা করে নেওয়া হয়েছে। বর্তমান প্রবন্ধে 'ঘেটুপুত্র কমলা' চলচ্চিত্রটির ন্যারেটিভ বিশ্লেষণ করে বাংলাদেশের তৎকালীন সমাজ ও সংস্কৃতির পাশাপাশি বর্তমানে বিদ্যমান সমকামিতার কী ইঙ্গিত চলচ্চিত্রে দেওয়া হয়েছে তা অনুসন্ধান করার চেষ্টা করা হয়েছে।

চলচ্চিত্রে সমকামিতা

মানবসমাজে সমকামী নারী-পুরুষের অস্তিত্ব এবং সমাজে অনেক ক্ষেত্রেই তাঁদের প্রভাব থাকলেও চলচ্চিত্রের চরিত্র হিসেবে তাঁদের উপস্থিতি কম। তুলনামূলক রক্ষণশীল সমাজকাঠামোর জন্য বাংলাদেশ তথা ভারতীয় উপমহাদেশে সমকামীদের মধ্যেকার প্রেম-যৌনতার মতো বিষয়গুলো নিয়ে চলচ্চিত্র কম নির্মিত হওয়াই হয়তো স্বাভাবিক। কিন্তু যৌনতার দিক দিয়ে তুলনামূলক উদার পাশ্চাত্য দেশগুলোতে বিশেষ করে বিশ্ব চলচ্চিত্রের পীঠস্থান হলিউডের চলচ্চিত্রেও এ ধরণের চরিত্রের উপস্থিতি কম। যদিও মার্কিন চলচ্চিত্র তারকাদের কাউকে কাউকে সমকামীদের অধিকারের দাবিতে সোচ্চার থাকতে দেখা যায়। একটি গবেষণায় দেখা গেছে, হলিউডে ২০১২ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত ১০১টি বড় বাজেটের ছবির মধ্যে মাত্র ১৪টিতে পুরুষ বা নারী সমকামী এবং উভকামীদের চরিত্রের অস্তিত্ব ছিল। এদের মধ্যে ছয়টি ছবিতে সমকামী চরিত্র গুরুত্বসহ উপস্থাপিত হয়েছে। সামগ্রিকভাবে এসব

---

[৩] আশুতোষ ভট্টাচার্য, *বঙ্গীয় লোক-সঙ্গীত রত্নাকর: বাংলা লোকসঙ্গীতের কোষগ্রন্থ*, প্রথম খণ্ড (কলকাতা: এ মুখার্জী অ্যান্ড কোম্পানী, ১৯৭৭), ৪৬৪।

চরিত্রগুলোর মধ্যে ৫৬ শতাংশ ছিল পুরুষ সমকামী, ৩৩ শতাংশ নারী সমকামী এবং ১১ শতাংশ উভকামী।[৪]

সমকামিতা বিষয়ে মুসলিম বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ রাষ্ট্র মিসরের প্রথম ছবি 'ফ্যামিলি সিক্রেটস' নিয়ে রক্ষণশীল মুসলিম দেশটিতে সমালোচনার ঝড় ওঠে। সেন্সর বোর্ডের অনুমতি না পাওয়ায় মুক্তির মুখ দেখেনি পরিচালক হ্যানি ফৌজি'র এ ছবিটি। যদিও ফৌজি সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন, পুরো চলচ্চিত্রে কোনো যৌন দৃশ্য দেখানো হয়নি। আর কাহিনি লেখক মোহাম্মদ আব্দেল কাদেরের মতে, একটি সত্য ঘটনা থেকে অনুপ্রাণীত হয়ে তিনি এ ছবির কাহিনি লিখেছেন।[৫]

ভারতীয় সমাজে এখনো সমকামিতা একটি নিষিদ্ধ বিষয়। যদিও সাম্প্রতিক বছরগুলোতে সমকামিতার প্রতি ভারতীয়দের মনোভাবে কিছু পরিবর্তন লক্ষ করা যাচ্ছে। বিশেষত ভারতের সংবাদমাধ্যম এবং বলিউডেও সমকামিতার প্রদর্শন ও আলোচনার পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ভারতে সমকামী ছবি তৈরির পথপ্রদর্শক নারী চলচ্চিত্রকার দীপা মেহতা। ১৯৯৭ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত *ফায়ার* চলচ্চিত্রে দুই নারীর (শাবানা আজমী ও নন্দিতা দাস অভিনীত, যাঁরা সম্পর্কে একে অন্যের জা) শারীরিক সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ার কাহিনি উপস্থাপন করা হয়। এ ছবিটি নিয়ে ভারতের দর্শকসমাজে বলতে গেলে আগুন জ্বলেছিল। রক্ষণশীল সমাজের কাছে তুমুল সমালোচনার শিকার হয়েছিল চলচ্চিত্রটি। ১৯৯৬ সালে নির্মিত *বমগে* সমকামিতাকে উপজীব্য করে নির্মিত ভারতের প্রথম ডকুফিল্ম। কবি রাজ রাওয়ের লেখার ওপর মুম্বাইয়ের গে সংস্কৃতি নিয়ে ছবিটি নির্মাণ করেন গে পরিচালক রিয়াদ ভিঞ্চি ওয়াদিয়ার। ২০০২ সালে সাহিত্য একাডেমি পুরস্কারপ্রাপ্ত মহেশ দত্তানি বানিয়েছিলেন *ম্যাঙ্গো সুফলে*। একাকিত্বে ভোগা গে ফ্যাশন ডিজাইনারের গল্প কমিক আকারে উপস্থাপন করেন মহেশ। বলিউডের মূলধারায় সমকামিতাকে ব্যঙ্গাত্মক রূপ দিয়েছিলেন করণ জোহর তার 'কাল হো না হো' (২০০৩) চলচ্চিত্রে। শুধু সমকামিতা নয়, সমকামিতার প্রতি মানুষের ভুরু কোঁচকানোও করণ তুলে এনেছিলেন ছবিতে।

লেসবিয়ান সম্পর্ক নিয়ে *ফায়ার*-এর পর ভারতে ২০০৪ সালে তৈরি হয় 'গার্লফ্রেন্ড' নামে আরেকটি চলচ্চিত্র। দুই বান্ধবীর মধ্যে একজন লেসবিয়ান, অন্যজন বাইসেক্সুয়াল। বান্ধবীর সঙ্গে সমকামিতা ছাড়াও তার জীবনে ছিল একজন পুরুষের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক। সমকামিতার সম্পর্ক ও স্ট্রেট সম্পর্কের দ্বন্দ্ব, বয়ফ্রেন্ড ও বন্ধুর মধ্যে যৌন হিংসা নিয়ে নির্মিত হয় গার্লফ্রেন্ড। *মাই ব্রাদার নিখিল* (২০০৫) ছবিতেই প্রথম গে সমকামিতাকে দারুণ সফলভাবে নিয়ে এসেছিলেন গে পরিচালক ওনির। ভারতে সমকামিতার কারণে একঘরে হয়ে যাওয়া থেকে এইডস নিয়ে বাঁধাধরা ধারণা, সর্বোপরি পরিবারের পাশে দাঁড়ানো – এ সবকিছুই ওনির তুলে ধরেছিলেন ছবিতে। 'হানিমুন ট্রাভেলস প্রাইভেট লিমিটেড' (২০০৭) নামের চলচ্চিত্রটি নির্মিত হয় ছয়টি সদ্যবিবাহিত জুটির হানিমুনের গল্প নিয়ে। এই ছয় জোড়ার মধ্যে ছিলেন এক নারীকে সদ্য বিয়ে করা এক সমকামী পুরুষ। সেখান থেকেই অন্য সমকামী পুরুষের প্রতি আকর্ষণ ও বৈবাহিক সম্পর্কের মধ্যে থেকেও নিজ নিজ পছন্দের জায়াগা বেছে নেন তাঁরা।

---

[৪] http://www.dw.de/হলিউডের-ছবিতে-সমকামী-চরিত্র-কম/a-17039566 (Accessed on 20 June 2015).

[৫] http://www.dw.de/দেশে-দেশে-সমকামী-অধিকার/a-17277797 (Accessed on 20 June 2015).

বলিউডে 'দোস্তানা' (২০০৮) চলচ্চিত্রের মাধ্যমে খ্যাতিমান নির্মাতা করণ জোহর দ্বিতীয়বারের মতো গে সম্পর্ককে ভারতীয় চলচ্চিত্রের পর্দায় উপস্থাপন করেন। অভিষেক বচ্চন ও জন আব্রাহামের সাজানো গে সম্পর্ক বক্স অফিসে প্রথমবারের মতো কিছুটা হলেও দর্শকদের আনুকূল্য পেয়েছিল। পরে অবশ্য 'বম্বে টকিজ' ছবিতেও সমকামিতা দেখিয়েছেন করণ জোহর। 'ফ্যাশন' (২০০৮) ছবিতে সমকামিতার অন্য দিক তুলে ধরেন পরিচালক মধুর ভান্ডারকর। সমাজের সামনে নিজের সমকামিতা লুকিয়ে রাখতে বন্ধু মুগ্ধা গডসেকে বিয়ে করে গে ডিজাইনার সমীর সোনি। *না জানে কিউ* (২০১০) ছবিটিকে সেন্সরবোর্ডের চোখরাঙানির মুখে পড়তে হয়েছিল; এমনকি সমকামিতার দৃশ্যে অভিনয়ের জন্য অভিনেতা যুবরাজ পরাশকে ত্যাজ্য করেছিল তার পরিবার। সম্প্রতি চলচ্চিত্র পরিচালক সোনালি বোস 'মার্গারিটা, উইথ আ স্ট্র' (২০১৪) ছবিতে তুলে ধরেছেন ভারতীয় সমাজের সমকামিতা এবং উভকামিতা বা বাইসেক্সুয়ালিটি।

এবার আসা যাক ভারতের কলকাতা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে সমকামিতানির্ভর চলচ্চিত্রের বিষয়ে। পুরুষ হও বা নারী, তুমিই আমার সখা – ঋগ্বেদের এই উক্তিকে পুঁজি করে সমকামিতা নিয়ে নির্মিত কলকাতার একটি বাংলা ছবির নাম '১০ জুলাই' (২০১৪)। সমকামীদের জীবনযাত্রার গল্প নিয়ে রাতুল গঙ্গোপাধ্যায় নির্মিত এ ছবিতে অফিসের একজন সমকামী বসের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন চিরঞ্জিত। এ ছাড়া দেবশ্রী রায় এই ছবির জন্য একটি আইটেম গানে নেচেছেন; আর ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত অভিনয় করেছেন একটি গে পরিবারের গভর্নেস হিসেবে। মূলত একটি গে এবং একটি লেসবিয়ান পরিবারের ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক সমস্যাগুলো দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে '১০ জুলাই' ছবিতে। ২০১১ সালে ভারতীয় বাংলা সমাজের একটি সত্য ঘটনাকে অবলম্বন করে কৌশিক গাঙ্গুলি নির্মাণ করেন 'আরেকটি প্রেমের গল্প'। কলকাতায় এককালের যাত্রা জগতের খ্যাতিমান পুরুষ অভিনেত্রী চপলরানির জীবনকাহিনির আদলে নির্মাণ করা হয়েছে এ ছবিটি। 'আরেকটি প্রেমের গল্প' ছবিটির কাহিনি মূলত সমকামী প্রেমনির্ভর। দু'জন পুরুষের মধ্যেকার শারীরিক সম্পর্ক দেখানো হয় এ ছবিতে। এমন সাহসী এবং বিতর্কিত বিষয় নিয়ে দর্শকদের সঙ্গে এত সরাসরি, এত কুণ্ঠাহীন কথোপকথন এর আগে বাংলা সিনেমায় হয়নি।

এদিকে বাংলাদেশের মূলধারা বা বিকল্পধারা – কোনো ধারার চলচ্চিত্রাঙ্গনেই সমকামীদের নিয়ে তেমনভাবে চলচ্চিত্র নির্মিত হতে দেখা যায়নি। 'আমরা কি এতই ভিন্ন' নামের যে প্রামাণ্য চলচ্চিত্রটির কথা ইতিপূর্বে বলা হয়েছে এর বাইরে হুমায়ূন আহমেদের 'ঘেটুপুত্র কমলা'ই এখন পর্যন্ত বাংলাদেশি চলচ্চিত্র যার বিষয়বস্তু সমকামিতা। বাংলাদেশে সমকামিতার বিষয়টি ধীরে ধীরে ওপেন সিক্রেট বিষয়ে পরিণত হতে থাকলেও কেউ প্রকাশ্যে এ নিয়ে এগিয়ে আসতে চান না। বিশেষ করে এ দেশে ইসলামী মৌলবাদীদের তৎপরতার কারণে এ নিয়ে প্রকাশ্যে কথা বলা, এ নিয়ে নাটক, সিনেমা নির্মাণ করাকে সবাই খুব স্পর্শকাতর বিষয় হিসেবেই দেখে থাকেন।

'ঘেটুপুত্র কমলা' চলচ্চিত্রের কাহিনিবিন্যাস

চলচ্চিত্রটিতে বর্ণিত সময়কাল এদেশে ব্রিটিশদের শাসনামল। প্রায় দেড়শ বছর আগের এক গ্রামীণ পবিবেশের আবহ খুঁজে পাওয়া যায় চলচ্চিত্রটিতে। বর্তমান বাংলাদেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সিলেট বিভাগের হবিগঞ্জ জেলার জলসুখা গ্রামের পটভূমিতে চলচ্চিত্রটির কাহিনি নির্মিত। ছবির প্রধান দুটি চরিত্র হলো হেকমত চৌধুরী ও ঘেটুপুত্র কমলা। হেকমত চৌধুরী এক সময়ের জমিদার পরিবারের শেষ

বংশধর। হবিগঞ্জের হাওরাঞ্চলে তার বিশাল দোতলা বাড়ির পাশেই হাওর। হাওরে পানি জমতে শুরু করলে জলবন্দি সময়টায় আনন্দ-ফুর্তি করার জন্য হেকমত চৌধুরী বাড়িতে ঘেটুগানের দল ডেকে আনেন। সঙ্গে আসে অবধারিতভাবে একজন ঘেটুপুত্র – নয় দশ বছরের বালক জহির, যার ঘেটুনাম কমলা। তিন মাসের চুক্তিতে এই কমলা হেকমত চৌধুরীর বাড়িতে আসে তার বাবা দলপতি ফজলু, ড্যান্সমাস্টার গৌরাঙ্গ ও দলের অন্যান্যদের সঙ্গে। ছেলে কমলা অর্থাৎ জহিরকে হেকমত চৌধুরী যৌনসঙ্গী হিসেবে ব্যবহার করবে – এটা জেনেও অভাবী বাবা গানের দলের অধিকারী ফজলু ছেলেকে নিয়ে হেকমতের বাড়িতে গান-বাজনা করতে আসেন। ঘেটুপুত্রের উপস্থিতি মেনে নিতে না পারলেও পুরুষতান্ত্রিক সমাজের নিগড়ে বন্দি হেকমত চৌধুরীর স্ত্রী জোরালো প্রতিবাদ করতে পারেন না। ঘেটুপুত্রকে তাড়ানোর সাধ্য তার নেই বুঝে নিজেকেই বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দিতে বললে হেকমত চৌধুরী তাকে তালাক দেওয়ার হুমকি দেন। এরপর থেকে সরাসরি এ বিষয়ে কিছু না বললেও হেকমতের স্ত্রী সবসময়ই ঘেটুপুত্র কমলাকে তীব্র ঘৃণার চোখে দেখতে থাকেন।

এদিকে বাড়িতে প্রতিদিন ঘেটুপুত্র কমলার নাচ-গানের আসর বসে। আর রাতে চলে শিশু কমলার ওপর মধ্যবয়সী বিশালদেহী পুরুষ হেকমত চৌধুরীর যৌননির্যাতন। বাড়িতে একজন মাওলানা, একজন চিত্রশিল্পীসহ অনেকেই উপস্থিত থাকলেও কারো সাহস নেই হেকমত চৌধুরীর কাজের প্রতিবাদ করার। পাশাপাশি বাড়িতে নামাজ-কালামেরও কোনো অভাব হয় না। বাড়িতে নিয়ম করে পাঁচ ওয়াক্ত আজান হয়, নামাজ পড়া হয়। হেকমতের মেয়ে ফুলরানীকে প্রতিদিন মাওলানা কোরআন শিক্ষাও দেন। হেকমতকে অবশ্য নামাজ পড়তে দেখা যায় না। মিষ্টির দোকানে মেয়ে ফুলরানী 'বিসমিল্লাহ' বলা ছাড়াই মিষ্টি মুখে দিয়ে ফেললে হেকমত চৌধুরী 'পাপের ভয়ে' মেয়েকে মুখ থেকে মিষ্টি ফেলে দিতে বলেন। পরে আবার 'বিসমিল্লাহ' বলিয়ে মিষ্টি মুখে দেওয়ান। গ্রামে জুয়ার আসর দেখে হেকমত বিরক্তি প্রকাশ করেন, কারণ তার গাঁয়ে জুয়া নিষিদ্ধ। তবে পানিবন্দি সময়টায় গ্রামের সাধারণ পুরুষদের আনন্দ-ফুর্তির জন্যই এটা আয়োজন করা হয়েছে বলা হলে তখন আবার তা হেকমতের কাছে যৌক্তিক বলেই মনে হয়।

কমলারূপী জহিরের সাজসজ্জা হেকমতের পছন্দ না হওয়ায় কমলাকে সাজানোর ভার হেকমত তার স্ত্রীর ওপরই চাপিয়ে দেন। 'অবলা নারী' স্বামীর সে হুকুমও বিনা বাক্যব্যয়ে মেনে নিতে বাধ্য হন। মনের এ ক্ষোভ তিনি ঝাড়েন শিশু কমলার ওপরই – একদিন সাজানোর সময় কমলার মুখে থু থু ছিটিয়ে। সরাসরি এর বেশি কিছু করতে না পেরে হেকমতের স্ত্রী কমলাকে ছাদ থেকে ফেলে মেরে ফেলার মতো প্রাণঘাতী সিদ্ধান্ত নেন। টাকা আর গয়নার লোভ দেখিয়ে এ কাজে নিযুক্ত করেন তার দাসী ময়নাকে। ময়না বেশ কয়েকবার অসফল হলেও কাহিনির শেষের দিকে কমলারূপী জহিরকে ছাদ থেকে ফেলে দেয়। মৃত্যু হয় জহিরের। তার আর বাড়িতে অপেক্ষারত মা-বোনের কাছে ফিরে যাওয়া হয় না। শিল্পী শাহ আলম হত্যার ঘটনাটি দেখে ফেললেও হেকমত চৌধুরীকে কিছুই বলার সাহস পান না। তবে হেকমত চৌধুরী বুঝতে পারেন দাসী ময়নাকে দিয়ে তার স্ত্রীই এ ঘটনাটি ঘটিয়েছেন। আক্রোশে হেকমত তার স্ত্রীকে ডেকে দাসী ময়নাকে বিদায় করে দিতে বলেন। তবে স্ত্রীকে তিনি সরাসরি কিছুই বলেন না। হাওড়ের পানি নেমে গেছে বলে এখন আর ঘেটুপুত্রের দরকার নেই, পরের বছর প্রয়োজনে আবার দেখা যাবে – এ ঘোষণাও দিয়ে রাখেন হেকমত। 'সতীন'কে বিদায় করতে পেরে তৃপ্ত হেকমতের স্ত্রী আবার হেকমতের পাশে ঘনিষ্ঠ হয়ে বসেন, হেকমতও তাকে প্রশ্রয় দেন।

ছবির শেষ দৃশ্যে হেকমত আবার সবকিছু স্বাভাবিক ধরে নিয়ে যখন আয়েশ করে ছাদে বসে হাওয়া খেতে থাকেন তখন ফুটফুটে কিশোর কমলারূপী জহিরকে হারিয়ে ঘেটুগানের দল ভারাক্রান্ত মন নিয়ে ফিরে যায় নিজেদের গাঁয়ের দিকে।

'ঘেটুপুত্র কমলা'-য় উপস্থাপিত সমকামিতার স্বরূপ

ঐতিহাসিক চলচ্চিত্র বলতে আমরা যা বুঝি, হুমায়ূন আহমেদের পরিচালনায় নির্মিত অষ্টম চলচ্চিত্র 'ঘেটুপুত্র কমলা'-কে সরাসরি তার কাতারে ফেলা না গেলেও এই চলচ্চিত্রের উপাদান কিন্তু ঐতিহাসিকই। ছবির শুরুতে পরিচালক যেমনটি তাঁর দর্শকদের জানিয়েছেন, এই চলচ্চিত্রে বয়ান করা ঘেটুগানের জন্ম দেড়শ বছর আগে হবিগঞ্জের জলসুখা গ্রামের এক বৈষ্ণব আখড়ায় (যদিও তাত্ত্বিকেরা ঘেটু বা ঘাটুগানের জন্মের অন্য বৃত্তান্ত দিয়েছেন)। সে সময়ে বাংলার হাওরাঞ্চলে জলবন্দি সময়টাতে গ্রামের 'শৌখিনদার' মানুষদের ঘেটুগানের আড়ালে নারীবেশী কিশোরদের দিয়ে যৌনলালসা চরিতার্থ করার প্রথা চালু ছিল। সমাজ, ধর্ম ও নৈতিকতা – কোনো মানদণ্ডেই এই কাজের ছাড়পত্র না মিললেও যুগ যুগ ধরে এটা চলে আসছিল। এক পর্যায়ে সবাই এটিকে স্বাভাবিক হিসেবেই ধরে নিয়েছিল। সেরকম একটি বিষয়কে উপজীব্য করেই এই চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছে। চলচ্চিত্রের শুরুতে বলা হয়েছে – সুখের বিষয় এই প্রথা, সঙ্গীতের নামে এই কদাচার এখন বন্ধ হয়েছে। সুতরাং, এই চলচ্চিত্রের বিষয় হিসেবে এমন ঘটনাবলী বেছে নেওয়া হয়েছে যা আজ ইতিহাসেরই অংশ। সে অর্থে এই চলচ্চিত্রটিকে একটি ঐতিহাসিক চলচ্চিত্র বলা যায়। যে প্রথা দীর্ঘদিন আগেই বন্ধ হয়ে গিয়েছে, সমাজে এখন যার সরাসরি কোনো অস্তিত্ব নেই তেমন বিষয় নিয়ে হুমায়ূন আহমেদ এই যুগে এসে ছবি করতে গেলেন কেন? এই প্রশ্ন উঠতেই পারে। যদিও ইতিহাসের অংশ হয়ে গেছে অতীতের এমন বিষয় নিয়ে বর্তমানে যে চলচ্চিত্র নির্মাণ করা যাবে না এমনটা কিন্তু নয়। বরং অতীত বা ইতিহাসের উপাদান নিয়ে চলচ্চিত্রশিল্পের জন্মলগ্ন থেকে কালজয়ী অনেক চলচ্চিত্র নির্মিত হয়ে আসছে।

আসলে যেকোনো চলচ্চিত্র নির্মাণের প্রথম পর্যায়ে এর বিষয় নির্ধারণের ক্ষেত্রে চলচ্চিত্রকারের মনে নানা বিবেচনা কাজ করে থাকে। ওই চলচ্চিত্র বিশ্লেষণ করতে গিয়ে চলচ্চিত্রকারের সেসব বিবেচনাকেও বিশ্লেষণের সুযোগ আছে বৈকি। রেপ্রিজেন্টেশন ও সমালোচনাত্মক তত্ত্বের আলোচনার বিষয়ও মূলত এটিই। আমাদের চিন্তাজগতের ধারণা এবং সেগুলোর মধ্যে বিদ্যমান ধারণাগত যে সম্পর্ক, তা রেপ্রিজেন্ট বা প্রতিনিধিত্ব করে চিহ্ন এবং এগুলো একত্রে আমাদের সংস্কৃতির অর্থ-পদ্ধতি তৈরি করে। অর্থাৎ রেপ্রিজেন্টেশন তত্ত্বের মূল বক্তব্য হলো, ভাষার মাধ্যমে বিভিন্ন ধারণার অর্থ নির্মাণ পদ্ধতি হিসেবে রেপ্রিজেন্টেশন আমাদের বিভিন্ন ধারণাকে নানাভাবে বিন্যস্ত করে এবং তাদের মধ্যে অর্থপূর্ণ যোগাযোগ ঘটানোর মাধ্যমে কাজ করে থাকে। এই অর্থ নির্মাণপ্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত থাকে নানা ধরনের সংকেতলিপি বা কোড। এসব সংকেতে আবার অর্থ আরোপ করে নির্দিষ্ট সংস্কৃতি। সাংস্কৃতিকভাবে আরোপিত অর্থকেই আমরা আবার উন্মোচন করি সাহিত্য, নাটক, চলচ্চিত্রের নানা সংকেত থেকে। স্টুয়ার্ট হলের ধারণামতে, কোনো সংকেত নিজে বা তার ব্যবহারকারী কেউই অর্থ প্রদান করতে পারে না। আমরা রেপ্রিজেন্টেশন ব্যবস্থায় ধারণা ও চিহ্নের মাধ্যমে অর্থ প্রদান করি। আর একই ভাষা পদ্ধতিতে নির্দিষ্ট চিহ্ন তখনই শুধু অর্থ বহন করে যখন আমরা নির্মাণমূলক ধারায় দেওয়া অর্থকে আবার সংকেতলিপির মাধ্যমে উন্মোচন করি।[৬]

---

[৬] কাবেরী গায়েন, *মুক্তিযুদ্ধের চলচ্চিত্রে নারী-নির্মাণ* (ঢাকা: বেঙ্গল পাবলিকেশন্স, ২০১৩), ৫৬।

মিডিয়ায় রেপ্রিজেন্টেশনের ভাষা বিশ্লেষণের সময় মিডিয়ার উৎপাদের ক্ষেত্রে তিনটি প্রশ্ন অবধারিতভাবেই সামনে চলে আসে। এমনটাই মনে করেন Norman Fairclough। প্রশ্নগুলো হলো: বর্ণিত জগৎ কীভাবে উপস্থাপিত? বিষয়বস্তুতে যারা সংযুক্ত তাদের পরিচয় কীভাবে নির্মিত? এবং যারা সংযুক্ত তাদের সম্পর্ক কীভাবে উপস্থাপিত হয়েছে? তাঁর মতে, এ তিনটি প্রশ্ন রেপ্রিজেন্টেশন, পরিচয় ও সম্পর্কের সঙ্গে জড়িত।[৭]

চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে এই রেপ্রিজেন্টেশন তত্ত্ব দিয়ে 'সত্য' বা 'বাস্তব' বা ইতিহাসকে চলচ্চিত্রকার কীভাবে পর্দায় হাজির করেছেন, সেখানে তাঁর কী মতাদর্শ কাজ করেছে সে বিষয়গুলো উন্মোচন করা সম্ভব। তবে চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে শুধু দৃশ্যের বর্ণনা বা নির্মাণ-কারিগরি দিক বিশ্লেষণ না করে বরং সমাজে বিদ্যমান রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক কাঠামোকে টিকিয়ে রাখার জন্য কীভাবে টেক্সট কাজ করে সেটি বিশ্লেষণ করাও জরুরি। এক্ষেত্রে সমালোচনাত্মক তত্ত্বের ধারণা প্রয়োগ করা যেতে পারে। এই দুটি তত্ত্বের ধারণার ভিত্তিতে আমরা 'ঘেটুপুত্র কমলা'-কে বিশ্লেষণ করলে দেখতে পাই চলচ্চিত্রকার হুমায়ূন আহমেদ বাংলার হাওরাঞ্চলে এক সময় ঘটে যাওয়া 'সত্য' বা 'বাস্তব' বা 'ইতিহাস'কে চলচ্চিত্রের পর্দায় হাজির করেছেন। এ ক্ষেত্রে তাঁর যে বিবেচনা কাজ করে থাকতে পারে তা হলো, সঙ্গীতের নামে নারীবেশী কিশোর বালকদের প্রতি হেকমত চৌধুরীদের মতো বিত্তবান লোকদের যে যৌন পাশবিক নির্যাতন তা শুধুই ইতিহাসের অংশ নয়। এখনো বাংলার আনাচে-কানাচে এমন ঘটনা হরহামেশাই দেখতে পাওয়া যায়। ঘাটুগানের প্রথা বহু আগেই বন্ধ হয়েছে ঠিকই, কিন্তু পুরুষ শিশুদের প্রতি প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষদের যৌন কদাচার এখনো সমাজে নানা ফরম্যাটে ঘটে চলেছে। একজন সমাজসচেতন চলচ্চিত্রকার হিসেবে হুমায়ূন আহমেদ অতীতের ঘটনাকে পর্দায় তুলে এনে বর্তমানে ঘটমান সেসব কদাচারের দিকে সচেতন মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছেন বলে মনে করা যেতেই পারে। এভাবে তিনি ইতিহাসের ঘটনার আশ্রয় নিয়ে বাংলার সমাজে বিদ্যমান সমকামিতাকে রেপ্রিজেন্ট করতে চেয়েছেন। এ ক্ষেত্রে তিনি চলচ্চিত্র মাধ্যম বেছে নিয়েছেন।

এই চলচ্চিত্রের চরিত্রগুলোর মধ্যে পাঁচটি চরিত্রে সবচেয়ে বেশি মানসিক ঘাত-প্রতিঘাত লক্ষ করা যায়। চরিত্রগুলো হলো 'শৌখিনদার মানুষ' হেকমত চৌধুরী, তার স্ত্রী, কমলারূপী কিশোর জহির, তার মা ও বাবা গানের দলের অধিকারী ফজলু। এ ছাড়া ঘাটুগানের দলের ড্যান্সমাস্টার গৌরাঙ্গ (যাকে তার কিশোরবেলায় ঘেটুপুত্রের ভূমিকায় নামতে হয়েছিল), চিত্রশিল্পী শাহ আলম, দাসী ময়নার মধ্যেও নানা ঘটনায় মানসিক টানাপোড়েন দেখা গেছে। হেকমত চৌধুরী নারীবেশী জহিরের প্রতি কামনার যে তাগিদ অনুভব করেন তাকে এক কথায় সমকামিতা বলতে হয়। কারণ ঘরে তার স্ত্রী বর্তমান থাকলেও এ সময়টায় স্ত্রীর প্রতি তিনি আকর্ষণ অনুভব করেন না। তার ছোট্ট একটা মেয়েও আছে। বাড়িতে ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যও বজায় থাকে তারই ইচ্ছানুসারে। গ্রামেও তার ইজ্জত-সম্মান রয়েছে। গ্রামে তার নির্দেশে জুয়াখেলা নিষিদ্ধ। কিন্তু হাওড়ে পানি জমলে ঘাটুগানের আড়ালে কিশোর কমলাকে প্রতি রাতে তিনি ভোগের সামগ্রী বানান। এ কারণে তাকে মোটেও অপরাধবোধে ভুগতে দেখা যায় না। তার নির্লজ্জ স্বীকারোক্তি – 'আমি একটা শৌখিনদার মানুষ। হাওড়ে পানি জমছে। এই সময়টায় আমোদ-ফুর্তির প্রয়োজন আছে। আমার কিছুই করার নাই।' যৌনপীড়ন চালানোর পরে কিশোর জহির যখন মন খারাপ করে ঘুরে বেড়ায় তখনও হেকমত চৌধুরীর ভ্রুক্ষেপ নেই। তার এই কদাচার নিয়ে স্ত্রীর সঙ্গে মানসিক টানাপোড়েন লেগে থাকে। স্ত্রী মৃদু প্রতিবাদ করলে তাকে তালাকের হুমকি দিয়ে থামিয়ে দেন। কিন্তু নিজের উপস্থিতিতেই একটা কিশোর বালকের প্রতি স্বামীর এমন যৌনতাড়না ও সে প্রবৃত্তি

[৭] তদেব, ৫৭।

মেটানো দেখে ভেতরে ভেতরে তিনি জ্বলে-পুড়ে মরতে থাকেন। কমলারূপী জহিরের নাচের শিক্ষক গৌরাঙ্গকেও পুরো চলচ্চিত্রেই মানসিক পীড়নের শিকার হতে দেখা যায়। কারণ তিনি নিজেও তার কিশোরবেলায় ঘেটুপুত্র হিসেবে কাজ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। তাই তিনি কিশোর জহিরের মর্মবেদনা অনুভব করতে পারেন। কিন্তু তারই বা কী করার আছে? পানিবন্দি সময়ের অবসরে হেকমত চৌধুরী তার ছবি আঁকার জন্য শাহ আলম নামে যে চিত্রশিল্পীকে বাড়িতে ডেকে এনেছেন, ঘটনাপ্রবাহে তিনিও কিশোর জহিরের প্রতি সমব্যথী হয়ে পড়েন। প্রতি রাতে যখন হেকমত চৌধুরী জহিরের উপরে যৌন নির্যাতন চালান এবং জহিরের চিৎকারে বাড়ির অনেকেই ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়েন তখন শাহ আলমকেও দেখা যায় কিশোর বালকের প্রতি গভীর মমত্ববোধ অনুভব করতে। ছবিতে আরেকটি চরিত্রকে সময় সময় মানসিক টানাপোড়েনের মধ্যে দিয়ে যেতে দেখা যায় – হেকমত চৌধুরীর স্ত্রীর দাসী ময়না। এমনিতে তাকে খুব ফুরফুরে মেজাজে পান খেয়ে, হুক্কা টেনে আর হেকমতের স্ত্রীর ফুট-ফরমাশ খাটতে দেখা যায়। কিশোর জহিরের বিষয়ে তার কোনো প্রতিক্রিয়া লক্ষ করা যায় না। উল্টো সুযোগ পেলেই তিনি জহিরের প্রতি শারীরিক নির্যাতন চালাতে দ্বিধা করেন না। জহিরকে ছাদ থেকে ফেলে দিয়ে হত্যার জন্য হেকমতের স্ত্রী এই দাসী ময়নাকেই দায়িত্ব দেন। প্রথমে এ কাজে মত না দিলেও নগদ স্বর্ণমুদ্রা ও মোটা সোনার গয়নার লোভ দেখালে ময়না রাজি হয়ে যান। এ সময় তার মধ্যে কিছুটা মানসিক টানাপোড়েন দেখা দিলেও টাকা আর গয়নার লোভে তিনি দ্বিধাহীন চিত্তে জহিরকে ছাদ থেকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেন এবং লাশের সামনে মায়াকান্না জুড়ে দেন।

জহিরের দারিদ্র্যের কষাঘাতে জর্জরিত বাবা ফজলু চোখের সামনেই তার ফুটফুটে কিশোর ছেলেটির প্রতি হেকমত চৌধুরীর এমন যৌননিপীড়ন দেখেও কিছু করতে পারেন না। নগদ কিছু টাকা-পয়সা পাবেন, ঘরটা নতুন করে সংস্কার করবেন- এসব ভেবে তিনিই ছেলেকে এই ঘটনার শিকার করেছেন। ছেলের বেদনা তাকেও কুরে কুরে খায়। ছবিতে অল্প সময়ের উপস্থিতি হলেও জহিরের মা যে কয়েকবার পর্দায় হাজির হয়েছেন সে কয়েকবারই তাকে মানসিক সংঘাতের ভিতর দিয়ে যেতে হয়েছে। একটি দৃশ্যে দেখা যায়, কিশোর পুত্রকে বিদায় দিতে গিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়ে মা বলেন, 'পেটের ক্ষুধা বড় কঠিন জিনিস রে বাবা। এই ক্ষুধার জন্যই তোকে এমন কাজে মত দিছি। তুই আমারে মাফ করে দিস।' এখানে বাঙালির নিম্নবর্গের ইতিহাসের চর্চা হতে দেখা যায়। কারণ নিম্নবর্গের ইতিহাস চর্চাকারীরা তাঁদের চর্চিত ইতিহাসে প্রমাণ করে দেখিয়েছেন যে, ইতিহাসে নিম্নবর্গের অস্তিত্ব, চৈতন্য, প্রভা এবং একইভাবে তাদের সীমাবদ্ধতাগুলো কী।[৮] পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় 'সাবঅলটার্ন শ্রেণী' হল শ্রমিক শ্রেণী। সমাজিক ক্ষমতার এক বিশেষ ধরনের বিন্যাস ও প্রক্রিয়ার মধ্যে শ্রমিক শ্রেণী শোষিত ও শাসিত হয়।

'ঘেটুপুত্র কমলা'-র কাহিনি এমন একটি বিষয় নিয়ে আবর্তিত হয়েছে যেখানে দৃশ্যের পর দৃশ্য জুড়ে নানা চরিত্রের মানসিক নানা ঘাত-প্রতিঘাত মূর্ত হয়ে উঠেছে। পরিচালক এখানে তাঁর এই ফিল্ম টেক্সটের যে অর্থ দাঁড় করাতে চেয়েছেন, মনোঃসমীক্ষণ তত্ত্বের আলোকে তা পুনরুদ্ধার করা যায়। এই তত্ত্বে চলচ্চিত্রের চরিত্রগুলো বিশ্লেষণ করে তারা যেসব মানসিক টানাপোড়েনের মধ্যে দিয়ে যায় তা পাঠ করে টেক্সটের অর্থ পুনরুদ্ধার করতে হয়। এভাবে 'ঘেটুপুত্র কমলা' চলচ্চিত্রের চরিত্রগুলোর মানসিক টানাপোড়েনকে পাঠ করলে দেখা যায়, এই ছবির প্রায় সবগুলো চরিত্রকেই কিশোর জহিরের প্রতি হেকমত চৌধুরীর যৌনপীড়ন নিয়ে মানসিক দ্বন্দ্বে ভুগতে দেখা গেছে।

---

[৮] আজিজুল রাসেল, ''নিম্নবর্গের ইতিহাস চর্চা ও ইতিহাস চর্চার গতিমুখ'', *কাদামাটি*, বর্ষ-২, সংখ্যা-২, ফাল্গুন-জ্যৈষ্ঠ, ১৪১৪-১৪১৫ (মার্চ-জুন, ২০০৮)।

মিশেল ফুকো যৌনতা নিয়ে যে ধরনের অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ করেছেন তাকে তিনি বলেছেন 'জিনিওলজিকাল' ক্রিটিক। জিনিওলজি ইতিহাসকে বিশ্লেষণ করে বর্তমানের দৃষ্টিকোণ থেকে। এই অনুসন্ধানের উদ্দেশ্য হলো বর্তমান সমাজের বুনিয়াদি ক্যাটাগরিগুলো কীভাবে তাদের ডিসকোর্স ও ডিসকার্সিভ প্র্যাকটিসের মাধ্যমে সৃষ্টি হয়েছে তা প্রকাশ করা। এ বিচারে 'ঘেটুপুত্র কমলা'-য় সাবেক জমিদার হেকমত চৌধুরীর চরিত্রটি একই যৌন দর্শনের প্রতিফলন। কারণ, গাটু গানের ইতিহাস এবং 'ঘেটুপুত্র কমলা'-র কাহিনি অনুসারে গাটু বালকরা সমাজের ক্ষমতাশালী বিত্তবানদেরই ভোগের সামগ্রী ছিল। অন্যদিকে হেকমতের ঘোড়ার সহিসকেও দেখা যায় ঘেটুপুত্রকে ভোগের কামনা করে – তার গাল টিপে দেয়, কল্পনায় ঘোড়ার পিঠে কমলার সাথে ঘন হয়ে বসে, কিন্তু বাস্তবে পায় না। এখানে সহিসের চরিত্র বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, ধর্ম বা আদর্শ তার কাছে বাধা নয়, তার কাছে বাধা হলো তার অর্থনৈতিক অক্ষমতা।

'ঘেটুপুত্র কমলা'-য় ক্ষমতা-প্রশ্নে বাঙালির সংস্কৃতির আংশিক সমকামিতাকে দেখাতে সক্ষম হয়েছেন হুমায়ূন আহমেদ। কিন্তু 'ঘেটুপুত্র কমলা'-য় তথাকথিত একটি ধার্মিক পরিবার, যেখানে সামগ্রিকভাবে নিয়ম করে জামাতের সাথে ওয়াক্ত অনুযায়ী নামাজ পড়া হয়, কোরআন শিক্ষা ও তেলাওয়াত করা হয় – এরকম কঠোর ধর্মীয় অনুশাসনের একটি পরিবার-প্রধান হেকমত যখন প্রকাশ্যে সমকামিতা করেন তা ইসলামের সাথেও সাংঘর্ষিক বটে। আগের আলোচনায় দেখেছি, ইসলামে সমকামিতাকে সমর্থন করা হয় না। একদিকে ইসলামপ্রীতি অন্যদিকে সমকামিতাপ্রীতি – এর মাধ্যমে হেকমতের দ্বিমুখী আচরণের বহিঃপ্রকাশ লক্ষ করা যায়। হেকমতের বাড়ির মাওলানা ঘাটুপুত্রকে মানসিকভাবে মেনে নিতে পারেন না, আবার এ ধরনের কাজ যে ইসলাম-বিরুদ্ধ তা হেকমতকে বলার সাহসও রাখেন না, এক্ষেত্রে মাওলানাও দ্বৈত স্বভাবদোষে দুষ্ট বলা যায়। ইসলামে সমকামিতা পাপ – এটা হেকমত নিশ্চয় জানেন, কেননা তার সহিস পর্যন্ত এ ব্যাপারে ওয়াকিবহাল। কারণ মাওলানা যখন সহিসকে নামাজের আহ্বান জানান তখন সহিস তাকে বলে, যে বাড়িতে ঘেটু পোলা থাকে সেখানে নামাজ হয় না।

চলচ্চিত্রে কিছু দৃশ্যে রূপকের আশ্রয় নিয়েছেন হুমায়ূন আহমেদ। দৃশ্যপটে এমন কিছু সামগ্রী রাখা হয়েছে, যাকে চলচ্চিত্রবিদ্যার ভাষায় 'প্রপস' বলা হয়, যার মাধ্যমে চলচ্চিত্রকার দৃশ্যের মধ্যেকার চরিত্রসমূহের মানসিক অবস্থাকে চিত্রিত করতে চেয়েছেন। এভাবে তিনি ওই সামগ্রীর মধ্যে একপ্রকার অর্থ আরোপ করতে চেয়েছেন। চলচ্চিত্রে ব্যবহৃত কোড বা সংকেতের পাঠোদ্ধার করার বিদ্যা সেমিওলজি বা চিহ্নবিদ্যার আশ্রয় নিয়ে সেসব অর্থ পুনরুদ্ধার করা যায়। এ চলচ্চিত্রে সে রকম কিছু কোড হলো চিত্রশিল্পী শাহ আলমের ঘরে রাখা কয়েকটি ভাস্কর্য। যেমন, জিরাফকে কামড়ে ধরে রাখা বাঘ। কমলারূপী কিশোর জহিরের সঙ্গে যখন হেকমত চৌধুরী যৌনক্রিয়া শুরু করে তখন তীব্র ব্যথায় জহির চিৎকার করে ওঠে। এই দৃশ্যের সাথে সাথেই রূপক হিসেবে শাহ আলম তার ঘরে রাখা ওই বাঘের শিকারের ভাস্কর্যের দিকে তাকান। এর দ্বারা চলচ্চিত্রকার যে অর্থ তৈরি করতে চেয়েছেন তা হলো শিশু জহির এখন সেই অসহায় জিরাফ, আর হেকমত চৌধুরী হলো বাঘ। আরেকটি দৃশ্যে যখন জহিরকে হেকমতের ঘরে তার যৌনসঙ্গী হওয়ার জন্য পাঠানো হয় সেই দৃশ্যে জহির হেকমতের ঘরে ঢোকার সময় দরজায় একটি বাঘের বিশাল হা করা মুখের ভাস্কর্য রাখা ছিল। জহির ঘরে ঢোকার আগে সেই ভাস্কর্যের দিকে তাকায় ভয়ার্ত দৃষ্টিতে। এখানে পরিচালক ওই ভাস্কর্যের দ্বারা দর্শকদের যে বার্তা দিতে চেয়েছেন তা হলো শিশু জহির এখন এ রকম একটি বাঘের শিকার হতে চলেছে। এ ছাড়া সাবেক জমিদার হেকমত চৌধুরীর বাড়িতে বিভিন্ন স্থানে হিন্দু দেব-দেবীর মূর্তি দেখা যায়। যে বাড়িতে সবাই নিয়ম করে জামাতের সঙ্গে নামাজ পড়ে সেই বাড়িতে হিন্দুদের এ রকম দেব-দেবীর অবস্থান

হেকমত চৌধুরীর স্ববিরোধিতার পরিচয় তুলে ধরে। 'আধুনিক ভাষাতত্ত্বের জনক' হিসেবে স্বীকৃত সস্যুর মনে করেন, অর্থের উৎপাদন ভাষার উপরে নির্ভর করে। এক্ষেত্রে ভাষা হলো 'চিহ্নপদ্ধতি'। কোনো ধারণা প্রকাশ করা বা যোগাযোগ করার সময় ধ্বনি, চিত্র, লিখিত শব্দ, চিত্রকলা, আলোকচিত্র ইত্যাদি ভাষার মধ্যে চিহ্ন হিসেবে কাজ করে। সস্যুর চিহ্নকে আরো দুটি উপাদানে ভাগ করেছেন – Form বা রূপ (সত্যিকারের শব্দ, আলোকচিত্র, চিত্র ইত্যাদি) এবং আমাদের চিন্তায় কাজ করা বিভিন্ন আইডিয়া বা ভাবনা, যার সঙ্গে রূপের সংযোগ রয়েছে। এই রূপকে সস্যুর বলছেন Signifier (দ্যোতক) এবং দ্বিতীয় উপাদান অর্থাৎ চিন্তাতে কাজ করা সংশ্লিষ্ট ধারণাকে তিনি বলছেন Signified (দ্যোতনা)। প্রতিটি ক্ষেত্রে আমাদের মস্তিষ্ক যা শোনে, পড়ে বা দেখে তা হলো দ্যোতক (যেমন, *ওয়াকম্যান*-এর শব্দ বা ছবি), এটা সম্পর্কিত করে দ্যোতিতের সঙ্গে (আমাদের মস্তিষ্কে থাকা বহনযোগ্য ক্যাসেটপ্লেয়ারের ধারণা)। অর্থ তৈরিতে এই দুটি উপাদানেরই প্রয়োজন রয়েছে বলে মনে করেন সস্যুর, কিন্তু আমাদের সাংস্কৃতিক ও ভাষিক সংকেতলিপির দ্বারা স্থিরীকৃত দুজনের সম্পর্কই আসলে অর্থটা তৈরি করে।[৯]

চলচ্চিত্রকার মতিন রহমান 'ঘেটুপুত্র কমলা'-র চলচ্চিত্র সমালোচনায় বলেন, 'সমাজবোধ-ইতিহাসবোধে উদ্ভাসিত শিল্পবোধের পরিপূরক *ঘেটুপুত্র কমলার* চলচ্চিত্র উপাদান। ঘেটুপুত্র কমলার নিষ্পাপ আচরণ, ক্ষমতা-অবশ পিতা, অভাব বহিক্রিয়ার ধাক্কায় মাতৃভাবাদর্শলুপ্ত বিপন্ন কমলার মা এবং টানাপোড়েনের শিকার হেকমতের স্ত্রী হামিদা ঘেটুপুত্র কমলার প্রাণরস। সব চরিত্রের নায়ক জমিদার চৌধুরী হেকমত। বিশৃঙ্খল পরিবেশেই তার শৃঙ্খলিত জীবন। অজু, নামাজ, পরিবারে কোরআন শিক্ষা, মানবসেবা। সবকিছুর মাঝেই তার চারিত্রিক শুদ্ধতার ছিদ্রপথে প্রবেশ করে প্রমোদবিকার।'[১০] হেকমত স্বজ্ঞানেই তার কামনা-বাসনা চরিতার্থেই স্নায়ুমন উত্তেজিত। এক্ষেত্রে হেকমত অনেকটা সফল বলা চলে, কারণ তার কাছে ক্ষমতা আছে। আর এখানেই সমালোচনাত্মক তত্ত্বের আলোচনা চলে আসে। সমালোচনাত্মক তত্ত্বের গোড়ার কথা হলো 'অধিপতিশীল শ্রেণীর ভাবাদর্শই, সব যুগে, অধিপতিশীল ভাবাদর্শ'।[১১]

অন্যদিকে স্বাধিকার হারানো হেকমত-স্ত্রী হামিদার অন্তঃক্ষরণ, সতিন ভাবা সেই কমলাকে নিজ হাতে সাজিয়ে স্বামীর কাছে তারই প্রাপ্য বিনোদনভোগী করে পাঠানো, হেকমত-স্ত্রীর আদ্যন্ত জুড়ে একটা প্রচণ্ড মানসিক চাপ, এর প্রকাশিত অভিব্যক্তিতে হেকমত-স্ত্রী এক উত্তীর্ণ অভিনয় প্রকাশ, যা চিরাচরিত বাংলার অবহেলিত ও নির্যাতিত নারীর মূর্ত প্রতীক। এক্ষেত্রে মার্জারি রোজেন ও মলি হাসকেলের নারীবাদী গবেষণাকর্মের সন্মুখ প্রতিফলন। রোজেন ১৯৭৩ সালে প্রকাশিত তাঁর গবেষণা *'Popcorn Venus: Women, Movies, and the American Dream'* এবং হাসকেল তাঁর *'From Reverence to Rape: The Treatment of Women in Movies'* প্রবন্ধে বৃহত্তর ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে নারীর রূপায়ণ বিশ্লেষণ করে দেখান।[১২] নারীদের কীভাবে চিরায়ত জেন্ডার-ভূমিকায় উপস্থাপন করা হয়েছে, তাঁদের সক্রিয় নাকি নিষ্ক্রিয় করে দেখানো হয়েছে, কিংবা কতটা সময়

---

[৯] স্টুয়ার্ট হল, ''রেপ্রিজেন্টেশন'', অনু: ফাহমিদুল হক, *যোগাযোগ*, ফাহমিদুল হক ও আ-আল মামুন সম্পা., সংখ্যা ৮, ফেব্রুয়ারি ২০০৭।

[১০] মতিন রহমান, 'চলচ্চিত্র সমালোচনা: ঘেটুপুত্র কমলা', প্রথম আলো, সেপ্টেম্বর ১৩, ২০১২।

[১১] কাবেরী গায়েন, *মুক্তিযুদ্ধের চলচ্চিত্রে নারী-নির্মাণ*, ৫৮।

[১২] Janet McCabe, *Feminist Film Studies: Writing the Woman into Cinema* (London and New York: Wallflower, 2004), 7-8.

নারীকে পণ্য হিসেবে গণ্য করে উপস্থাপন করা হয়েছে সেগুলো তাঁরা বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন। একইসাথে মেৎজের '*Male Gaze*' বা পুরুষদৃষ্টিশাসিত উপস্থাপনের বিষয়টিরও স্পষ্ট রূপায়ণ লক্ষ করা যায়। এখানে লরা মালভির চলচ্চিত্রে Scopofilia-র কথাও বলা যায়, অর্থাৎ বাস্তবের মতো চলচ্চিত্রের পর্দাতেও নারীর আলাদা সত্তা বলে কিছু থাকে না, এখানেও নারী নিষ্ক্রিয় এবং পুরুষের পরিচয়েই পরিচিত হয়। শঙ্করী মুখোপাধ্যায় এ বিষয়টিকে আরো স্পষ্ট করে বলেন, মানবসভ্যতা প্রজননকে গুরুত্ব দিতে গিয়ে নারীর যৌনতাকে শৃঙ্খলিত করেছে প্রজননের মধ্যে। বিবাহ প্রথার মাধ্যমে নারী পুরুষের সম্পত্তিতে পরিণত হয় এবং তার সহজাত স্বাভাবিক যৌনসম্ভোগের স্বাধীনতা হারায়। সেই প্রাচীন প্রস্তরযুগের সমাপ্তির পর থেকে আজ অবধি চলে আসছে নারীর স্বাভাবিক যৌনকামনাকে বেঁধে রাখার ইতিহাস। পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় সময়ের সাথে সাথে বিভিন্ন পরিবর্তন এসেছে এই বাঁধনকে পোক্ত করতে। সতীত্ব, উপাচার, সন্তান, ধর্ম, পরিবার, ন্যায়-নীতি দিয়ে তাকে বোঝানো হয় সন্তান, ধর্ম, স্বামী, পরিবার-পরিজন এদের প্রতিপালনেই তার আসল সুখ – এরা সুখে থাকলেই নারীর আসল সুখ।[১৩] 'ঘেটুপুত্র কমলা'-য় হেকমতের স্ত্রী হামিদা এর বাইরে নয়। তাই হেকমত চৌধুরীর স্ত্রী হেকমতের অনাচারের বিরুদ্ধে সরাসরি অবস্থান নিতে পারেন না। পরিবর্তে তিনি নিজে দৃশ্যপট থেকে সরে যেতে চান, তাকে বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দিতে বলেন। কিন্তু তাতেও হেকমতের আপত্তি, বাপের বাড়ি গেলে একেবারেই যেতে হবে। তারপরও জোরাজুরি করলে মাওলানা ডেকে তালাকনামা প্রস্তুতের হুমকি দিলে হেকমতের স্ত্রী আর প্রতিবাদ করার সাহস পান না। এই চরিত্রটি পুরো ছবিতেই স্বামী হেকমতের দ্বারা মানসিক নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। যে কিশোর জহিরের কাছে এই নারীর ব্যক্তিসত্তা পরাজিত হয়েছে, সেই কমলারূপী জহিরকে তার স্বামীর অভিসারের জন্য তাকেই সাজিয়ে দিতে হয়েছে। এভাবে তার স্বাতন্ত্র্যকে বারবার ধূলিসাৎ করেছেন হেকমত চৌধুরী। নারীর প্রতি পুরুষতান্ত্রিক সমাজের চিরাচরিত মনোভাব হেকমতের একটি সংলাপেই ফুটে উঠেছে – 'স্ত্রীলোক হইল কইতর, ধান ছিটাইলে আসে।' হাওড়ে পানি জমলে হেকমতের 'আমোদ-ফুর্তির' প্রয়োজন পড়ে, কিন্তু এই অসহনীয় দৃশ্য এড়ানোর জন্য তার স্ত্রী বাপের বাড়ি যেতে চাইলে তার অনুমতিটাও মেলে না। হেকমতের শিশুকন্যা ফুলরানীও একইভাবে বাবার অনুশাসনের নিগড়ে বন্দি। আবার কমলারূপী জহিরকে যখন একনজর দেখতে নৌপথ পাড়ি দিয়ে তার মা-বোন ছুটে আসেন হেকমতের বাড়ি, জহিরের বাবা ফজলু তাদের ধমক দিয়ে বাড়িতে ফেরত পাঠান। ছেলেকে একনজর দেখারও অনুমতি দেন না দলপতি ফজলু। এখানে জহিরের মা অবদমিত তার বাবার দ্বারা।

উপসংহার

হুমায়ূন আহমেদের 'ঘেটুপুত্র কমলা' চলচ্চিত্রে বাঙালি সমাজের সমকামিতার স্বাভাবিক স্বরূপ দৃশ্যমান নয়। এখানে বিশেষ একটি গোষ্ঠীর সমকামিতাকে উপস্থাপন করা হয়েছে। এই গোষ্ঠী হলো সমাজের উঁচুতলার মানুষ, যারা অর্থের বিনিময়ে সমাজের নিচুতলার মানুষকে, সে হোক না কিশোর বালক, সমকামিতার অংশ করে। এখানে এক পক্ষ সক্রিয়, এক পক্ষ নিষ্ক্রিয় ভূমিকা পালন করে। কিন্তু সমকামিতার যে চেহারা ইতিহাসের পাতা থেকে উঠে আসে সেখানে এই কর্মটি অনেকটাই যৌথ ক্রিয়ার ফল। তবে ঘাটু গানের আড়ালে যে সমকামিতা 'ঘেটুপুত্র কমলা'-য় তুলে আনা হয়েছে সরাসরি তার আদলে না হলেও সে ধরনের সমকামিতা এখনো আমাদের সমাজে বিদ্যমান। আমাদের দেশের

[১৩] শঙ্করী মুখোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যে নারী-সমকামিতা (ঢাকা: জয়তী প্রকাশনী, ২০১৫), ১১।

একটি বিশেষ শ্রেণীর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেও পুরুষ শিক্ষার্থীদের প্রতি পুরুষ শিক্ষকদের প্রায়ই যৌননিপীড়ন চালানোর খবর পাওয়া যায়। এটাও এক ধরনের সমকামিতা এবং 'ঘেটুপুত্র কমলা'-য় দেখানো সমকামিতা কিছুটা তারই আদলের। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে জোরপূর্বক যৌনক্রিয়া করা হয়। তবে এটি চলে অনেকটাই গোপনে। সমাজে অন্যান্য আঙ্গিকেও সমকামিতা বিদ্যমান রয়েছে। সেকালে হাওরাঞ্চলে এক ধরনের প্রথা হিসেবে চালু থাকা সমকামিতাকে সার্থকভাবেই চলচ্চিত্রের পর্দায় তুলে এনেছেন নন্দিত কথাশিল্পী হুমায়ূন আহমেদ। এই চলচ্চিত্রে একজন কিশোর জহিরের উপরে যেভাবে দিনের পর দিন প্রায় প্রকাশ্যে যৌন নিপীড়ন চলে তাতে দর্শকমাত্রেরই মন আর্দ্র হয়ে ওঠে। এই কিশোরকে ঘিরে সাবেক জমিদার হেকমতের স্ত্রীর মধ্যে যে টানাপোড়েন চলে এবং 'সতীন' কমলারূপী জহিরকে এক পর্যায়ে মেরে ফেলার মাধ্যমে তার জীবন থেকে সরিয়ে দেওয়ার যে ঘটনাকে নাটকীয়ভাবে এই চলচ্চিত্রে উপস্থাপন করা হয়েছে তার মাধ্যমে সমকামিতার সামাজিক কুফল সম্পর্কেও ধারণা পাওয়া যায়। যদিও সমকামিতা ভাল না খারাপ সে প্রশ্ন চলচ্চিত্রকার উত্থাপন করেননি, কিন্তু এই চলচ্চিত্রের মাধ্যমে একটি প্রশ্ন অবশ্যই তোলা যায়। আর তা হলো, সঙ্গীতের নামে হাওরাঞ্চলে চলে আসা শত বছর আগের সেই কদাচার বন্ধ হয়েছে ঠিকই, কিন্তু সমকামিতা কি বন্ধ হয়েছে? শিশুদের উপর চালানো যৌননির্যাতন কি বন্ধ হয়েছে? ইতিহাসের মোড়কে বর্তমানের সমাজে চালু থাকা সমকামিতার দিকে চলচ্চিত্রকার ইঙ্গিত করতে চেয়েছেন। সেই ইঙ্গিত অনেকটা সার্থকভাবেই সেলুলয়েডে ধারণ করতে পেরেছেন হুমায়ূন আহমেদ।

ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ জার্নাল
সংখ্যা ২৩ (১৪২২ বঙ্গাব্দ)

বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলের নারীশিক্ষায় বৈষম্য ও প্রতিবন্ধকতা

শামীম আহম্মেদ*

Abstract: This study tried to find out the cultural and traditional barrier faced by female student and the reasons behind those barriers. Using qualitative research methodology, 55 female students as well as 64 parents has been selected through purposive sampling. Data has been collected through in-depth interview, questionnaire, observation and FGD. Findings revealed that traditional gendered norms hinder girls' educational attainment. Specifically, it was found that girl's were less emphasized in their families while it comes to educational attainment because of patriarchal norms. It was also found poverty, child marriage and gender insensitive education system that limit girls' education in rural Bangladesh.

ভূমিকা

একটি জাতির উন্নতির চাবিকাঠি হলো শিক্ষা। মেধা ও মননে আধুনিক চিন্তা-চেতনায় অগ্রসর একটি সুশিক্ষিত জাতিই একটি দেশকে উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছে দিতে পারে। আবার শিক্ষার অভাবে মানুষ আধুনিক কিংবা অধিক আয় বর্ধনকারী পেশায় নিয়োজিত হতে পারে না, ফলে তাদের আয় কম হয়। অন্যদিকে আবার দরিদ্র ব্যক্তিরা দরিদ্র্যের কারণে শিক্ষা লাভ করতে পারে না, তাই তারা দরিদ্রই থেকে যায়। কাজেই শিক্ষা ও উন্নয়ন গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত। শিক্ষা মানুষের মৌলিক অধিকারগুলোর মধ্যে অন্যতম। মানব সভ্যতা বিনির্মাণে পুরুষ এবং নারীর অবদান বহুমুখী এবং বৈচিত্র্যময়। তা সত্ত্বেও সমাজ পরিবর্তন এবং বির্বতনের সাথে সাথে এদের মধ্যে বিভেদ শুরু হয়। আর এ বিভেদের অন্যতম নিয়ামক হলো শিক্ষা, যার অনুপস্থিতিতে নারীর ব্যক্তিক, সামাজিক, রাজনৈতিক এবং আর্থিক ক্ষেত্রগুলো সংকুচিত এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে একদমই অনুপস্থিত লক্ষ করা যায়। শিক্ষা মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিকে বিকশিত করে এবং নিজের অস্তিত্বকে সম্মান করতে শেখায়। মানব সমাজ উন্নয়নে তাই শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম আর মানুষ হিসাবে এই অধিকার ভোগের সুযোগ প্রত্যেক নারীরই কাম্য। পুরুষের পাশাপাশি নারীদেরও পরিবার, সমাজ, দেশ এবং জাতীয় উন্নয়নের শরিক হওয়ার অধিকার রয়েছে। আর শিক্ষা হলো সেই অধিকার অর্জনের প্রধান অবলম্বন। কিন্তু আজো এদেশের নারীরা সেই সুযোগ থেকে অনেকাংশে বঞ্চিত। গবেষণামূলক এই লেখাটি নিকট অতীত এবং সমসাময়িক প্রেক্ষাপটে রচিত। সরকারের বিভিন্ন শিক্ষা কমিটির প্রতিবেদন, সরকারি বিভিন্ন নথিপত্র ও বিবরণী,

* সহকারী অধ্যাপক, নৃবিজ্ঞান বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

গবেষণামূলক বেসরকারি প্রতিবেদন, সমসাময়িক পত্র পত্রিকার পাশাপাশি সহায়ক বিভিন্ন গ্রন্থ পর্যালোচনা করে জানা যায় – ব্রিটিশ সরকারের নারীশিক্ষার উন্নয়নমূলক নীতির কারণে এদেশে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়াও জমিদার ও উচ্চবিত্ত শ্রেণির উৎসাহের কারণে নারীশিক্ষার বহু প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। কিন্তু ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ শাসনের অবসনের পর পাকিস্থান আমলের শুরুতেই নারীশিক্ষার অগ্রসরমাণ ধারাটি কিছুটা স্থবির হয়ে পড়ে। তখন বিভিন্ন কারণে এদেশ থেকে বহুসংখ্যক হিন্দু জমিদার, হিন্দু শিক্ষক এবং হিন্দু ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের পরিবারের সাথে প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতে অভিবাসী হয়ে চলে যায়। এমতবস্থায় পাকিস্তান সরকার বেশ কয়েকটি শিক্ষানীতি প্রণয়ন করে, যা নারীশিক্ষার স্থবিরতা কাটিয়ে শিক্ষা ধারায় প্রবাহমানতা বজায় রাখতে বিশেষ ভূমিকা রাখে।

এরপর যুদ্ধ বিধ্বস্ত বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক সরকার কর্তৃক প্রণীত প্রথম শিক্ষা কমিশনের প্রতিবেদন বাস্তবায়িত হয়নি দেশের রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে। গণতান্ত্রিক সরকারের অবসান ঘটিয়ে সামরিক শাসকের (১৯৭৫-১৯৯০) শাসনকালে সরকার ২য় ও ৩য় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা করে, যার মধ্যে নারীশিক্ষার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত ছিলো। সামরিক শাসন অবসানের পর দেশে পুনরায় গণতান্ত্রিক ধারা ফিরে আসে (১৯৯১-১৯৯৫) এবং সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা আইন করা হয়, যা নারীশিক্ষাকে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ করার বিষয়ে আইনগত স্বীকৃতি ছিলো। এরপর ২০০০ সালে দেশে প্রথমবারের মতো জাতীয় শিক্ষানীতি ঘোষণা করা হয়, এতে নারীশিক্ষার অগ্রায়নে এবং নারীর ক্ষমতায়নে অনন্য উচ্চতায় লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। আবার ২০০৩ সালের শিক্ষানীতিতে নারীশিক্ষা সম্পর্কে আধুনিক ও পশ্চাৎপদ উভয় ধারণার মিশেল ঘটানো হয় এবং ২০১০ সালে তথ্যপ্রযুক্তি খাতকে গুরুত্ব দিয়ে প্রণিত হয় নতুন শিক্ষানীতি। ১৯৭২-২০১০ সাল পর্যন্ত ক্ষমতাসীন সরকারগুলো যে ছয়টি শিক্ষানীতি প্রণয়ন করেছেন তার সবগুলোতেই নারীশিক্ষার প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। নারীশিক্ষার উন্নয়নকল্পে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে কিন্তু নারীশিক্ষার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যমাত্রা আজো অর্জিত হয়নি। কারণ নারীশিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে কতিপয় সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিবন্ধকতা এখনো রয়ে গেছে।

নারীরা দেশের মোট জনসংখ্যা এবং শ্রমশক্তির অর্ধেক হওয়া সত্ত্বেও শিক্ষা ক্ষেত্রে তারা পুরুষদের তুলনায় অনেকখানি পিছিয়ে। এ বৈষম্য কেবল সংখ্যাগত নয়-গুণগতও বটে। যদিও এক সময় নারী-পুরুষের শিক্ষার হারে ব্যাপক বৈষম্য ছিলো যেমন ১৯৭৪ সালে একটি গ্রাম সমীক্ষায় দেখা যায় শিক্ষিত পুরুষের হার ১১.৪ এবং মহিলার হার মাত্র ৩.১।[১] তবে সেই বৈষম্য এখন আর নেই। কিন্তু শিক্ষার মাধ্যমে একজন পরিপূর্ণ মানুষ হয়ে ওঠার পথে এখনো অনেক বাধা বিদ্যমান, যা সমতাপূর্ণ সামাজিক উন্নয়নের পথে অন্তরায়। আমরা জানি শিক্ষা ছাড়া নারী জাতি তথা দেশের সার্বিক উন্নয়ন কখনোই সম্ভব নয়। তাই সমতাপূর্ণ সামাজিক উন্নয়নের জন্য বৈষম্যের প্রতিকার অপরিহার্য। আলোচ্য প্রবন্ধে বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলের নারীশিক্ষার অনগ্রসরতার পিছনে বিদ্যমান সামাজিক-সাংস্কৃতিক বৈষম্য ও প্রতিবন্ধকতা সম্পর্কে আলোকপাত করাই মূল লক্ষ্য।

গবেষণার উদ্দেশ্য

১. বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলের পরিবার ও সমাজ-সংস্কৃতির নানান ক্ষেত্রে নারীশিক্ষার প্রতি যে বৈষম্যমূলক মনোভাব ও প্রবণতা রয়েছে তার ব্যাপ্তি চিহ্নিত করা; এবং

---

[১] ইয়েনেকা আরেন্স ও ইত্তস ফান ব্যুরদেন: *ঝগড়াপুর: গ্রামবাংলার গৃহস্থ ও নারী* (ঢাকা: গণ প্রকাশনী, ১৯৮০), পৃ,৩১।

২. নারীশিক্ষার প্রতি বিদ্যমান প্রতিবন্ধকতাসমূহ অনুসন্ধান করা।

গবেষণা পদ্ধতি

গবেষণাটিতে প্রাথমিক শিক্ষা, মাধ্যমিক শিক্ষা ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে অর্ন্তভুক্ত করা হয়েছে। উদ্দেশ্যমূলক নমুনায়নের মাধ্যমে রাজশাহী জেলার ৩টি থানাকে (গোদাগাড়ী, পবা ও তানোর) গবেষণার নমুনা এলাকা হিসাবে নির্বাচন করা হয়। এছাড়া গবেষণা এলাকা নির্বাচনের পেছনে যেসকল বিষয় বিবেচনা নেওয়া হয় তা হলো যোগাযোগ ব্যবস্থা (যেমন – সমতল ভূমি, চর অঞ্চল, সীমান্ত এলাকা, বরেন্দ্র অঞ্চল এবং শহরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান)। পৃথক বালক ও বালিকা এবং সহশিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ মোট ৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৮টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং ৫টি মহাবিদ্যালয়কে উদ্দেশ্যমূলকভাবে নির্বাচন করা হয়।

গবেষণাটির ক্ষেত্রে গুণগত ও পরিমাণগত তথ্য ও উপাত্ত ব্যবহার হয়েছে। এছাড়া তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রাথমিক ও মাধ্যমিক উভয় উৎস ব্যবহৃত হয়। মূলত গবেষণার বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে উদ্দেশ্যমূলক নমুনায়নের মাধ্যমে মোট ৫৫ জন নারী-শিক্ষার্থী ও ৬৪ জন পিতা-মাতাকে গ্রাম-শহর, ধনী-দরিদ্র, শিক্ষিত-নিরক্ষর, চাকুরিজীবী-কৃষক শ্রেণীর উপর ভিত্তি করে নির্বাচন করা হয়। এছাড়া প্রতি স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে লটারির মাধ্যমে একজন করে ১০ জন প্রধান শিক্ষক, উদ্দেশ্যমূলক নমুনায়নের মাধ্যমে প্রতি উপজেলা থেকে একজন করে ৩ জন সরকারি শিক্ষা কর্মকর্তা এবং গবেষিত এলাকায় যেসকল এনজিও শিক্ষা কার্যক্রম নিয়ে কাজ করে তাদের মধ্যে থেকে উদ্দেশ্যমূলক নমুনায়নের মাধমে ৫ জন এনজিও কর্মকর্তাকে গবেষণার তথ্যদাতা হিসাবে নির্বাচন করা হয়।

গবেষণাটি পরিচালনার জন্য নিবিড় সাক্ষাৎকার, প্রশ্নমালা এবং পর্যবেক্ষণ কৌশলের মাধ্যমে প্রাথমিক উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। সংগৃহীত বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত যাচাই, ক্রসচেক ও গবেষিত জনগোষ্ঠীর মতামত, বক্তব্য, পরামর্শ ও প্রস্তাবনা সংগ্রহের জন্য দলগত আলোচনা (FGD) আয়োজন করা হয়। ছাত্রীদের জন্য ক্লোজড প্রশ্নমালা এবং পিতা-মাতার ক্ষেত্রে প্রত্যেকের জন্য পৃথক পৃথক প্রশ্নমালা ব্যবহৃত হয়েছে। গবেষণাটিতে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা স্তরের অবস্থান ও অধ্যায়নরত শিক্ষার্থীদের তথ্য নেওয়া হয়েছে। এখানে বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিক্যাল, ইঞ্জিনিয়ারিং, মাদ্রাসা কিংবা কারিগরি শিক্ষার কোনো তথ্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। জাতিসংঘ ঘোষিত শিশু অধিকার সনদের অনুচ্ছেদ-১ অনুযায়ী ১৮ বছরের নীচে সকল মানব সন্তানকে শিশু বলা যাবে।[২] এখানে তাই ১৮ বছরের নীচের বয়সকে শিশু হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। "বৈষম্য" বিষয়টি সঠিকভাবে অনুধাবন করতে পারা নিয়ে প্রশ্ন থাকায় গবেষণাটিতে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্রীদের তথ্য নেওয়া হয়েছে কিন্তু তথ্যদাতা হিসাবে তাদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।

বাংলাদেশের নারীশিক্ষার বর্তমান অবস্থা

বাংলাদেশ তৃতীয় বিশ্বের একটি অন্যতম উন্নয়নশীল দেশ। দেশের মোট জনসংখ্যা প্রায় ১৫ কোটি ৭৯ লাখ।[৩] পুরুষ ও নারীভেদে এর আনুপাতিক বণ্টন ১০৪.৯ ঃ ১০০।[৪] আর ছাত্র-ছাত্রীর অনুপাত হলো ৪৯.৩ ঃ ৫০.৭ অর্থাৎ জনসংখ্যা ও শিক্ষার্থীর দিক থেকে নারী-পুরুষ প্রায় সমান।[৫] কিন্তু শিক্ষার দিক

---

[২] জাতিসংঘ: শিশু অধিকার সনদ, *জাতিসংঘ পকেট বুক* (ঢাকা, ১৯৯১), পৃ. ১৩।

[৩] *অর্থনৈতিক সমীক্ষা*, ২০১৫।

[৪] তদেব।

[৫] তদেব।

থেকে নারীরা পুরুষদের সমকক্ষ নয়। তবে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে প্রাথমিক পর্যায়ে ভর্তির ক্ষেত্রে ছেলে-মেয়ের সংখ্যায় ব্যাপক পার্থক্য নেই বরং মেয়েদের সংখ্যাই অধিক। কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষা, সমগ্র শিক্ষার প্রকৃত অবস্থানকে প্রতিফলিত করেনা। তাই প্রাথমিকে মেয়েদের ভর্তির হার বৃদ্ধি পেলেও সাথে সাথে তাদের ঝরে পড়ার হারও অধিক। যার ফলে শিক্ষায় সমতা থাকে না বরং মেয়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছেলেদের তুলনায় অনেক হ্রাস পায়। অন্যদিকে আবার বাংলাদেশের উচ্চ স্তরের শিক্ষা প্রতিযোগিতামূলক, প্রণোদনার মাত্রা কম এবং নারীকে মোকাবেলা করতে হয় অনেক প্রকারের সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় প্রতিবন্ধকতা। এসব কারণে প্রাথমিক পরবর্তী শিক্ষাক্ষেত্রে নারী-পুরুষ বৈষম্য বৃদ্ধি পায়।

বর্তমানে বাংলাদেশে স্বাক্ষরতার হার ৬৫.৫%, তন্মধ্যে সাক্ষর পুরুষ রয়েছে শতকরা ৫৪.৫৪ ভাগ এবং সাক্ষর নারী রয়েছে শতকরা ৪৮.৪১ ভাগ।[৬] গ্রাম বাংলায় এই হার আরো উদ্বেগজনক; পরিসংখ্যান থেকে জানা যায় যে, ১৯৬১ সালে পাঁচ বছর বা তার উর্ধ্বে গ্রাম বাংলায় নারীশিক্ষার হার ছিলো শতকরা ১৪.৯ ভাগ। আবার ১৯৯১ সালে তা দাঁড়ায় শতকরা ১৬.৭% ভাগে সুতরাং ১৯৬১ থেকে ১৯৯১ সাল পর্যন্ত এই ৩০ বছরে নারীশিক্ষার প্রবৃদ্ধির হার মাত্র শতকরা ১.৮ ভাগ।[৭] তবে এরপর থেকে নারীশিক্ষার হার বৃদ্ধি পেয়েছে, যেমন – ২০০১ থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত নারীশিক্ষার হার বাৎসরিক ৩.৫৭% বৃদ্ধি হারে শতকরা ৪০.৮ ভাগ থেকে শতকরা ৫৩.৯ ভাগে উন্নীত হয়।[৮]

রজাশাহী জেলার প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে মেয়ে শিক্ষার্থীর অবস্থান

গত দুই দশকে রাজশাহী জেলা প্রাথমিক শিক্ষায় মেয়েদের ভর্তিতে গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য অর্জন করেছে। তবে উদ্বেগের বিষয় মেয়ে শিক্ষার্থী ঝরে পড়ার হারও অনেক বেশি। এক্ষেত্রে সরকারি নানা উদ্যেগের পাশাপাশি বেসরকারি সংস্থা তাদের শিক্ষা বিষয়ক কর্মসূচিতে দরিদ্র ও ঝরে পড়া শিশুদের উপর গুরুত্ব আরোপ করছে, যেখানে মেয়ে শিশুরা বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে। যেমন – উপানুষ্ঠানিক পদ্ধতিতে পরিচালিত এসব বিদ্যালয়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রে দুই-তৃতীয়াংশ মেয়ে শিশু ভর্তি করা হয়, যা অধিক সংখ্যক মেয়ে শিশুর প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। এরূপ গঠনমূলক উদ্যোগের ফলে মেয়ে শিশুদের ঝরে পড়ার হার ধীরে ধীরে কমে আসছে। তবে এখন পর্যন্ত তা একেবারে বিলুপ্ত হয়নি। আবার মেয়ে শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়া রোধের এই হারও যথেষ্ট নয়, কারণ এই হার অব্যাহত থাকলে সরকারের ২০১৫ সালের মধ্যে ঝরে পড়ার হার ৫% নীচে নিয়ে আসার যে পরিকল্পনা রয়েছে তা বাস্তবায়ন হবে না। তাই ঝরে পড়ার হার আরো কমাতে হবে। তবে আশার বিষয় শিক্ষাক্ষেত্রে মেয়েদের জন্য বাজেট বৃদ্ধি, বিনামূল্যে প্রাথমিক শিক্ষা, বিপুল পরিমাণ উপবৃত্তি, খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষাসহ আরো কতিপয় সরকারি কার্যক্রম গ্রহণের ফলে প্রাথমিক শিক্ষায় মেয়েদের অংশগ্রহণ বেড়েছে। ফলে গত কয়েক বছরের তুলনায় শিক্ষার্থী ঝরে পড়ার হারও অনেক কমে গেছে। এছাড়া সামাজিক-সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ, ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি, অভিভাবকদের শিক্ষা এবং তাদের আয় বৃদ্ধি শিক্ষার্থী ঝরে পড়া রোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

---

[৬] Bangladesh Bureau of Statistics, *Basic Education Statistics* (Dhaka: BBS, 2011), p. 22.

[৭] শর্মিষ্ঠা রায়, "সামাজিক প্রেক্ষাপটে গ্রাম বাংলার নারী শিক্ষার অন্তরায়," *ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ জার্নাল, ৫ম সংখ্যা* (১৯৯৮), পৃ. ৭৭।

[৮] *অর্থনৈতিক সমীক্ষা*, ২০১৫।

গত কয়েক বছরে প্রাথমিক শিক্ষার মতো মাধ্যমিক স্তরেও ছাত্রী ভর্তির হার বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে ২০০১ থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত ছেলেদের তুলনায় এ হার ওঠানামা করে। ২০১৫ সালে রাজশাহী জেলায় মোট মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৫৮১টি। এর মধ্যে মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় ১২২টি। ৫৮১টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১৮৫৭৬৩ আর মেয়ে শিক্ষার্থী হলো ৯৭৯৪৮ জন যা শতকরা ৫২.৭৩ ভাগ।[৯] মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা ব্যবস্থা ব্যয়বহুল হওয়ার কারণে মেয়েদের ঝরে পড়ার হারও প্রত্যাশিত হারের চেয়ে অনেক বেশি। তবে সরকারের কতিপয় গঠনমূলক উদ্যেগের ফলে যেমন – বিনামূল্যে পড়ালেখা এবং দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত বিনামূল্যে বই বিতরণসহ লিঙ্গ বান্ধব সিলেবাস হওয়ায় মেয়েদের ভর্তি সংখ্যা বৃদ্ধি পায়।

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের মতোই উচ্চ মাধ্যমিক স্তরেও মেয়ে শিক্ষার্থী ভর্তির হার বৃদ্ধি পেয়েছে। বাৎসরিক ১.৫৭% বৃদ্ধি হারে ২০০১ থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত মেয়েদের ভর্তির হার দাঁড়ায় ৪১.৬৪% থেকে ৪৪.৯০%।[১০] তবে উল্লিখিত সময়ে ছেলেদের ভর্তির হার কমে আসে, এর ফলে উচ্চ মাধ্যমিকে ছেলে ও মেয়ে শিক্ষার্থীর পার্থক্য কমে আসে। রাজশাহী জেলায় মোট ১৬৫টি কলেজের মধ্যে মহিলা কলেজ মাত্র ৩২টি। ২০১৪ সলে ১৬৫টি কলেজে ৮৮৫৮৫ জন শিক্ষার্থী ভর্তি হয় যার মধ্যে মেয়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিলো ৪০৭২৩ জন অর্থাৎ শতকরা ৪৬ ভাগ।[১১] তবে সামাজিক-সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ ও অভিভাবকদের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের কারণে প্রতিবছর মেয়ে শিক্ষার্থীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

নারীশিক্ষায় সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রতিবন্ধকতা

পিতা-মাতার প্রত্যাশা

বাংলাদেশে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সন্তানেরা পিতা-মাতার উপর নির্ভরশীল। অনুরূপভাবে বৃদ্ধবয়সে পিতা-মাতাও ভরণপোষণ ও নিরাপত্তার জন্য সন্তানের উপর নির্ভরশীল ফলে উভয়ের একপ্রকার নির্ভরশীলতার স্বার্থ আছে। এখন প্রশ্ন হলো পিতা-মাতার স্বার্থ কার দ্বারা পূরণ হবে, ছেলে না মেয়ের দ্বারা? আমাদের সামাজিক রীতি অনুযায়ী মেয়েরা বিয়ে করে শ্বশুরবাড়ি যায়, স্বামীর সংসার করে, নতুন সংসারকে নিজের করে নেয়। যে মেয়ে এ কাজটি করতে পারে সে-ই "আদর্শ মেয়ে,"[১২] সুতরাং পিতা-মাতার দায়িত্ব বহনের সুযোগ কোথায়? অপরপক্ষে, বৃদ্ধ বয়সে পিতা-মাতার ভরণপোষণ ও নিরাপত্তার দায়িত্ব এবং বংশের উত্তরাধিকার ছেলে সন্তানকেই বহন করতে হয়। মূলত এ নির্ভরশীল সম্পর্কের জন্য পিতা-মাতার আশা-ভরসার স্থল পুত্রসন্তান, এটি সামাজিক বাস্তবতা।

গবেষণায় দেখা যায় যে, অধিকাংশ পিতা-মাতাই প্রথম সন্তান আশা করেছিল ছেলে। মেয়ে-সন্তানকে মানুষ করা ও বিয়ে দেওয়ার ঝামেলা থাকে আর "বৃদ্ধ বয়সে ভরণপোষণ, নিরাপত্তা পাওয়ার আশা এবং বংশ রক্ষা করা" প্রভৃতি কারণে পিতা-মাতার আকাঙ্ক্ষা থাকে ছেলে-সন্তানের। ছেলে-সন্তান প্রাপ্তির এই তীব্র আকাঙ্ক্ষাই মেয়ে-সন্তানের প্রতি বৈষম্য সৃষ্টির অন্যতম কারণ। এই মানসিকতা থেকেই সন্তান প্রতিপালনের প্রতিটি পর্যায়ে অর্থাৎ সন্তানের পোশাক-পরিচ্ছদ, খাদ্য বণ্টন, চিকিৎসা

---

[৯] *Bangladesh Bureau of Educational Information and Statistics, 2014.*

[১০] *বিবিএস ২০১১।*

[১১] *Bangladesh Bureau of Educational Information and Statistics, 2014.*

[১২] আনোয়ার হোসেন, *মেয়ে-শিশু: সামাজিক বৈষম্য, ধরন ও প্রভাব* (ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ২০০৫), পৃ. ১৯।

সর্বোপরি শিক্ষাক্ষেত্রে কন্যাসন্তান পুত্রসন্তান অপেক্ষা কম প্রাধান্য পায়।[১৩] পিতা-মাতার নিকট পুত্রসন্তান সম্পদ এবং কন্যাসন্তান বিপদ বা দায় হিসেবে বিবেচিত।[১৪] তাই নারীশিক্ষার প্রতি অভিভাবকদের গুরুত্ব কম। নারীর প্রতি এই ধরনের মানসিকতাই আমাদের দেশে বিশেষ করে গ্রাম বাংলায় নারীশিক্ষার পশ্চাৎপদতার জন্য অনেকাংশে দায়ী।

দরিদ্রতা

বাংলাদেশে নারীশিক্ষার অন্যতম অন্তরায় হলো দারিদ্র্য। পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার কারণে মেয়েরা যেসকল বৈষম্যের শিকার হয় সেগুলোকে ব্যাপকতা দেয় দরিদ্রতা।[১৫] দরিদ্রতা শিক্ষা অর্জনের প্রতিবন্ধকতাসমূহের মধ্যে অন্যতম। সরকারের লক্ষ্য ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নতি করা। কিন্তু বর্তমানে বাংলাদেশে ২৪.৩% দারিদ্র্য সীমার নীচে বসবাস করছে।[১৬] দরিদ্র পরিবারগুলো খাদ্য ও পোশাকের মতো মৌলিক চাহিদাগুলো পূরণ করতে হিমশিম খায়, তাদের কাছে শিক্ষাতো বিলাসিতা তুল্য। তখন তারা শিক্ষা খাতের বরাদ্দ কেটে খাদ্য, স্বাস্থ্য কিংবা পোশাকের মতো চাহিদাগুলো পূরণ করে। আবার অস্বচ্ছল পরিবারগুলো প্রয়োজনের তাগিদেই তাদের সন্তানদের ছোটবেলা থেকেই কাজে পাঠায় যা শিশুশ্রম নামে পরিচিত।[১৭] ছেলেদের কৃষিকাজ ছাড়াও, হোটেল বয়, মুদি-দোকানের কর্মচারী, টেম্পুর হেল্পার ও বিভিন্ন গ্যারেজের হেল্পার হিসাবে কাজ করাই। আর মেয়েদের ঝিয়ের কাজ, কুটির শিল্পের কাজ কিংবা গার্মেন্টসের শ্রমিক হিসাবে কাজে লাগাচ্ছে। প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করার পর সাধারণত মেয়েরা দরিদ্র্যতার কারণে বিভিন্ন জায়গায় কাজে লেগে যায়। অধিকাংশ দরিদ্র পরিবারের সন্তানেরা প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করতে পারলেও মাধ্যমিক স্তরে মেয়েদের একটি উল্লেখযোগ্য সংখ্যা ঝরে যায়। কারণ প্রাথমিক শিক্ষার চেয়ে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা অনেক বেশি ব্যয়বহুল। প্রাইভেট, শিক্ষকের বেতন, কোচিং, নোটবই, কলম, খাতা, যোগাযোগ এবং স্কুল ড্রেসের ব্যয় বহন করা দরিদ্র পরিবারের পক্ষে অত্যন্ত কষ্টকর। মূলত দরিদ্রতার কারণেই সকল পরিবারের পক্ষে ছেলে-মেয়ে উভয়কে সমানভাবে মানুষ করা সম্ভব হয় না; তখন অগ্রাধিকারের প্রশ্ন আসে। সামাজিক বাস্তবতায় অগ্রাধিকার পায় ছেলে আর বঞ্চিত হয় মেয়েরা। যা মেয়েদের শিক্ষায় পিছিয়ে পড়ার অন্যতম কারণ।

সারণি ১-এ দেখা যায়, নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্ত পরিবারের অধিকাংশ পিতা-মাতাই তাদের মেয়েদেরকে ভালো বিয়ে দেওয়া যাবে এই উদ্দেশ্যে পড়ালেখা করায়। কিন্তু ছেলেরা যেন শিক্ষিত হয়ে ভালোভাবে কর্মজীবনে প্রবেশ করতে পারে সেই উদ্দেশেই তাদেরকে পড়ালেখা করাতে চান। 'ভালো বিয়ে দেওয়া যাবে' এ উদ্দেশ্যে ছেলেদের পড়ালেখা করায় এমন একটিও মধ্যবিত্ত পরিবার পাওয়া যায়নি। এ থেকে এটি স্পষ্ট যে, নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্ত পরিবারে ছেলে ও মেয়ের শিক্ষার প্রতি দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্য চরম বৈষম্যমূলক। উচ্চবিত্ত পরিবারে লেখাপড়া করানোর ক্ষেত্রে ছেলে-মেয়ের মধ্যে বৈষম্য নেই তবে লেখা-পড়া করানোর উদ্দেশ্য নিয়ে পার্থক্য রয়েছে। যেমন সংখ্যায় কম হলেও

---

[১৩] Rafiqul Huda Chaudhury & Nilufar Raihan Ahmed, *Female Status in Bangladesh* (Dhaka: BIDS, 1980), পৃ. ১২।

[১৪] হীরালাল বালা, "বাংলাদেশের দরিদ্র : অতীত ও বর্তমান, সমস্যা ও সমাধান" *বাংলাদেশ লোক প্রশাসন পত্রিকা*, ৪র্থ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ১৩৯৭ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৪২।

[১৬] *অর্থনৈতিক সমীক্ষা*, ২০১৫।

[১৭] তদেব।

কিছু সংখ্যক পরিবার চায় তাদের কন্যা লেখাপড়া শিখে একজন ভালো গৃহিণী হবে। পক্ষান্তরে কোনো অভিভাবকই ছেলেকে একজন ভালো সংসারী ব্যক্তি বানাতে চান না। এ পার্থক্য দৃষ্টিভঙ্গিগত যা পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার ফল।

সারণি ১

সচ্ছল-দরিদ্র পরিবারে মেয়েদের লেখাপড়া সম্পর্কে অভিভাবকদের দৃষ্টিভঙ্গি

আপনার মেয়েকে কতটুকু লেখাপড়া করাতে চান	উচ্চবিত্ত			মধ্যবিত্ত			নিম্নবিত্ত		
	গ্রাম	শহর	মোট	গ্রাম	শহর	মোট	গ্রাম	শহর	মোট
প্রাথমিক শ্রেণী পর্যন্ত	০	০	০	১	০	১	৪	৩	৭
	০	০	০	৪.৫৪	০	৪.৫৫	১৯.০৫	১৪.২৮	৩৩.৩৩
মাধ্যমিক শ্রেণী পর্যন্ত	০	০	০	৫	২	৭	৫	৪	৯
	০	০	০	২২.৭২	৯.০৯	৩১.৮২	২৩.৮১	১৯.০৪	৪২.৮৬
উচ্চশিক্ষা দিতে চাই	১১	১০	২১	৫	৯	১৪	২	৩	৫
	৫২.৩৮	৪৭.৬২	১০০	২২.৭২	৪০.৯০	৬৩.৬৩	৯.৫২	১৪.২৮	২৩.৮১
মোট উত্তরদাতা	১১	১০	২১	১১	১১	২২	১১	১০	২১
মেয়েকে উচ্চশিক্ষা প্রদানের কারণ?	উচ্চবিত্ত			মধ্যবিত্ত			নিম্নবিত্ত		
	গ্রাম	শহর	মোট	গ্রাম	শহর	মোট	গ্রাম	শহর	মোট
ভালো বিয়ে দেয়া যাবে	১	২	৩	৭	৪	১১	৮	৪	১২
	৪.৭৬	৯.৫২	১৪.২৮	৩১.৮১	১৮.১৮	৪৯.৯৯	৩৮.০৯	১৯.০৪	৫৭.১৪
ভালোভাবে কর্মজীবনে প্রবেশ করতে পারবে।	১০	৮	১৮	৩	৮	১১	৩	৬	৯
	৪৭.৬২	৩৮.০৯	৮৫.৭২	১৩.৬৪	৩৬.৩৬	৪৯.৯৯	১৪.২৮	২৮.৫৭	৪২.৮৬
মোট উত্তরদাতা	১১	১০	২১	১০	১২	২২	১১	১০	২১

উৎস: ক্ষেত্রসমীক্ষা

পিতা-মাতার শিক্ষার অভাব

শিক্ষা মানুষের বিশ্লেষণী ক্ষমতাকে বৃদ্ধি করে। শিক্ষিত লোকের আত্মসচেতনতা ও সমাজ-সচেতনতা গভীর হয়, সাথে সাথে ব্যক্তিত্ববোধও উন্নত হয়। এছাড়া শিক্ষা মানুষের মানবিক মূল্যবোধ গড়ে তোলে, যৌক্তিক ও ন্যায্য আচরণ করতে শেখায়। আর নিরক্ষরদের নিত্যসঙ্গী হলো কুসংস্কার ও গোঁড়ামি। নিরক্ষর পিতা-মাতার প্রভাবে মেয়েরা বিভিন্ন প্রকার বৈষম্যের শিকার হয় বিশেষ করে শিক্ষাক্ষেত্রে। নিরক্ষর পিতামাতারা তাদের মেয়ে সন্তান শিক্ষিত হলে ভবিষৎতে যে লাভ তা তারা হিসাব করতে পারে না। তারা মেয়েদের শিক্ষাকে বোঝা মনে করে। তাছাড়া বিয়ের পর মেয়েরা যেহেতু স্বামীর সংসারে থাকবে তাই নিরক্ষর অভিভাবকরা তাদের মেয়েদের লেখা-পড়ার চেয়ে বিয়ের দিকে মনোযোগী বেশি।

বর্তমান গবেষণাতেও অভিভাবকদের শিক্ষার প্রভাব স্পষ্টভাবে দেখা যায়। উচ্চশিক্ষিত পিতা-মাতারা তাদের ছেলে ও মেয়ে উভয় সন্তানকে উচ্চশিক্ষা দিতে চান। কিন্তু নিরক্ষর সকল পিতা-মাতা তাদের মেয়েকে উচ্চশিক্ষা দিতে চান না। বাস্তবিক অর্থেই অভিভাবকদের শিক্ষার অভাব মেয়েদের শিক্ষার প্রতি প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে।

নারীশিক্ষায় বাল্যবিবাহ ও যৌতুকের প্রভাব

বাংলাদেশে বিশেষ করে গ্রাম বাংলার নারীশিক্ষার পশ্চাৎপদতার পেছনে বাল্যবিবাহ ও যৌতুক প্রথা অনেকাংশে দায়ী। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দরিদ্র পরিবারগুলোর মধ্যে বাল্যবিবাহ বেশি হয়। গ্রাম ও শহরের বিশেষ একটি জনগোষ্ঠী এই দরিদ্রতার শিকার। তবে সবসময়ে দরিদ্রতা বাল্যবিবাহের একমাত্র কারণ নয়, সামাজিক অসচেতনাও বাল্যবিবাহের অন্যতম কারণ। দরিদ্র কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা অভাব ও সামাজিক নিরাপত্তাহীনতার জন্য দ্রুত কন্যাকে বিয়ে দিতে চান। বাংলাদেশের মোট জনগোষ্ঠীর ৪৫ শতাংশ ১৮ বছরের কম বয়সী, যাদের ৪৮ শতাংশই কন্যাশিশু আর ৬৬ শতাংশ কন্যাশিশুর ১৮ বছরের আগেই বিয়ে হচ্ছে।[১৮] বিয়ের পর স্বামীর সংসারে চলে যাওয়ার কারণে অনেক মেয়ে শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়ে সংসারের ঘানি টানছে। লেখা-পড়ার সময় বিয়ে হওয়ার কারণে তারা শিক্ষা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে।

সারণি ২

বাংলাদেশের মেয়েদের বিয়ের গড় বয়স

বছর	জাতীয়	গ্রামীণ	শহর
২০০৭	২০.৪	২০.১	২১.৩
২০০৮	২০.৬	২০.৪	২১.৪
২০০৯	২০.৪	২০.২	২১.৫
২০১০	১৯.০	১৮.৯	১৯.৯
২০১১	১৭.৯	১৭.৮	১৮.৮
২০১২	১৮.১	১৭.৯	১৯.০
২০১৪	১৮.৪	১৮.১	১৯.৪

সূত্র: *বিবিএস ২০১৪*

[১৮] "নিরাপত্তাগত আশঙ্কাতেই কিশোরীদের বিয়ে," *প্রথম আলো*, ১২ অক্টোবর ২০১৫, পৃ. ২০।

বাল্যবিবাহ ছাড়াও মেয়েদের শিক্ষার অন্তরায় হিসেবে যৌতুক প্রথা অনেকাংশে দায়ী। আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় যৌতুক এক ভয়াবহ সামাজিক ব্যাধি। যৌতুকের জন্য মেয়ের পরিবার চরম ভোগান্তির শিকার হয়। ধনী পিতা-মাতারা যৌতুকের চাহিদা পূরণ করে মেয়ের বিয়ে দিতে পারলেও দরিদ্র পিতা-মাতারা জমি-জমা বিক্রি করেও রক্ষা পায় না। অনেক সময় ঋণ নিয়ে সর্বস্বান্ত হয়ে পড়ে। আর যে সকল পরিবারে একাধিক মেয়ে বিয়ের উপযুক্ত থাকে তাদের দুশ্চিন্তার শেষ থাকে না। কারণ মেয়ে শিক্ষিত হলে তাকে উপযুক্ত পাত্রের সাথে বিয়ে দিতে মোটা অঙ্কের যৌতুক লাগে। আমাদের সামাজিক বাস্তবতায় ছেলের অভিভাবকরা মনে করে ছেলেকে শিক্ষিত করতে অনেক টাকা খরচ হয়েছে, তাই ছেলের বিয়ে দিয়ে সেই টাকা উসুল করতে হবে। পক্ষান্তরে মেয়ে যদি প্রাথমিক শিক্ষায় জ্ঞান সম্পন্ন হয়, তাহলে তাকে যে কোনো গৃহস্থ ঘর দেখে বিয়ে দেওয়া যাবে, আর যৌতুকও কম লাগে। তাই দরিদ্র অভিভাবকরা আর্থিক লাভ-ক্ষতির হিসাব করেই তাদের মেয়েকে উচ্চশিক্ষা প্রদান থেকে বিরত রাখে।[১৯] যা মেয়েদের লেখাপড়ার প্রতিবন্ধকতা হিসেবে বিবেচিত। গবেষণায় দেখা যায় ৫৫ জন মেয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে ১৮ বছরের আগেই বিয়ে হয়েছে ১৩ জনের অর্থাৎ ২৩.২৪%। এই ১৩ জনের মধ্যে ৫জন বিভিন্ন স্তরে পড়া-লেখা করলেও বাকি ৮ জনের লেখা-পড়া বন্ধ হওয়ার উপক্রম। পারিবারিক বাঁধা না থাকলেও মেয়েদের শ্বশুর বাড়ির সংসারের কাজ করার পর পড়ালেখা নিয়মিত চালিয়ে যাওয়া অত্যন্ত কষ্টকর।

পিতৃতান্ত্রিক পরিবার কাঠামো ও নারীশিক্ষা

সকল শিশুই জাতির ভবিষ্যৎ। তাই তাদেরকে সবদিক দিয়ে উপযুক্ত করে গড়ে তোলা একান্তই কর্তব্য। পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় সবকিছুই ছেলে পক্ষে পরিচালিত হয়। কারণ পিতার উত্তরাধিকার হিসাবে পুত্রই প্রতিনিধিত্ব করবে এবং পিতা-মাতাকে বৃদ্ধ বয়সে খাওয়াবে ও নিরাপত্তার দয়িত্ব নেবে। সঙ্গতকারণে পুত্রকে সেভাবে গড়ে তোলা হয়। আর মেয়েরা বিয়ের স্বামীর সংসারে চলে যাবে, তাই তাদেরকে সেভাবে গড়ে তোলা হয়। ছেলে ও মেয়ে-সন্তান থেকে পিতা-মাতার প্রত্যাশার এই যে ভিন্নতা তা-ই সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার ভালোবাসা, মনোভাব ও আচার-আচরণকে প্রভাবিত করে। গবেষণাই তাই দেখা যায় যে, পরিবারে ছেলে সন্তানেরা-মেয়ের তুলনায় অগ্রাধিকার পেয়ে থাকে। পরিবারের একটি বড়ো কাজ হলো শিশুর সামাজিকীকরণ। কিন্তু গবেষণা এলাকার পরিবারগুলো পিতৃতন্ত্রের আদর্শানুসারে গড়ে তোলে পুত্র-কন্যাদের। জন্মের পর থেকে শুরু হয় পুত্রকে পুরুষ আর কন্যাকে নারীরূপে দ্বিতীয় জন্ম দেওয়া; এবং নারী ও পুরুষ হয়ে ওঠে দুই সংস্কৃতির অধিবাসী।[২০] আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় মেয়েদেরকে বোঝা বলে মনে করা হয়। তাই আর্থ-সামাজিক অবস্থাসহ শিক্ষাক্ষেত্রে তারা ছেলেদের তুলনায় নীচে অবস্থান করছে। এর পশ্চাতে রয়েছে গ্রামীণ মানুষের মন-মানসিকতা, সনাতনী ঐতিহ্য ও বাস্তব উপযোগিতা। কারণ মেয়ের বিয়ের উপযুক্ত বয়স হলেই তাদের বিয়ে দিয়ে স্বামীর ঘরে পাঠিয়ে দেয়া হয়। তাদের সকল দায়ভার ও উপার্জন স্বামীর ঘরে যায়। ফলে পিতার পরিবারের সাথে তার সম্পর্ক হয় গৌণ। এছাড়া শিক্ষা গ্রহণ করতে গেলে মেয়ের বয়স বেড়ে যায়, যা বিয়ের ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলে। উপরন্তু শিক্ষিত মেয়ের উপযুক্ত শিক্ষিত পাত্র এলাকায় খুব কম পাওয়া যায়, ফলে মেয়েকে পাত্রস্থ করা জটিল হয়। আবার অধিক বয়সে বিয়ে না হলে তাদের আইবুড়ি বলে তিরস্কার করা হয় এবং এতে বাবা-মার সামাজিক অবস্থান ক্ষুণ্ন হয়। এরূপ অবস্থায়

---

[১৯] Abdus Sattar, *Universal Education in Bangladesh* (Dhaka: University Press, 1975), পৃ. ৪৪।

[২০] হুমায়ুন আজাদ, *নারী* (ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ২০১০), পৃ. ৩১।

অভিভাবকরা মেয়ের শিক্ষার জন্য অর্থ ব্যয় করা যৌক্তিক ও লাভজনক মনে করে না। এছাড়া গ্রামীণ এলাকার অনেক অশিক্ষিত মানুষের ধারণা যে, মেয়েরা লেখাপড়া শিখলে ভালো গৃহিণী হয় না। কারণ তাদের মধ্যে যুক্তিবোধ, স্বাধীনতা, অধিকারের চেতনাবোধ জন্মায়; যার ফলে স্বামীর প্রতি অবাধ্য হয়। তাই অনুগত গৃহিণী তৈরি করতে নারীকে শিক্ষা থেকে দূরে রাখার কৌশল বেশ কার্যকর। মূলত পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা ও মেয়েদের অধীনস্থ মানসিকতা এই পরিস্থিতির জন্য দায়ী। পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার কারণে পরিবারে মেয়েদের মতামতের গুরুত্ব খুব কম, সাধারণত পুরুষরাই সার্বিক বিষয়ে মতামত দেয়। আর পিতৃতান্ত্রিক মতামত ও মূল্যবোধগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রে মেয়েদের শিক্ষা গ্রহণের পক্ষে অন্তরায়। গবেষণাকৃত এলাকায় এর সত্যতা পাওয়া যায়। যেমন – ১৩ জন মেয়ে শিক্ষার্থীর ১৮ বছরের আগে বিয়ে হলেও একজন ছেলে সন্তানেরও বাল্যবিবাহ কিংবা লেখাপড়া অবস্থায় বিয়ে হয়নি। ২৩.২৪% মেয়েদের বাল্যবিবাহ হলেও ছেলেদের বাল্যবিবাহ সামাজিক তিরস্কার হিসাবে গণ্য। এমনকি অধিক বয়সে মেয়েদের বিয়ে না হলে আইবুড়ি শুনতে হলেও ছেলেদেরকে আইবুড়ো বলে তিরস্কার করা হয় না।

অপ্রতুল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা

এটি গ্রামাঞ্চলে নারীশিক্ষার অনগ্রসরতার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। বাংলাদেশ পৃথিবীর অন্যতম জনবহুল দেশ। জনসংখ্যার তুলনায় এদেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বল্পতা রয়েছে। কারণ যে অনুপাতে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে সে অনুপাতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বৃদ্ধি পাচ্ছে না। ২০১৪ সালে রাজশাহী জেলায় ২৭৭৫৬০৭ জন জনসংখ্যার বিপরীতে ৫৮১টি মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থাকলেও কলেজের সংখ্যা মাত্র ১৬৫টি। প্রতিটি কলেজের জন্য শিক্ষার্থী সংখ্যা হলো ১৬৮২২ জন। যা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অপ্রতুলতাকে চিহ্নিত করে। আবার মেয়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৮৮৫৮৫ জন অর্থাৎ ৪৬ ভাগ অর্থাৎ প্রায় অর্ধেক হলো মেয়ে শিক্ষার্থী।[২১] গোদাগাড়ী থানার দুটি চর যেখানে প্রাথমিক বিদ্যালয় থাকলেও কোনো প্রকার মাধ্যমিক বিদ্যালয় কিংবা কলেজ নেই। ফলে এই সব স্থানের ছেলেমেয়েরা মাধ্যমিক কিংবা কলেজে পড়তে চাইলে তাদেরকে পদ্মা নদী পার হয়ে গোদাগাড়ী থানা সদরে আসতে হয়। এছাড়া চর অঞ্চলের বিদ্যালয়গুলো শুধু যে দূরে অবস্থিত তা নয়, অধিকাংশ বিদ্যালয়ের যোগাযোগ ব্যবস্থা অত্যন্ত অনুন্নত। যার কারণে রাস্তাঘাট বিশেষ করে বর্ষাকালে তা চলাচলের অনুপযোগী হয়ে পড়ে।[২২] এ সময়ে ছেলেরা কষ্ট করে হলেও বিদ্যালয়ে যায় কিন্তু মেয়েদের উপস্থিতির হার কমে যায়। পরবর্তীতে তারা যখন ক্লাসে আসে তখন তারা পড়া ঠিকমতো অনুসরণ করতে পারে না। ফলে পড়ার প্রতি আগ্রহ হারিয়ে তারা চিরতরে বিদ্যালয় ছাড়ে। গবেষণায় দেখা যায় যে, গবেষিত ৩টি থানার মধ্যে গোদাগাড়ীর চর এলাকার মেয়ে শিক্ষার্থীদের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে ঝড়ে পড়ার হার সবচেয়ে বেশি। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা মেয়েদের শিক্ষা গ্রহণের পথে অন্তরায়।

প্রান্তিক নারীদের শিক্ষায় প্রতিবন্ধকতা

প্রান্তিকতার সংজ্ঞা মূলত প্রেক্ষাপট নির্ভর। প্রান্তিকতার ধরন ও বৈচিত্র্য সময় এবং স্থানাভেদে বিভিন্ন রকম হলেও বর্তমান লেখায় প্রান্তিক নারী বলতে যারা মেয়ে হিসাবে নানা দিক দিয়ে বঞ্চনা ও সুবিধাহীনতার শিকার তাদেরকে চিহ্নিত করা হয়েছে। এছাড়া যাদের জন্য সমাজ বা রাষ্ট্রপ্রদত্ত সুযোগ-

---

[২১] *Bangladesh Bureau of Educational Information and Statistics, 2014.*

[২২] Kazi Saleh Ahmed, *Primary Education in Rural Bangaldesh* (Dhaka: Centre for Administrative Studies, 1978), পৃ. ৮৬।

সুবিধাসমূহ অপ্রতুল কিংবা নেই আর এ কারণেই যারা নিজেদের বিকশিত করতে সমর্থ হচ্ছে না, তাদেরকে এই লেখায় প্রান্তিক বলে ধরা হয়েছে। ফলে তারা স্বাভাবিক প্রান্তিকতার মধ্যে না পড়লেও পরোক্ষভাবে তাদের প্রান্তিকতার শিকার হতেই হয়। এই প্রেক্ষিতে বাংলাদেশে ছেলেদের তুলনায় সার্বিকভাবে মেয়েরা এখনো প্রান্তিকতার শিকার। শিক্ষার দিক দিয়ে গবেষণাধীন গোদাগাড়ী থানার চর অঞ্চল ও তানোর থানার বরেন্দ্র এলাকার মেয়ে শিশুরা প্রান্তিকতার শিকার।

চর অঞ্চলের মানুষজন বছরের অধিকাংশ সময়ে পানিবন্দী অবস্থায় বাস করে। বর্ষাকালে নৌকায় যাতায়াত করতে পারলেও শীতকালে যাতায়াতে প্রচণ্ড কষ্ট হয়, যার প্রভাব পড়ে শিক্ষার উপর। গোড়াগাড়ীর দুটি চর অঞ্চলে ৩টি প্রাথমিক বিদ্যালয় থাকলেও কোনো মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কলেজ নেই। অর্থাৎ প্রতি চার/পাঁচ গ্রামের জন্য একটি করে প্রাথমিক বিদ্যালয়। তাই যে গ্রামে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নেই সেই গ্রামের শিক্ষার্থীদের অন্য গ্রামে গিয়ে পড়ালেখা করা অত্যন্ত কষ্টকর এবং অধিকাংশ সময়ে সম্ভবপর হয় না। তাছাড়া প্রতিবছর পদ্মা নদী ভাঙনের ফলে বাড়ি-ঘর স্থানান্তর ও অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগে পড়ালেখা ব্যহত হয়। তাই গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় থাকলে এবং পিতা-মাতার আগ্রহ থাকলে মেয়েরা সেখানে বড়োজোর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পড়ার সুযোগ পায়, সে সুযোগ মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের ক্ষেত্রে খুব কম।

প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মধ্যে আদিবাসী উল্লেখযোগ্য। তানোর থানার বরেন্দ্র অঞ্চলে সাঁওতাল, ওরাঁও, মুণ্ডা, পাহাড়িসহ উল্লেখযোগ্য আদিবাসীর বসবাস। আদিবাসীদের শিক্ষার ক্ষেত্রে অন্যতম প্রতিবন্ধকতা হলো ভাষা ও যোগাযোগ মাধ্যম। তাদের নিজস্ব ভাষা থাকা সত্ত্বেও প্রায় সবক্ষেত্রেই তাদেরকে বাংলা মাধ্যমে পড়ালেখা করতে হয়। নিজস্ব ভাষায় জ্ঞানার্জন করতে না পারার ফলে অনেক আদিবাসী শিশু পড়ালেখার প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। যা শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা হিসাবে কাজ করে।

ইভটিজিং

সাম্প্রতিক সময়ে শিক্ষায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির অন্যতম উপাদান ইভটিজিং। বর্তমানকালে সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সহিংসতা, ছাত্রী ধর্ষণ, যৌন হয়রানি চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে। সাধারণভাবে মানুষ যা ভাবেনি গণমাধ্যমে তা প্রকাশিত হওয়ার মাধ্যমে নারী সহিংসতার বিভিন্নতা স্পষ্ট হয়েছে। সমাজে পথ চলায় নারীর নিরাপত্তা বিঘ্নিত হচ্ছে। ছিনতাইকারীর ভয় ছাড়াও ইভটিজিং হিসাবে বিভিন্ন শ্রেণী ও পেশার মানুষের আচরণ, চাহনি, অযাচিত ইঙ্গিত, অযাচিত স্পর্শ, কুৎসিত এবং কুরুচি ভাষার প্রয়োগ ও টিপ্পনি উল্লেযোগ্য। ইভটিজিংকে কেন্দ্র করে কিছু মেয়ের আত্মহত্যা সমস্যাটিকে জাতীয় ইস্যুতে পরিণত করেছে। এছাড়া এটি দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।[২৩] ইভটিজিং-এর কারণে অভিভাবকরা তাদের মেয়েদেরকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠাতে নিরাপদ বোধ করছে না। সামাজিক অবক্ষয় ও নিরাপত্তার কারণে ছেলেরা যেতে পারলেও মেয়েদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যাওয়া সীমিত হয়ে যাচ্ছে।[২৪] যার ফলে বিশেষ করে মাধ্যমিক স্তরে মেয়েদের ঝরে পড়ার হার বৃদ্ধি পাচ্ছে।

গবেষণায় দেখা যায় ৫৫ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ৯ জন অর্থাৎ ১৬.৩২% ইভটিজিং-এর শিকার হয়েছে। এই ৯ জনের মধ্যে ৩ জনের বিয়ে দেওয়া হয়েছে আর বাকি ৬ জনের কোনো না কোনোভাবে লেখাপড়া ব্যহত হয়েছে আবার কেউ কেউ পড়ালেখা বন্ধ করে দিয়েছে।

---

[২৩] Adidur Rahman Khan (ed.), *Odhikar: Human Rights Monitoring Report* (Dhaka: ODHIKAR, 2012), পৃ. ২২।

[২৪] আহসান খান ও মাইমুল, *ধর্ষণ ও আমাদের করণীয়* (ঢাকা: চিন্তামুক্ত প্রকাশন, ২০১১), পৃ. ২৫।

ইভটিজিং ছাড়াও সমাজ জীবনে সন্ত্রাস, অপহরণ, এসিড নিক্ষেপ, খুন ও ধর্ষণ ইত্যাদি বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে মেয়েদের অভিভাবকরা উদ্বিগ্ন এবং তারা সন্তানদের শিক্ষার চেয়ে তাদের মান-সম্মান ও জীবনকে অধিক মূল্যবান মনে করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যাওয়ায় বন্ধ করে দিচ্ছে। আর বাড়ি থেকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দূরবর্তী স্থানে অবস্থিত হলে এ পরিস্থিতি আরো প্রকট হয়।

পারিবারিক বন্ধনের শিথিলতা

অশিক্ষা-অপশিক্ষা-দরিদ্রতা প্রভৃতি কারণে পরিবারের মধ্যে টানাপড়েন ও ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়। স্বামী-স্ত্রীর বন্ধন শিথিল হয়, ফলে ছেলে-মেয়েদের মধ্যে হতাশা নেমে আসে, যা তাদের মানসিক সুস্থতার অন্তরায়। পারিবারিক বন্ধন শিথিল হলে অনেক সময় স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ছাড়াছাড়ি হয়ে যায় এবং অনেক ক্ষেত্রে স্বামী তার স্ত্রী-সন্তানদের রেখে অন্যত্র চলে যায়। তখন একা মায়ের পক্ষে সম্ভব হয় না তার ছেলে ও মেয়ে উভয়কে সমান ভাবে মানুষ করা।[২৫] এক্ষেত্রে অগ্রাধিকারের প্রশ্ন আসে, সঙ্গত কারণে সবদিক থেকে অগ্রাধিকার পায় ছেলে আর বঞ্চিত হয় মেয়ে, যা মেয়েদের প্রতি বৈষম্য সৃষ্টির একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ। গবেষিত এলাকায় যার সত্যতা পাওয়া যায়। গোদাগাড়ি উপজেলায় একটি এবং তানোর উপজেলায় দুটি মোট তিনটি এমন পরিবার পাওয়া যায় যেখানে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ছাড়াছাড়ি হওয়ার পর সন্তানদের অভিভাবক্ত পায় মা। দরিদ্র মা তার সব সন্তানদের সমানভাবে সুযোগ দিতে পারেনি। সেক্ষেত্রে তিনটি পরিবারেই পড়া-লেখায় অগ্রাধিকার পেয়েছে ছেলে আর বঞ্চিত হয়েছে মেয়ে।

উপসংহার

সাম্প্রতিক সময়ে কিছু কিছু ক্ষেত্রে নারীশিক্ষার্থীদের অবস্থার তুলনামূলক উন্নতি ঘটলেও সার্বিক অবস্থা বিবেচনায় নারীরা এখনো অনেক পিছিয়ে। কিছুদিন আগ পর্যন্ত মেয়েদের বিদ্যালয়ে না যাওয়ার কারণ হিসাবে মূলত অভিভাবকদের আর্থিক দুরবস্থার কথা উল্লেখ করা হতো। কিন্তু গবেষণায় দেখা যায় যে, মেয়েদের বিদ্যালয়ে না যাওয়ার কারণ বহুবিধ। কারণগুলো আবার সম্পর্কিত এবং একটি আরেকটির উপর নির্ভরশীল। যেমন – শহর ও গ্রামের মধ্যে সার্বিকভাবে অবকাঠামোগত সুবিধার অপ্রতুলতা, দারিদ্রতা, বাজেটে নারীশিক্ষা খাতে বরাদ্দ ও বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মধ্যে সমন্বয়হীনতা, নেতিবাচক পারিবারিক-সামাজিক মনোভাব, সামাজিক-অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় কারণে বাল্যবিবাহ, শিশুশ্রম, ও গৃহস্থালির কাজে সহায়তা করা, জলবায়ুগত পরিবর্তনের (বন্যা খরা, নদীভাঙন) কারণে পরিবারগুলো ভাসমান হয়ে শহরে আশ্রয় গ্রহণ করা ইত্যাদি। এতসব প্রতিকূল পরিবেশ মোকাবিলা করে একজন নারীর পক্ষে শিক্ষালাভ করা দুরুহ ব্যাপার। বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার অর্ধেক নারী হওয়ার সত্ত্বেও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নারী এখনও প্রকৃত শিক্ষার আলো থেকে দূরে রয়েছে। যদিও সাম্প্রতিক সময়ে মেয়েদের জন্য সরকার কর্তৃক শিক্ষা বান্ধব কর্মসূচি গ্রহণ যেমন – বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ, ই-বুক তৈরি, পাঠ্যসূচিতে নারীর প্রতি ইতিবাচক প্রসঙ্গ সন্নিবেশ, নারীদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে আবাসিক সুবিধা তৈরি, ছাত্রীদের জন্য স্বতন্ত্র টয়লেট নির্মাণ, উপবৃত্তি ও বিনা খরচে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা ইত্যাদি করার ফলে নারীশিক্ষার হার বৃদ্ধি পেয়েছে, তবে তা কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য মাত্রা থেকে এখনও অনেক দূর।

---

[২৫] আনোয়ার হোসেন, পৃ. ১৬৫।

ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ জার্নাল
সংখ্যা ২৩ (১৪২২ বঙ্গাব্দ)

চলনবিলের জেলে সম্প্রদায়ের আর্থ-সামাজিক অবস্থা

আবু রাসেল মুহাঃ রিপন*

Abstract: Chalan Bil is wellknown as the storehouse of fish. Fishing community started to live at Chalan Bil on the basis of catching fish. At present the number of fisherman who catches fish is decreasing day by day and taking different occupation instead of their traditional occupation. This change has various impacts on many sociological issues like income, occupation, education, marriage, housing pattern, opportunities, social control & exchange and social mobility. Interview schedule technique and structured questionnaire as tools of social survey method were used in the study. Besides, different aspects of community life were observed through observation technique. The author tried to explore the lifestyle in terms of socio-economic conditions of the fishing community in the Chalan Bil area.

ভূমিকা

গ্রামীণ ঐতিহ্যের জেলে সম্প্রদায়ের পেশা এখন বিপন্ন। সারা বছর জেলে পাড়ায় চলে নীরব দুর্ভিক্ষ এবং নানাবিধ সমস্যা যার ফলে তাদের পেশার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছে। কেউ কেউ জাল নৌকা বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহের চেষ্টা করছে। আবার কেউ ঝুঁকছে অন্য পেশায়। কারণ এক সময়ে চলনবিলে অধিক মাছ পাওয়া গেলেও বর্তমানে চরম সংকট তৈরি হয়েছে যার ফলে জেলে সম্প্রদায়গত জীবনের চিরায়ত সংস্কৃতিতে ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। মৎস্য চলনবিলের একটি মূল্যবান সম্পদ। এককালে চলনবিলের মাছ সমগ্র বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে চালান হতো। বর্তমানে পলি পড়ে চলনবিল ভরাট হয়ে ওঠায় এবং কাটা খাল ও নদী পথে বিলের পানি সহজে বাহির হয়ে যাওয়ায় মাছ থাকার মতো স্থান খুব কম থাকে। এ কারণে চলনবিলে মাছের পরিমাণ অনেক কমে এসেছে।[১] এ পরিবর্তন কেউ অবধারিত মনে করলেও অনেকেই তা মানতে নারাজ। এ গবেষণার উদ্দেশ্য হলো – চলনবিলে জেলেদের অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও জীবনযাপন রীতি সম্পর্কে জানা। সে জন্য বর্তমান প্রবন্ধে চলনবিল এলাকায় জেলে সম্প্রদায়ের আর্থ-সামাজিক নানাবিধ উপাদানে অতীত এবং বর্তমানের অবস্থা তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে যার মাধ্যমে জেলে সম্প্রদায়গত জীবনযাপনের বিভিন্ন বিষয় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

---

* সহকারী অধ্যাপক, সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

১ এম এ হামিদ, *চলনবিলের ইতিকথা* (পাবনা: আমাদের দেশ প্রকাশনী, ১৯৬৭), পৃ. ৩৩০।

গবেষণাটি নাটোর জেলার গুরুদাসপুর থানাধীন বিলসা এবং সিংড়া উপজেলার বিলদহর গ্রামে পরিচালিত হয়। গ্রাম দুটি চলনবিলের মধ্যে অবস্থিত। একসময় চলনবিলের পাশ দিয়ে অনেক জেলে সম্প্রদায়ের বসবাস ছিল। বর্তমানে মাছের সংকটের কারণে এ সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে। এমতাবস্থায় গবেষণার জন্য উপযুক্ত বিবেচনায় গ্রাম দুটিকে উদ্দেশ্যমূলক নমুনায়ন (purposive sampling) পদ্ধতিতে নির্বাচন করা হয়। তাছাড়া গ্রাম দুটিতে ইতিপূর্বে এ ধরনের কোন গবেষণা পরিচালিত হয়নি। গবেষণায় সামাজিক জরিপ পদ্ধতির সাক্ষাৎকার সিডিউল কৌশল এবং টুলস হিসেবে কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নমালা ব্যবহার করা হয়। প্রশ্নমালায় উন্মুক্ত এবং আবদ্ধ উভয় ধরনের প্রশ্ন ব্যবহার করা হয়। এছাড়া পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে সম্প্রদায়গত জীবনের নানাবিধ দিক সম্পর্কে জানার চেষ্টা করা হয়। যারা বর্তমান মৎস্যজীবী পেশায় জড়িত এবং যারা বর্তমানে জড়িত নয় কিন্তু তাদের পিতা বা দাদা মৎস্যজীবী পেশায় জড়িত ছিল তাদের সবাইকে উত্তরদাতা হিসেবে নির্বাচিত করা হয়। ফলে জেলে সম্প্রদায়গত জীবনে অতীত ও বর্তমানের চিত্র স্পষ্ট অনুধাবনে সহায়ক হয়। প্রথমে গ্রাম দুটিতে মৎস্যজীবী এবং ভিন্ন পেশায় নিয়োজিত (যারা বর্তমানে মৎস্যজীবী পেশায় জড়িত নাই কিন্তু তাদের পিতা বা দাদা জড়িত ছিল) খানা চিহ্নিত করে খানাসমূহের প্রধানগণের নিকট থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। সে হিসেবে বিলসায় মোট উত্তরদাতা ৬৫ জন যার মধ্যে মৎস্যজীবী পেশায় ৬৪ জন এবং ভিন্ন পেশায় ১ জন নিয়োজিত রয়েছে। বিলদহর মোট উত্তরদাতা ১০০ জন, যার মধ্যে মৎস্যজীবী পেশায় ২৯ জন এবং ভিন্ন পেশায় ৭১ জন নিয়োজিত রয়েছে। বর্তমান প্রবন্ধে তথ্য বিশ্লেষণের সারণিতে 'নিজ পেশা' এবং 'ভিন্ন পেশা' শব্দ দুটি ব্যবহার করা হয়েছে। 'নিজ পেশা' বলতে জেলে বা মৎস্যজীবী এবং 'ভিন্ন পেশা' বলতে জেলে বা মৎস্যজীবী ছাড়া অন্য যে কোনো পেশা গ্রহণ করাকে বোঝানো হয়েছে। এছাড়া মৎস্যজীবী শব্দটি দ্বারা জেলে সম্প্রদায়কে বোঝানো হয়েছে। বর্তমান গবেষণা জেলে সম্প্রদায়গত জীবনের অতীত এবং বর্তমানের পরিবর্তিত রূপ অনুধাবনে এবং এ বিষয়ে আগ্রহী গবেষক ও শিক্ষার্থীদের জন্য সহায়ক হবে।

জেলে সম্প্রদায় সম্পর্কিত ধারণা

আদিম শিকারিরা পশু শিকারের পাশাপাশি মৎস্য শিকারও করতো। বিশেষ করে যারা নদী বা সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকায় সুবিধাজনক স্থানে বাস করতো তারা মাছ শিকারকেই জীবিকা নির্বাহের উপায় হিসেবে বেছে নিতো।[২] গ্রামীণ বাংলাদেশে জেলেরা সাধারণত নদী তীরবর্তী অঞ্চলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠীবদ্ধভাবে কোন সুনির্দিষ্ট পাড়া বা গ্রামে অথবা বিভিন্ন গ্রামে বংশপরম্পরায় বসবাস করে থাকে। মৎস্য আহরণ ও বিপণন ছাড়াও সমাজ জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে একে অপরের সাথে সহযোগিতাপূর্ণ জীবনযাপনই জেলেদের চিরায়ত ঐতিহ্যের এক অনুপম বৈশিষ্ট্য। জেলেদের যেমন ইতিহাস রয়েছে, তেমনি রয়েছে বৈচিত্র্যময় ঐতিহ্য এবং প্রাকৃত ধাঁচের দৈনন্দিন জীবনধারা। ঐতিহ্যগতভাবে বাংলাদেশের জেলেরা হিন্দুধর্মের অনুসারী। হিন্দুদের ক্ষেত্রে মাছ ধরার পেশা জাতিভেদ প্রথার সঙ্গে সম্পর্কিত বিধায় তা জন্মসূত্রে নির্ধারিত এবং অপরিবর্তনীয়। এজন্য জেলেরা জাতিভেদ প্রথার ধর্মভিত্তিক বিন্যাসে অন্যান্য পেশাজীবীদের তুলনায় নিচু অবস্থানের হওয়া সত্ত্বেও দায়িত্ব এবং কর্তব্যের অমোঘ বিধানের কারণে নিজেদের পেশাকে পবিত্র জ্ঞান করে থাকে। বর্তমানকালে মুসলমান জনগণের মধ্যেও এই পেশা গ্রহণ প্রবণতা লক্ষ করা যাচ্ছে। হিন্দুদের ন্যায় মুসলমানদের পেশা জন্মসূত্রে আরোপিত বা পবিত্র নয়, বরং এদের সকলের জন্য পেশার পরিবর্তন উন্মুক্ত।[৩] ধীবর, কৈবর্ত, নিকারি, জালিক, ঝালো,

---

[২] আরশাদ সিদ্দিকী, *সমুদ্রগামী মৎস্যজীবীদের জীবন জীবিকার সংগ্রাম* (ঢাকা: ম্যাস্-লাইন মিডিয়া সেন্টার, ২০০০), পৃ. ১-২।

[৩] *বাংলাপিডিয়া* (২০০৩) "জেলে" ভুক্তি।

জেলে প্রভৃতি নামে পরিচিত হলেও তাদের কাজই হলো মাছ ধরা ও বিক্রি করা।[৪] নিকারিরা হলো মুসলমান জেলে।[৫] শব্দগত উদ্ভব না জানা গেলেও অনেকের ধারণা 'জাল' বা 'জল' হতে জেলে শব্দের উৎপত্তি।[৬] বাংলায় জেলেরা বিভিন্ন নামে পরিচিত। কৈবর্তদের মধ্যে দুইটি বিভাগ রচিত হয়, একটি প্রাচীনকালের ন্যায় মৎস্যজীবীই থেকে যায়, আর একটি কৃষি (হালিক) বৃত্তি গ্রহণ করে মাহিষ্য নামে পরিগণিত হয়।[৭] বাংলাদেশে কৈবর্তরা মৎস্যজীবী হিসেবে পরিচিত। বর্তমানে মৎস্যজীবীদের প্রায় ৯৫% ছিল হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত।[৮]

গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ

আয়

মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য আয় সহায়ক ভূমিকা পালন করে। সুযোগ-সুবিধাগত তারতম্যে জেলে সম্প্রদায়ে বংশপরম্পরায় আয়ের ভিন্নতা লক্ষ করা যায়।

সারণি ১

উত্তরদাতাগণের বাৎসরিক আয়

আয় (টাকা)	বিলদহর		বিলসা	
	নিজ পেশা	ভিন্ন পেশা	নিজ পেশা	ভিন্ন পেশা
১০০০০-১৫০০০	০২ (৬.৯০)	-	-	-
১৫০০০-২০০০০	০৪ (১৩.৭৯)	১৫ (২১.১৩)	০৩ (৪.৬৯)	-
২০০০০-২৫০০০	১১ (৩৭.৯৩)	২৮ (৩৯.৪৪)	১৭ (২৬.৫৬)	-
২৫০০০-৩০০০০	০১ (৩.৪৫)	-	২৭ (৪২.১৯)	-
৩০০০০-৩৫০০০	০২ (৬.৯০)	০৪ (৫.৬৩)	০৫ (৭.৮১)	-
৩৫০০০-৪০০০০	০৩ (১০.৩৪)	১১ (১৫.৪৯)	১০ (১৫.৬৩)	০১ (১০০.০০)
৪০০০০-৪৫০০০	০১ (৩.৪৫)	০৩ (৪.২২)	-	-
৪৫০০০-৫০০০০	০১ (৩.৪৫)	-	০১ (১.৫৬)	-
৫০০০০-৫৫০০০	-	০১ (১.৪১)	-	-
৫৫০০০-৬০০০০	০১ (৩.৪৫)	০১ (১.৪১)	-	-
৬০০০০+	০৩ (১০.৩৪)	০৮ (১১.২৭)	০১ (১.৫৬)	-
মোট	২৯ (১০০.০০)	৭১ (১০০.০০)	৬৪ (১০০.০০)	০১ (১০০.০০)

উৎস: মাঠ গবেষণা

---

[৪] কামরুল হাসান মঞ্জু, *ক্ষুদ্র পেশাজীবীদের বিলুপ্তির কারণ ও পুনর্বাসন* (ঢাকা: ম্যাস্-লাইন মিডিয়া সেন্টার, ২০০২), পৃ. ১১।

[৫] Jogendra Nath Bhattacharya, *Hindu Castes and Sects* (Kolkata: Editions Indian, 1973), p. 250.

[৬] H.H. Risley, *The Tribes and Castes of Bengal*, Vol. 1 (Kolkata: Firma KLM, 1981), p. 340।

[৭] নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙ্গালীর ইতিহাস: আদি পর্ব* (কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ২০০৪), পৃ. ২৫০।

[৮] বব পোকরেন্ট, পিটার রিভ্স এবং জন ম্যাকগুয়ার, "ঔপনিবেশিক আমলে (১৭৯৩-১৯৫০) বাংলার মৎস্যজীবীদের অধিকার সংগঠন এবং বাজার সম্পর্ক,", *তৃণমূল উদ্যোগ*, ডিসেম্বর ২০০১, ৩য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা, পৃ. ৫৪।

বিলদহর যারা মৎস্য শিকারের সঙ্গে জড়িত তাদের বাৎসরিক গড় আয় ৩০,৪৩২ টাকা। যারা মৎস্য শিকারে জড়িত নাই তাদের বাৎসরিক গড় আয় ৩০,৫৯৯ টাকা। বিলসায় যারা মৎস্য শিকারে জড়িত তাদের বাৎসরিক গড় আয় ২৮,৫১৬ টাকা এবং যে মৎস্য শিকারের সঙ্গে জড়িত নয় তার বাৎসরিক গড় আয় ৩৭,৫০০ টাকা। জেলে সম্প্রদায়ের মধ্যে আগে উত্তরদাতাগণের পিতা ও দাদাদের আয় কম থাকলেও দ্রব্যমূল কম থাকায় তাদের জীবনযাত্রার মান ভালো ছিল বলে উত্তরদাতাগণ জানায়। বিলসার জেলেরা বর্তমানে কষ্টে দিনাতিপাত করছে। কারণ চলনবিলে একটি নির্দিষ্ট সময় (আষাঢ় মাস হতে কার্তিক মাস পর্যন্ত) মাছ ধরার সুযোগ পায়। আগে অবশিষ্ট সময়ে পুকুর, খাল, জলাশয়ে মাছ ধরার সুযোগ পেলেও বর্তমানে তা পায় না। কারণ এসব স্থানে অমৎস্যজীবী শ্রেণী *লিজ* (কয়েক বছরের জন্য অর্থের বিনিময়ে মাছ চাষ করার সুযোগ) গ্রহণের মাধ্যমে মৎস্য চাষ করে। ফলে প্রকৃত জেলে সম্প্রদায় বঞ্চিত হচ্ছে। আর্থিক দৈন্যের কারণে তারা প্রশিক্ষণ ও *লিজ* (কয়েক বছরের জন্য অর্থের বিনিময়ে মাছ চাষ করার সুযোগ) নিতে পারে না। এতে তাদের একটি নির্দিষ্ট সময়ে পুরোটাই মৎস্য শিকার ছাড়া চলতে হয়, যা তাদের বাৎসরিক আয় বৃদ্ধিতে ও জীবনমানের উন্নয়নে সহায়ক নয়। যারা মৎস্যজীবী পেশা ত্যাগ করে ভিন্ন পেশায় নিয়োজিত তাদের জীবনযাত্রার মান তাদের পিতা ও দাদাদের তুলনায় ভালো। কারণ তাদের বর্তমান আয় বেশি। তাছাড়া উদ্বৃত্ত অর্থ ব্যবসাসহ অন্যান্য খাতে বিনিয়োগ করার সুযোগ পাচ্ছে। তবে আর্থিক সংকটের কারণে বড় পরিসরে কোনো ব্যবসা পরিচালনা করতে পারে না।

পেশা

সম্প্রদায়গত জীবনে বংশপরম্পরায় একই পেশায় নিয়োজিত থাকার প্রবণতা থাকলেও বর্তমান বাস্তবতায় নিজ ঐতিহ্যবাহী পেশা ত্যাগ করে ভিন্ন পেশা গ্রহণ করতে দেখা যায়। সারণি ২-এ দেখা যায় যে, জেলে সম্প্রদায়ে যারা বংশগত পেশা ত্যাগ করে ভিন্ন পেশায় নিয়োজিত তাদের মধ্যে ৮ ধরনের মুখ্য পেশা (ব্যবসা, চাকুরী, কৃষি, ডাক্তার, রিক্সা/ভ্যানচালক, রাজমিস্ত্রি, গানবাজনা ও দিনমজুর) এবং ৩ ধরনের গৌণ পেশায় (ব্যবসা, দিনমজুর ও ইমাম) নিয়োজিত থাকতে দেখা যায়। বিলদহর যারা ভিন্ন পেশা গ্রহণ করে ব্যবসার সঙ্গে জড়িত তারা নানা ধরনের ব্যবসা করছে যার মধ্যে মিষ্টির দোকান, জাল বুনানো ও বিক্রয়, চিড়া-মুড়ির ব্যবসা, মাছ ক্রয়-বিক্রয়, গাছের ব্যবসা, মুদি দোকান, স্টক ব্যবসা, স্বর্ণকার, নরসুন্দর, বৃত্তি বুনানো ও বিক্রয় উল্লেখযোগ্য। যারা চাকুরি করছে তারা আমিনের (জমি পরিমাপ করা) এবং বিভিন্ন মিলে চাকরি করছে।

যারা ডাক্তার পেশায় জড়িত তারা হোমিও ডাক্তার হিসেবে এলাকায় চিকিৎসা সেবা প্রদান করছে। উত্তরদাতাগণের মধ্যে শতকরা ৫৬.৩৬ ভাগ জেলে পেশায় জড়িত এবং ৪৩.৬৪ ভাগ বংশগত পেশা ত্যাগ করে ভিন্ন পেশায় নিয়োজিত। উত্তরদাতাগণের পিতাদের মধ্যে শতকরা ৯৭.৫৮ ভাগ জেলে পেশায় নিয়োজিত এবং ২.৪২ ভাগ ভিন্ন পেশায় নিয়োজিত। উত্তরদাতাগণের পিতামহদের মধ্যে শতকরা ১০০ ভাগ জেলে পেশায় নিয়োজিত ছিল। তাই স্পষ্টত বোঝা যায় যে, পেশাগত ক্ষেত্রে অতীতের তুলনায় বর্তমানে ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। উত্তরদাতাগণের মতে, যারা জেলে পেশা ত্যাগ করে ভিন্ন পেশায় নিয়োজিত তারা বর্তমানে অপেক্ষাকৃত সম্মানজনক অবস্থানে রয়েছে। যদিও অনেকেই তাদের পিতা এবং পিতামহের পেশায় (জেলে) থাকতে চায়। পেশাগত বৈচিত্র্যের কারণে তাদের মধ্যে রুচি, মনোভাব, সামাজিকতা এমনকি সামাজিক সম্পর্কেও পরিবর্তন এসেছে। যারা দিনমজুর পেশাকে মুখ্য বা গৌণ পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছে তারা মানসিকভাবে সন্তুষ্ট নয়। সার্বিকভাবে যারা বর্তমানে বংশগত পেশা তথা জেলে পেশা পরিত্যাগ করে ভিন্ন পেশায় জড়িত তারা অতীতের তুলনায় অনেক বেশি মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ করার সুযোগ পায়।

সারণি ২

বংশপরম্পরায় পেশার ধরন সম্পর্কিত তথ্য বিন্যাস

পেশার ধরন			বিলদহর		বিলসা	
			নিজ পেশা	ভিন্ন পেশা	নিজ পেশা	ভিন্ন পেশা
উত্তরদাতা	মুখ্য	জেলে	২৯(১০০.০০)	-	৬৪(১০০.০০)	-
		ব্যবসা	-	৫৮(৮১.৬৯)	-	-
		চাকুরি	-	০৩(৪.২২)	-	-
		কৃষি	-	০১(১.৪১)	-	০১(১০০.০০)
		ডাক্তার	-	০২(২.৮২)	-	-
		রিক্সা/ভ্যান চালক	-	০২(২.৮২)	-	-
		রাজমিস্ত্রি	-	০৩(৪.২২)	-	-
		গানবাজনা	-	০১(১.৪১)	-	-
		দিনমজুর	-	০১(১.৪১)	-	-
		মোট	২৯(১০০.০০)	৭১(১০০.০০)	৬৪(১০০.০০)	০১(১০০.০০)
	গৌণ	ব্যবসা	১৪(৪৮.২৮)	০২(২.৮২)	১৮(২৮.১৩)	-
		ইমাম	-	০১(১.৪১)	-	-
		দিনমজুর	০১(৩.৪৫)	০২(২.৮২)	৩১(৪৮.৪৪)	-
		মোট	১৫(৫১.৭৩)	০৫(৭.০৫)	৪৯(৭৬.৫৭)	-
উত্তরদাতার পিতা	মুখ্য	জেলে	২৯(১০০.০০)	৬৭(৯৪.৩৭)	৬৪(১০০.০০)	০১(১০০.০০)
		ব্যবসা	-	০৪(৫.৬৩)	-	-
		মোট	২৯(১০০.০০)	৭১(১০০.০০)	৬৪(১০০.০০)	০১(১০০.০০)
উত্তরদাতার দাদা	মুখ্য	জেলে	২৯(১০০.০০)	৭১(১০০.০০)	৬৪(১০০.০০)	০১(১০০.০০)

উৎস: মাঠ গবেষণা

শিক্ষা

একটা সময় ছিল জেলের ছেলে জেলে হবে, বংশপরম্পরায় মৎস্য শিকার করে জীবনধারণ করবে এটাই স্বাভাবিক। তবে নানা বাস্তব কারণে বর্তমানে সম্প্রদায়গত জীবনে সচেতনতা বৃদ্ধি পাওয়ায় সন্তানদের শিক্ষাগ্রহণে আগ্রহী হচ্ছে।

আগের তুলনায় বর্তমানে জেলে সম্প্রদায়ে সন্তানদের শিক্ষা গ্রহণে সচেতনতা লক্ষ করা যায়। উত্তরদাতাগণের তুলনায় তাদের সন্তানদের মধ্যে শিক্ষা গ্রহণ প্রবণতা বেশি লক্ষ করা যায়। জেলেদের অর্থনৈতিক দুর্বলতার কারণে এ হার কম বলে উত্তরদাতাগণ জানায়। যদিও তাদের ইচ্ছা সন্তানরা যতদূর সম্ভব লেখাপড়া করবে। কিন্তু আর্থিক সংগতির অভাব, সন্তানদের অনিচ্ছা, যোগাযোগের অভাব, মেয়ে সন্তান লেখাপড়া করে কি করবে এমন মনোভাবের কারণে অনেকে লেখাপড়া বাদ দেয়। সন্তানদের লেখাপড়া বন্ধ হওয়ায় উত্তরদাতাগণ সন্তুষ্ট নয় বরং বাধ্য হয়েই তারা লেখাপড়া বন্ধ করেছে বলে জানায়। আগে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জেলে সম্প্রদায়ের ছেলেমেয়ে গেলে ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখলেও বর্তমানে তা হ্রাস পেয়েছে। বিলদহরের তুলনায় বিলসার জেলে সম্প্রদায়ের আর্থিক অবস্থা খারাপ হওয়ায় তাদের সন্তান লেখাপড়া বন্ধ করার হার বেশি।

সারণি ৩

শিক্ষাগ্রহণ সম্পর্কিত তথ্য বিন্যাস

শিক্ষার ধরন	বিলদহর				বিলসা			
	নিজ পেশা		ভিন্ন পেশা		নিজ পেশা		ভিন্ন পেশা	
	উত্তরদাতা	উত্তরদাতার সন্তান	উত্তরদাতা	উত্তরদাতার সন্তান	উত্তরদাতা	উত্তরদাতার সন্তান	উত্তরদাতা	উত্তরদাতার সন্তান
নিরক্ষর	১১ (৩৭.৯৩)	০২ (২.৬০)	১৬ (২২.৫৪)	-	৩৭ (৫৭.৮১)	১৭ (১১.৮১)	-	-
শিশু	-	১৬ (২০.৭৮)	-	৩৫ (২৪.১৪)	-	১৪ (৯.৭২)	-	-
প্রাথমিক	১৮ (৬২.০৭)	৪৫ (৫৮.৪৪)	৪৫ (৬৩.৩৮)	৫৮ (৪০.০০)	১৭ (২৬.৫৬)	৮৩ (৫৭.৬৪)	-	০১ (৫০.০০)
মাধ্যমিক	-	১৪ (১৮.১৮)	০৮ (১১.২৭)	৪৯ (৩৩.৭৯)	০৭ (১০.৯৪)	৩০ (২০.৮৩)	-	০১ (৫০.০০)
উচ্চমাধ্যমিক	-	-	০২ (২.৮১)	০২ (১.৩৮)	০৩ (৪.৬৯)	-	০১ (১০০.০০)	-
উচ্চশিক্ষা	-	-	-	০১ (০.৬৯)	-	-	-	-
মোট	২৯ (১০০)	৭৭ (১০০)	৭১ (১০০)	১৪৫ (১০০)	৬৪ (১০০)	১৪৪ (১০০)	০১ (১০০)	০২ (১০০)

উৎস: মাঠ গবেষণা

বিবাহ

বিবাহ সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ও সামাজিক সম্পর্ক সৃষ্টিতে সহায়কা ভূমিকা পালন করে। জেলে সম্প্রদায়ে যারা হিন্দু ধর্মের অনুসারী তারা হালদার বা জিয়ানি (যারা মাছ শিকার করে) এবং ইসলাম ধর্মের অনুসারী তারা নিকারি (যারা মাছ শিকার করে ও ক্রয়-বিক্রয় করে) বলে পরিচিত। অনেকে মুসলমান জেলেদেরকেও জিয়ানি (যারা মাছ শিকার করে) বলে থাকে। বিবাহের ক্ষেত্রে ধর্মীয় প্রভাব লক্ষ করা যায়। উত্তরদাতাদের মধ্যে বিলদহর একজন এবং বিলসায় একজন অবিবাহিত।

জেলে সম্প্রদায়ের মধ্যে যারা হিন্দু ধর্মের অনুসারী তাদের মধ্যে আন্তর্গোষ্ঠী বিবাহ লক্ষ করা যায়। যারা ইসলাম ধর্মের অনুসারী তাদের মধ্যেও এ ধরনের প্রবণতা লক্ষ করা যায়। কারণ সমাজে জেলে সম্প্রদায়কে একটি বিশেষ শ্রেণী হিসেবে দেখা হয় যা বর্ণপ্রথার মতো। শতকরা ২.৩৩ ভাগ ক্ষেত্রে বহির্গোষ্ঠী বিবাহ লক্ষ করা যায়। এসব ক্ষেত্রে পাত্রের ব্যক্তিগত গুণাগুণ ও পেশাকে বিবেচনা করা হয়। যদিও এ সংখ্যা খুবই কম তবুও গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে যে, আগে এ ধরনের বিবাহ একেবারেই অসম্ভব ছিল। বিবাহের ক্ষেত্রে বংশমর্যাদা তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আগে কেবলমাত্র সমান বংশ মর্যাদা সম্পন্নদের মধ্যেই বিবাহ সম্পন্ন হতো। বর্তমানে উঁচু বংশের ছেলে বা মেয়ের সঙ্গে অপেক্ষাকৃত নিচু বংশের মেয়ে বা ছেলের বিবাহ হচ্ছে। পরিবর্তিত সমাজব্যবস্থা সম্প্রদায়গত জীবনে প্রভাব ফেলছে বলে উত্তরদাতাগণ মনে করে। বিবাহের ক্ষেত্রে অনেক সময় স্ত্রী পূর্বপরিচিত এবং কোনো না কোনোভাবে আত্মীয়তার সম্পর্কে আবদ্ধ ছিল। উত্তরদাতাগণের মধ্যে শতকরা ৩৩.১৩ ভাগ বিবাহের

পূর্বে তাদের স্ত্রীগণ কোনো না কোনোভাবে আত্মীয় ছিল। জেলে সম্প্রদায়ে এ ধরনের বিবাহ বেশি হবার কারণ হলো নিজেদের মধ্যে আত্মীয়তার বন্ধন দৃঢ় করতে আগ্রহী এবং মাছ শিকারের জন্য নিজেরাই সংগঠিত হয়ে মাছ শিকার করতে পারে। তাছাড়া বর্তমানে বিবাহে যে পরিমাণ যৌতুক দিতে হয় তা তাদের আর্থিক সংকটের কারণে পাত্রপক্ষকে দিতে পারে না। ফলে অন্যত্র বিবাহ না দিয়ে নিজেদের মধ্যেই বিবাহ দিয়ে থাকে। বিলসার জেলেদের আর্থিক সংকট বেশি থাকায় আত্মীয়দের মধ্যে বিবাহ দেবার প্রবণতা বেশি লক্ষ করা যায়। বিবাহের আগে পরে অনুষ্ঠানরীতিতে ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। সাজসজ্জা, আনন্দদায়ক অনুষ্ঠান, খাদ্যগ্রহণ ইত্যাকার বিষয়ে পরিবর্তনের ছোঁয়া স্পষ্ট। এখন অনেকেই নিজেদের পছন্দমতো পাত্র-পাত্রী নির্বাচন করার সুযোগ পাচ্ছে যা আগে কখনও পেত না। বিবাহের পূর্বে পাত্র-পাত্রীকে দেখানো হয়, তাদের মতামত নেওয়া হয় যা আধুনিক ধ্যান-ধারণা গ্রহণের পরিচায়ক। আগে বিবাহে দাওয়াতের ক্ষেত্রে নিজ সম্প্রদায়ের বাইরে খুব কমই দাওয়াত দেওয়া হতো। এখন পরিচিত অন্য গোত্র বা ধর্মের লোকজনকেও দাওয়াত দেওয়া হয়।

বাসস্থান

জেলে সম্প্রদায়ে বংশপরম্পরায় বাসস্থানের পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। উত্তরদাতাগণের দাদাদের তুলনায় উত্তরদাতাগণের পিতাদের ঘরবাড়ি উন্নত ছিল। আবার উত্তরদাতাগণের পিতাদের তুলনায় উত্তরদাতাগণের ঘরবাড়ি উন্নত। অতীতের তুলনায় বর্তমানে গুণগত ও সংখ্যাগত পরিবর্তন এসেছে। উত্তরদাতাগণের বর্তমানে ঘরবাড়ির যে ধরন তা কয়েক বছর আগেও এমন ছিল না। যারা বংশগত পেশা তথা মৎস্যজীবী পেশায় জড়িত তাদের ঘরবাড়ির তুলনায় যারা ভিন্ন পেশায় জড়িত তাদের ঘরবাড়ি অপেক্ষাকৃত উন্নত। বিলসার তুলনায় বিলদহরে জেলে সম্প্রদায়ের ঘরবাড়ি ভালো। কারণ বিলসায় প্রায় সকলের ঘরবাড়ি মাটি আর টিনের তৈরি এবং খুবই অল্প জায়গায় ঘরবাড়ি তৈরি করা, একান্নবিঘার জেলেদের ঘরবাড়িও মাটি এবং টিনের বেশি হলেও বাসস্থানের পরিমাণ বিলসার তুলনায় অপেক্ষাকৃত বেশি। একটা সময় ছিল যখন তারা নিজেরা বা তাদের পিতা ও পিতামহগণ বেড়ার তৈরি ঘরে বসবাস করত। পরবর্তিতে মাটি ও টালির (মাটির তৈরি) ঘরে বসবাস করে। টালি ভঙ্গুর বিধায় টিন ও মাটির তৈরি ঘরে বসবাস শুরু করে। উত্তরদাতাগণের তুলনায় তাদের পিতা বা দাদাদের বাসস্থান ভাল না হওয়ার উল্লেখযোগ্য কারণ হলো সে সময়ে আর্থিক সংকট, সুযোগের অভাব, মনের ইচ্ছা না থাকা প্রভৃতি। বর্তমান সময়ে উত্তরদাতাগণ পারিপার্শ্বিক অবস্থার ব্যাপক পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খেয়ে চলা এবং মানসম্মত জীবনযাপন করার লক্ষ্যে ঘরবাড়িতে পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়।

সুযোগ-সুবিধা

সম্প্রদায়গত জীবনে উন্নয়নের জন্য সুযোগ-সুবিধা অপরিহার্য হলেও চলনবিলে জেলে সম্প্রদায়ে সুযোগ-সুবিধার অভাব রয়েছে। যেহেতু মৎস্য শিকার পানি বা জলাশয় নির্ভর তাই দেখা যায়, বর্তমানে তারা একটি উল্লেখযোগ্য সময়ে মৎস্য শিকার করার সুযোগ পায় না। একটা সময় ছিল যখন প্রচুর মাছ পাওয়া যেত এবং জেলে সম্প্রদায়ের সদস্যরা ভাবতেও পারেনি কোনোদিন মাছের সংকট হবে। ফলে তারা অন্য কোনো কাজে পারদর্শিতা অর্জন করতে পারেনি। অথচ বর্তমানে বছরের কয়েক মাস তারা মাছ শিকার করা থেকে বঞ্চিত হয় (সচরাচর পৌষ হতে জৈষ্ঠ্যের মাঝামাঝি)। চলনবিলে জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ থেকে অগ্রাহায়ণ মাস পর্যন্ত পানি থাকে (অনেক সময় কমবেশি হয়)। আষাঢ় মাস থেকে কার্তিক মাস পর্যন্ত পানি বেশি থাকে। এ সময়ে মাছ শিকারে কমবেশি লক্ষ করা যায়। মাছের সংকটের মধ্যেও তুলনামূলকভাবে অধিক বা কম শিকার করার সুযোগ পায়। জেলেরা বর্ষা মৌসুমে ইচ্ছে করলেই যেখানে সেখানে মাছ শিকার করতে পারে না। কারণ এ সময়ে চলনবিলের মধ্যে অমৎস্যজীবীরা কারেন্ট জাল ফেলে মাছ শিকার করে। তাদের জালের কোনোরূপ ক্ষতি হলে জেলেদের জাল কেড়ে নেয়, নৌকা ডুবিয়ে দেয়, পিটুনি দেয়। বর্তমানে অধিকাংশ পুকুর অমৎস্যজীবীরা লিজ (কয়েক বছরের

জন্য অর্থের বিনিময়ে মাছ চাষ করার সুযোগ) নিয়ে মাছ চাষ করে এবং লাভবান হচ্ছে। পক্ষান্তরে আর্থিক সংকটের কারণে জেলে সম্প্রদায় প্রশিক্ষণ ও পুকুর লিজ (কয়েক বছরের জন্য অর্থের বিনিময়ে মাছ চাষ করার সুযোগ) নিতে পারে না। ফলে আগে যেসব পুকুরে অবাধে মাছ শিকার করতে পারত বর্তমানে সেসব পুকুরে মাছ শিকারের সুযোগ থেকে জেলেরা বঞ্চিত হচ্ছে। বর্ষা শেষে পানি যাবার সময় বিভিন্ন স্থানে সুতি (চিকন ফাঁসের জাল টোন আকৃতির) দিয়ে মাছ শিকার করে। যেসব স্থান দিয়ে চলনবিলের পানি নির্গমন হয় ও স্রোত সৃষ্টি হয় সেখানে এসব সুতি (চিকন ফাঁসের জাল টোন আকৃতির) দেওয়া হয়। স্থানীয় প্রভাবশালীরা এসব সুতি (চিকন ফাঁসের জাল টোন আকৃতির) দিয়ে মাছ শিকার করে থাকে। জেলে সম্প্রদায় সুতির (চিকন ফাঁসের জাল টোন আকৃতির) পার্শ্বে মাছ শিকার করতে পারে না। এসব স্থানে মাছ শিকার করতে গেলে পিটুনি খেতে হয়। শুকনো মৌসুমে বেশ কয়েক মাস জেলেরা বেকার অবস্থায় থাকে এবং এ সময়ে খাল-বিলে কদাচিৎ মাছ পাওয়া যায়। তারা অধিকাংশই সুযোগের অভাবে ভালো কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করতে পারে না। বিলদহরের সঙ্গে অন্যান্য স্থানের যোগাযোগ ব্যবস্থা ভাল যা অনেকের পেশা পরিবর্তনের সুযোগ হয়েছে। কিন্তু বিলসার যোগাযোগ ব্যবস্থা ভালো নয়। তবে বর্তমানে আগের তুলনায় উন্নত হয়েছে। কিন্তু তার সঙ্গে খাপ খেয়ে ভিন্ন পেশা গ্রহণ করার জন্য আর্থিক সংগতি অধিকাংশ জেলে সম্প্রদায়ের নেই। ফলে যে সময়ে মাছ শিকার করতে পারে না, সেসময় দিনমজুরের কাজ করা ছাড়া তাদের অন্য কোনো উপায় থাকে না।

সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ও বিনিময় ব্যবস্থা

সামাজিক শৃঙ্খলা ও ভারসাম্য রক্ষায় সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা যুগ যুগ ধরেই চলে আসছে। জেলে সম্প্রদায়গত জীবনে সামাজিক নিয়ন্ত্রণের জন্য বিশেষ কোনো ব্যবস্থা নেই। তবে আগে সমাজের মাধ্যমে সামাজিক নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা ছিল। সমাজের নিয়ম-কানুন ভঙ্গ করলে তার জন্য শাস্তির বিধান ছিল। দেশের প্রচলিত আইনই সামাজিক নিয়ন্ত্রণে যথেষ্ট বিধায় বর্তমানে সমাজ ব্যবস্থার প্রচলন নেই। এটা তাদের মনোভাবের পরিবর্তন এবং প্রচলিত সমাজব্যবস্থার সঙ্গে খাপ খেয়ে চলার বহিঃপ্রকাশ। সম্প্রদায়গত জীবনে নানাবিধ প্রয়োজনে দ্রব্য সামগ্রী বিনিময় করে। আগে কেবলমাত্র নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যে বিনিময় হতো। বর্তমানে যারা ভিন্ন পেশায় নিয়োজিত এবং শিক্ষালাভ করছে তারা নিজ সম্প্রদায়ের বাইরে সমাজের অন্যান্যদের সঙ্গে প্রয়োজনীয় সামগ্রী বিনিময় করছে। আগে এক গোত্র বা সম্প্রদায়ের সামগ্রী অন্য গোত্র বা সম্প্রদায়ের সদস্যরা খাওয়াতো দূরের কথা ছুঁয়েও দেখত না। বর্তমানে সে মনোভাবে ব্যাপক পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। সচেতনতা বৃদ্ধি ও প্রয়োজনের তাগিদেই এখন বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিনিময় হচ্ছে। বিনিময় সামগ্রীর মধ্যে চাল, ডাল, লবণ, তেল, মসলা, পিঁয়াজ, রসুন, মরিচসহ গার্হস্থ্য সামগ্রী উল্লেখযোগ্য।

রাজনীতি

আগে জেলে সম্প্রদায়ে নিজস্ব সংগঠন থাকলেও বর্তমানে এ ধরনের কোনো সংগঠন নেই। সে সময়ে সংগঠনের মাধ্যমে নেতৃত্বের বিকাশ ও প্রকাশ, নিজেদের সমস্যার সমাধান, অধিকার আদায়ে সংগঠনগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করত। সম্প্রদায়গত চেতনা শক্তিশালী হতো। পরবর্তীতে নিজেদের সচেতনতার অভাব, আর্থিক বিষয় নিয়ে কোন্দল, নেতৃত্বের অভাব, অভ্যন্তরীণ বিরোধ প্রভৃতি নানাবিধ কারণে সংগঠন গড়ে ওঠেনি। তাছাড়া বর্তমানে বংশগত পেশা তথা জেলে পেশায় নিয়োজিত হবার মানসিকতা কম হওয়ায় নিজস্ব সংগঠন গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা হ্রাস পেয়েছে। তবে তাদের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা লক্ষ করা যায়। অনেকে জাতীয় রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত। অধিকাংশই কোনো না কোনো জাতীয় রাজনৈতিক দলের সদস্য। তবে বিলদহরের জেলেদের মধ্যে বিলসার তুলনায় রাজনৈতিক সচেতনতা ও সম্পৃক্ততা কম। তারা বিভিন্ন সময়ে মিছিল সমাবেশে অংশগ্রহণ

করে। বিলসায় একজন ভিন্ন পেশায় নিয়োজিত কিন্তু তার বাবা এবং দাদা জেলে ছিল। সে পরপর দুইবার ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হয় এবং বেশ কয়েকবার অস্থায়ী চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করে। স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যদের নির্বাচিত হওয়া বহুলাংশে নির্ভর করে জেলে সম্প্রদায়ের ভোটের উপর। বিলদহর যারা মৎস্যজীবী পেশায় জড়িত তারা কেউ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে নাই। যারা ভিন্ন পেশায় জড়িত তাদের মধ্যে শতকরা ৮.৪৫ ভাগ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে এবং ৭.০৪ ভাগ নির্বাচনে জয়ী হয়। বিলসায় জেলে পেশায় নিয়োজিত উত্তরদাতাগণের মধ্যে শতকরা ১৮.৭৫ ভাগ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে এবং তার মধ্যে শতকরা ৩.১৩ ভাগ ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হয়। আজ থেকে ১০-১৫ বৎসর আগেও জেলে সম্প্রদায়ে এমন অবস্থা ছিল না। উত্তরদাতাগণের পিতা এবং পিতামহদের মধ্যে জাতীয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ প্রবণতা কম ছিল বলে উত্তরদাতাগণ জানায়।

সামাজিক গতিশীলতা

সামাজিক গতিশীলতা হচ্ছে সমাজকাঠামোয় ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর সামাজিক অবস্থানের সঙ্গে মর্যাদার পরিবর্তন। এক্ষেত্রে ব্যক্তি, দল অথবা বিশেষ শ্রেণী এক সামাজিক অবস্থান হতে অন্য সামাজিক অবস্থানে গমন করে যার মাধ্যমে। অনুভূমিক গতিশীলতায় ব্যক্তি এক সামাজিক অবস্থান হতে অনুরূপ সামাজিক অবস্থানে গমনকে বোঝায় যার মাধ্যমে সামাজিক মর্যাদা অপরিবর্তিত থাকে। যারা পিতার পেশাকে নিজ পেশা হিসেবে গ্রহণ করে তারা অনুভূমিক গতিশীলতার অন্তর্ভুক্ত। অন্য দিকে যারা পিতার পেশা গ্রহণ না করে ভিন্ন পেশায় নিয়োজিত এবং মর্যদা বৃদ্ধি পায় তা লাম্বিক গতিশীলতা নির্দেশ করে।

সারণি ৪

সামাজিক গতিশীলতা সম্পর্কিত তথ্যবিন্যাস

উত্তরদাতাদের পেশা গ্রহণ	বিলদহর		বিলসা	
	নিজ পেশা (২৯)	ভিন্ন পেশা (৭১)	নিজ পেশা (৬৪)	ভিন্ন পেশা (১)
পিতার পেশা গ্রহণ	২৯ (১০০.০০)	২৭ (৩৮.০৮)	৬৪ (১০০.০০)	-
পিতার পেশার তুলনায় উচ্চ পেশা গ্রহণ	-	৩৪ (৪৭.৮৯)	-	১ (১০০.০০)
পিতার পেশার তুলনায় নিচু পেশা গ্রহণ	-	১০ (১৪.০৮)	৩১ (৪৮.৪৪)	-

উৎস: মাঠ গবেষণা

যারা মৎস্যজীবী পেশায় জড়িত তাদের মধ্যে পিতার পেশা গ্রহণ প্রবণতা বেশি। যারা ভিন্ন পেশা গ্রহণ করেছে তাদের মধ্যে এ ধরনের প্রবণতা কম লক্ষ করা যায়। জেলেরা আর্থিকভাবে দুর্বল হওয়ায় শিক্ষাগ্রহণসহ নানা সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত। জেলে সম্প্রদায়ে মাছ শিকারের সময় পিতার সহযোগী হিসেবে সন্তান কাজ করে। ফলে ছোটোবেলা থেকেই তারা মৎস্য শিকারের কৌশল আয়ত্ত করে। বিকল্প পেশা না ভাবা ও না শেখার কারণে এবং আর্থিক সংকট থাকায় তাদের মধ্যে বাধ্য হয়ে পিতার পেশা গ্রহণ প্রবণতা বেশি লক্ষ করা যায়। উর্ধ্বমুখী লাম্বিক গতিশীলতায় ব্যক্তি এক সামাজিক অবস্থান থেকে অন্য সামাজিক অবস্থানে গমন করাকে বোঝায় যার মাধ্যমে সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। এক্ষেত্রে ব্যক্তি তার পিতার পেশা থেকে উন্নত পেশা গ্রহণ করে যার মাধ্যমে সম্পত্তি, ক্ষমতা ও মর্যাদা লাভ করার সুযোগ পায়। জেলে সম্প্রদায়ে যারা বংশগত পেশা পরিত্যাগ করে ভিন্ন পেশা গ্রহণ করেছে তাদের মধ্যে উত্তরদাতাগণের পিতাদের তুলনায় উচ্চ পেশা গ্রহণ প্রবণতা এবং উর্ধ্বমুখী লাম্বিক গতিশীলতা লক্ষ করা যায়। যদিও সুযোগ-সুবিধা কম থাকায় তাদের মধ্যে এ ধরনের গতিশীলতার হার কম তবে আগে উর্ধ্বমুখী লাম্বিক গতিশীলতা একেবারেই অসম্ভব ছিল বলে উত্তরদাতাগণ জানায়। নিম্নমুখী লাম্বিক গতিশীলতায় ব্যক্তি এক সামাজিক স্তর থেকে অন্যস্তরে গমন করে যার মাধ্যমে

সামাজিক মর্যাদা হ্রাস পায়। এক্ষেত্রে ব্যক্তি পিতার পেশার চেয়ে নিম্নতর পেশা গ্রহণ করে যার মাধ্যমে নিম্ন জীবনযাত্রা তথা মর্যাদা, ক্ষমতা ও সম্পত্তি ভোগ করে। জেলে সম্প্রদায়ে যারা মুখ্য বা গৌণ পেশা হিসেবে দিনমজুর পেশায় নিয়োজিত তাদের নিচু পেশা হিসেবে বিবেচনা করে। কারণ উত্তরদাতাগণ দিনমজুর পেশায় সন্তুষ্ট নয়। যে সময় মাছ শিকার করতে পারে না এ সময় তারা দিনমজুর হিসেবে কাজ করে। জেলে সম্প্রদায় বংশগত পেশার পাশাপাশি দিনমজুর পেশাকে বা বংশগত পেশা ত্যাগ করে দিনমজুর পেশা গ্রহণ করাকে নিজেদের ব্যর্থতা হিসেবে বিবেচনা করে। যদিও আর্থ-সামাজিক কারণে তারা এ পেশা গ্রহণ করতে বাধ্য হয়।

উপসংহার

সময়ের ব্যবধানে সমাজ পরিবর্তিত হয় আর সমাজ পরিবর্তনের ছোঁয়া সম্প্রদায়গত জীবনে পড়বে এমনটাই স্বাভাবিক। কিন্তু সে পরিবর্তন যদি সম্প্রদায়গত জীবনমানের অবনয়ন ঘটায় এবং পেশাগত ঝুঁকি বৃদ্ধি করে তা কারও কাম্য নয়। জেলে সম্প্রদায় প্রকৃত মৎস্যজীবী হয়েও স্বাধীনভাবে মৎস্য শিকার এবং চাষ করতে পারছে না। চলনবিলে খাল, বিল, নদী-নালা প্রায় মাছ শূন্য হয়ে পড়েছে। সৌখিন মৎস্য শিকারিতো বটেই পেশাজীবীরাও এখন আর এ পেশায় আকর্ষণবোধ করে না। অনেক উত্তরদাতা তাদের পিতা ও দাদার বংশগত পেশা ত্যাগ করে ভিন্ন পেশায় নিয়োজিত হয়েছে। অনেকে পেশাকে আঁকড়ে কষ্টে দিন কাটাচ্ছে। যারা মৎস্য শিকার পেশায় রয়েছে তাদের অভাব অনটন নিত্যসঙ্গী। এক সময়ের মৎস্যভান্ডার বলে পরিচিত চলনবিল অঞ্চলের বেশিরভাগ জলমহালগুলো এখন অমৎস্যজীবীদের দখলে। ফলে জেলে সম্প্রদায় তাদের পরিবার পরিজন নিয়ে মানবেতর জীবনযাপন করছে।

সম্প্রদায়গত জীবন স্থির ও নিশ্চল নয়। বরং পরিবর্তিত সমাজব্যবস্থায় পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। জেলে সম্প্রদায়ে আয় বৃদ্ধি পেয়েছে। যারা মৎস্য শিকারে জড়িত তারা মৎস্য সংকটের কারণে কম আয় করে। যারা ভিন্ন পেশায় নিয়োজিত তাদের আয় অপেক্ষাকৃত বেশি হলেও বর্তমান বাস্তবতায় তা নগণ্য। তাদের মধ্যে পেশাগত পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। তবে আর্থিক সংকটের কারণে ভাল পেশায় নিয়োজিত হতে পারছে না। তারা সন্তানের শিক্ষাগ্রহণে আগ্রহী হচ্ছে এবং সন্তানরা লেখাপড়া শিখছে। কিন্তু আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে অনেকে লেখাপড়া বন্ধ করতে বাধ্য হচ্ছে। নিজ গোত্র বা সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাহের সংখ্যাই বেশি। যৌতুক দিতে না পারায় কিংবা কম যৌতুক দেওয়া ও আত্মীয়তার বন্ধন সুদৃঢ় করার জন্য অনেকে নিজেদের আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে বিবাহ করছে। বাসস্থানের উন্নতি হয়েছে। সুযোগ-সুবিধা আগের চেয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে তবে অপ্রতুলতা রয়েছে। বিনিময় ব্যবস্থায় পরিবর্তন এসেছে। তারা রাজনৈতিকভাবে সচতেন হয়েছে এবং স্থানীয় ইউনিয়ন পর্যায়ে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করছে। জেলে সম্প্রদায়ে সামাজিক গতিশীলতা লক্ষ করা যায়। তবে উর্ধ্বমুখী লাম্বিক গতিশীলতা কম। নানা কারণে স্থানান্তর গমন বৃদ্ধি পেয়েছে। সার্বিকভাবে জেলে সম্প্রদায়গত জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অতীতের তুলনায় বর্তমানে পরিবর্তন এসেছে তবে অর্থনৈতিকভাবে সচ্ছলতা কিংবা আর্থিক নিরাপত্তা এখনও প্রত্যাশিত পর্যায়ে আসেনি যার প্রভাব অপরাপর সকল ক্ষেত্রেই লক্ষ করা যায়। তাই জেলে সম্প্রদায়গত জীবনের উন্নয়নের জন্য কতিপয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন। তা হলো, আর্থিক নিরাপত্তা বিধান করা, সহজশর্তে ঋণ দেওয়া, স্বাধীনভাবে মাছ শিকার করতে দেওয়া, সুতি বন্ধ করা, খাল-বিল, নদী-নালা খনন করে মাছের প্রজনন বৃদ্ধি করা, প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা এবং প্রকৃত মৎস্যজীবীকে মাছ চাষে উদ্বুদ্ধ করা, সামাজিকভাবে হেয় জ্ঞান না করা, কারেন্ট জালের ব্যাপক ব্যবহার বন্ধ করা প্রভৃতি। উল্লিখিত পদক্ষেপগুলি গ্রহণ করলে জেলে সম্প্রদায়গত জীবনের পেশাগত উন্নয়ন এবং এ পেশাকে কেন্দ্র করেই সুখী জীবনযাপন সম্ভব বলে উত্তরদাতাগণ জানায়। কারণ নতুন প্রজন্ম ভিন্ন পেশায় আগ্রহী হলেও এখনও অনেকে নিজেদের বংশগত পেশায় নিয়োজিত থেকে বাংলার চিরায়ত জেলে সম্প্রদায়গত জীবনের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি ধরে রাখতে ইচ্ছুক।

আইবিএস-এর কয়েকটি প্রকাশনা

১৯৯১ সফর আলী আকন্দ সম্পাদিত। *বাঙালীর আত্মপরিচয়*।
১৯৯২ আবদুল করিম। *বাংলার ইতিহাস: মোগল আমল*।
২০০৯ মাহবুবর রহমান ও স্বরোচিষ সরকার সম্পাদিত। *প্রীতিকুমার মিত্র স্মারকগ্রন্থ*।
২০১০ মাহবুবর রহমান ও স্বরোচিষ সরকার সম্পাদিত। *বিশ শতকের বাংলা*।
২০১২ মাহবুবর রহমান সম্পাদিত। *রাজশাহী মহানগরী: অতীত ও বর্তমান*। ২ খণ্ড।
২০১২ শাহানারা হোসেন। *প্রাচীন বাংলার ইতিহাস*।
২০১৫ স্বরোচিষ সরকার সম্পাদিত। *বাংলাদেশের ভাষানীতি ও ভাষা-পরিকল্পনা*।
২০১৫ স্বরোচিষ সরকার সম্পাদিত। *জাগরণ ও অভ্যুদয়*।
২০১৫ মোহাম্মদ নাজিমুল হক সম্পাদিত। *বরেন্দ্র অঞ্চলের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর আচার-অনুষ্ঠান*।
২০১৫ *বাংলাদেশ চর্চা দেশে বিদেশে: সটীক গ্রন্থপঞ্জি* সিরিজ (মুক্তিযুদ্ধ, ভাষা, সাহিত্য)।

1983 S A Akanda edited. *The District of Rajshahi: Its Past and Present*.
1991 Abdul Karim. *History of Bengal: Mughal Period*. 2 Volumes.
2010 Md. Shahajahan Rarhi. *Index to the Journal of IBS* (1976-2009).
2011 Shahanara Husain. *History of Ancient Bengal: Selected Essays on State, Society and Culture*.
2015 *Bangladesh Studies Home and Abroad: Annotated Bibliography* Series (Economics, Society, Law, Statistics, Trade and Commerce, and Education).